ইনতিসাব

আমার সকল ছাত্রের উদ্দেশ্যে—যারা আমাকে দিল থেকে মহব্বত করে। যাদের মহব্বতের কাছে আমি চির ঋণী। আল্লাহ পাক তাদেরকে উপকারী ইলম ও বিনা হিসাবে জান্নাত দান করেন। আমীন।

–হাসান সিদ্দীক

অনুবাদকের গ্রন্থসমূহ

১. বড়দের ছেলেবেলা
২. ফেরেশতাদের বিস্ময়কর জীবনকথা
৩. আখেরাতের পাথেয় (মাওয়ায়েযে আবরার-১)
৪. আদর্শ জীবন গঠনের ইসলামী পদ্ধতি (মাওয়ায়েযে আবরার-২)
৫. আমাদের অধঃপতন ও উত্তরণের পথ (মাওয়ায়েযে আবরার-৩)
৬. আহকামে যাকাত
৭. ইসলাহী মাজালিস (২য় খণ্ড)
৮. মাজালিসে আবরার
৯. রাসায়েলে আবরার
১০. বিষয় ভিত্তিক বক্তৃতা
১১. বিষয় ভিত্তিক প্রবন্ধ
১২. সহীহ হাদীসের আলোকে নামায
১৩. আহকামে সফর
১৪. শিয়া মতবাদ ইরানী বিপ্লব ও ইমাম (?) খোমিনী
১৫. বিনয় : সম্মান ও মর্যাদার সোপান
১৬. কুরআন-হাদীসের আলোকে মাযহাব ও তাকলীদ
১৭. তোমার লীলাই দেখতে পাই (কবিতামালা)
১৮. বিষয় ভিত্তিক বয়ান
১৯. বিষয় ভিত্তিক মাসআলা-মাসায়িল
২০. ছোটদের ইসলামী কাহিনী
২১. মালফূযাতে ফুলপুরী
২২. মাআরিফে মাসীহুল উম্মাত
২৩. রাসূলুল্লাহ (সা.) কি নূরের তৈরী?
২৪. মালফূযাতে রায়পুরী
২৫. আত তাকসীমুস সাবয়ী (আরবী পুস্তিকা)
২৬. ইরশাদাতে গাঙ্গুহী
২৭. মাজালিসে সিদ্দীক
২৮. ইরশাদাতে হাকীমুল ইসলাম
২৯. ধূম্রজালে জিহাদ
৩০. মালফূযাতে ফকীহুল উম্মাত

মুফাক্কিরে ইসলাম
হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.
-এর বাণী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ سَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. اَمَّا بَعْدُ

জ্ঞানী-গুণী বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে, যাঁদের দাওয়াত ও ইসলাহ-এর ইতিহাস আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দ্বীন, মাশায়িখ ও মুসলিহীনে উম্মতের ফুয়ূয ও বারাকাত এবং তাঁদের ইসলাহী ও তারবিয়াতী কর্মকাণ্ডসমূহের প্রতি দৃষ্টি থাকে, তাঁদের ইসলাহ ও তারবিয়াতের উপলক্ষ এবং তাঁদের ইরশাদাত ও দিকনির্দেশনাসমূহ এবং তাঁদের ফয়েয ও বরকতের প্রচার প্রসার, হেফাযত ও সংরক্ষণের এক বিশাল বড় মাধ্যম তাঁদের ঐ মালফূযাত ও বাণীসমূহ যা তাঁরা নিজ আম অথবা খাস মজলিসে ইরশাদ করেছেন। অথবা ঐ মাকতূবাত বা লিখিত কথামালা যা এই সব বরেণ্য ব্যক্তিবৃন্দ কতিপয় মুখলিস ভক্তবৃন্দ এবং সত্যের সন্ধানী মানুষের চিঠির উত্তরে লিখেছেন বা লিখিয়েছেন।

মালফূযাত, মাকতূবাতের এই সংকলনসমূহের তালিকা এত দীর্ঘ যে, একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতিমূলক ও ভূমিকাস্বরূপ প্রবন্ধে সেটা তুলে ধরা অসম্ভব।

এখানে শুধুমাত্র একটি সংকলনের নাম লেখা হচ্ছে। যা হযরত মাহবূবে ইলাহী খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.)-এর মালফূযাত সমৃদ্ধ। এর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও অর্থবোধক নাম হল "ফাওয়ায়িদুল ফাওয়ায়িদ" (বা উপকারের উপকারসমূহ)

এ মালফূযাত এবং একটি সীমারেখা পর্যন্ত মাকতূবাতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, এগুলোর বিষয় বৈচিত্র, বাস্তবভিত্তিক কথা, আত্মিক রোগ ও দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ, সেগুলোর চিকিৎসার পথ ও পন্থার প্রতি সঠিক দিক নির্দেশনা كَلِّمُوا النَّاسَ عَلٰى قَدْرِ عُقُوْلِهِمْ "বা মানুষের সাথে তাদের আকল অনুসারে কথা বলো" এ সব কিছুকে শামিল করে। এই মালফূযাত ও মাকতূবাতকে সামনে রেখে একজন সচেতন মানুষ ঐ সময়ের জীবন এবং সামাজিকতার সঠিক চিত্র পেশ করতে পারে বা দেখতে পারে। এমনিভাবে সে নফস, আখলাক,

মুআমালাত এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের অসংখ্য দোষ-ক্রটি এ দুর্বলতা সম্পর্কে অবগত হয়ে সেগুলোর চিকিৎসার ব্যাপারে ঐ সব কার্যকর পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে অবগত হতে পারে, যেগুলো সে আখলাক, তাসাওউফ এবং সুলূকের সূক্ষ্ম গভীর ও মূল্যবান কিতাবসমূহের শত শত পৃষ্ঠা ও বিষয় বস্তু থেকে হাসিল করতে পারবে না।

আমাদের এই নিকটবর্তী যুগে কোন কৃত্রিমতা ও অতিরঞ্জন ছাড়াই লেখা যেতে পারে যে, মাওলানা সায়্যিদ সিদ্দীক আহমাদ ছাহেব মাযাহিরী যিনি বান্দাহ জেলার জামি'আ আরাবিয়া হাতুরা মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পবিত্র সত্তা ঐ সব রাব্বানী উলামা ও মুরব্বী-মুসলিহ শায়েখদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, যাঁদেরকে আল্লাহ তাআলা ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যত, ইসলাহ (সংশোধন) ও তাবলীগ এর স্পৃহা, সঠিক বুঝ, বাস্তবতা অনুধাবনশক্তি ও বাস্তবতা দর্শন এবং আল্লাহর পথে কষ্ট সহিষ্ণুতা ও উঁচু হিম্মতের গুণসমূহে গুণান্বিত করেছেন এবং সত্য প্রকাশ ও সঠিক পরামর্শ প্রদানের দুঃসাহসও আল্লাহ পাক তাঁকে দান করেছেন।

তাঁর মজলিসগুলোতে সঠিক পথের নির্দেশনার আত্মিক ও কলবী ব্যাধিসমূহ চিহ্নিতকরণ, সমাজে ছড়ানো ছিটানো ক্রটিসমূহ, শরীয়ত ও সুন্নাত পরিপন্থী কুপ্রথাসমূহের নিন্দাবাদ এবং সেগুলো নির্মূল করার পাক্কা ইচ্ছা ও এ ব্যাপারে মেহনতের দাওয়াত, পূর্বসুরী বুযুর্গানে দ্বীনের কথা-কাজ ও কর্মপদ্ধতির আলোচনা, আগ্রহ সঞ্চারকারী ঈমান জাগানিয়া বিভিন্ন ঘটনা তাঁর বয়ানে পাওয়া যায়। যাঁদের মাওলানার মজলিসে শরীক হওয়ার এবং তাঁর তালীম-তারবিয়ত তথা শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার সুযোগ লাভ হয়েছে তাঁরা এ কথাগুলোর বাস্তবতা পুরোপুরি অনুধাবনে সক্ষম।

আল্লাহ পাকের শোকর যে, স্নেহাস্পদ মৌলভী মুহাম্মাদ যায়েদ ছাহেব এ মালফূযাত সংকলন করার চেষ্টা করেছেন। এটি একটি মূল্যায়নযোগ্য ইসলাহী ও তারবিয়াতী রত্নভাণ্ডার ছিল, যা তাঁর মাজালিস এবং মালফূযাত ও মাকতূবাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। আশংকা ছিল হয়ত এ মহামূল্যবান রত্নভাণ্ডার কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে অথবা চিঠি-পত্রের পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে।

মাওলানা মুহাম্মাদ যায়েদ মাযাহেরী নদভী ছাহেব সমকালীন পাঠকবৃন্দ, মাদরাসার ফুযালা, তলাবা, তালিবীনে হক এবং স্বীয় ইসলাহ ও তারবিয়্যাতের ব্যাপারে একান্ত ইচ্ছুকদের কৃতজ্ঞতা লাভের উপযুক্ত। যেহেতু তিনি একটি

গ্রন্থে সেটাকে জমা করে দিয়েছেন, যার নাম দিয়েছেন “ইলমী ও ইসলাহী মালফূযাত ও মাকতূবাত” (মাজালিসে সিদ্দীক)।

এই মহামূল্যবান রত্নভাণ্ডারে বৈচিত্রও আছে, অভিনবত্বও আছে। প্রশস্ততাও আছে, আবার আছে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি দিকনির্দেশনাও।

এই সংকলনটির মাধ্যমে মাদরাসার তালিবানে ইলম, মাদারিসে দ্বীনিয়্যার ফুযালা, মিল্লাতের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যক্তিগত বা সম্মিলিতভাবে সংশোধনমূলক কর্মকাণ্ড সম্পাদনকারী এবং তাযকিয়ায়ে নফস বা আত্মশুদ্ধির অভিলাষ পোষণকারী ব্যক্তিবর্গ উপকৃত হতে পারবেন। আল্লাহ তাআলা এই প্রচেষ্টাকে কবূল করুন। এই মালফূযাত ও মাকতূবাতের সংকলককে উত্তম বিনিময় দান করুন। পাঠকবৃন্দকে এর মাধ্যমে পুরোপুরি উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاللّٰهُ لَا يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ

(আল্লাহ তাআলা সৎকর্মশীলদের সাওয়াব নষ্ট করেন না।)

আবুল হাসান আলী নদভী
২৪ সফর ১৪১৭ হিজরী

মুহিউস সুন্নাহ
হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ.-এর

মূল্যবান বাণী

حَامِدًا وَّ مُصَلِّيًا وَّ مُسَلِّمًا

আম্মা বাদ, ইলমী ও দ্বীনী পরিমণ্ডলে হযরত মাওলানা ক্বারী সায়্যিদ সিদ্দীক ছাহেব বান্ধাবী রহ.-এর ব্যক্তিত্ব কোন পরিচিতির মুখাপেক্ষী নয়। নিঃসন্দেহে মাওলানার অবিস্মরণীয় কীর্তিকলাপের ফলশ্রুতিতে তাঁর তাবলীগী ও তালীমী এবং ইসলাহী খেদমতসমূহ, কুরআনে পাকের তালীমের জন্য মকতবসমূহ চালু করার উদ্যোগ, দুর্বলতা ও রোগ ব্যধি সত্ত্বেও দ্বীনে হকের প্রচার-প্রসার ও হেফাযতের জন্য দিনরাতের অবিরাম দৌড় ঝাঁপ ইত্যাদি কারণে তাঁর যিন্দেগীর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ও অনুপম গুণাবলীর ব্যাপারে বর্তমান ও ভবিষ্যতপ্রজন্মকে অবগত করা অত্যন্ত জরুরী ছিল। যাতে করে তারা নিজ নিজ জীবনে এর থেকে আলো গ্রহণ করতে পারেন। যার জন্য এ সংকলনটি সর্বোত্তম মাধ্যম।

আল্লাহ তাআলা এটাকে কবূল করুন এবং উম্মতে মুসলিমার জন্য উপকারী ও লাভজনক বানিয়ে দিন। আমীন।

ওয়াস সালাম
আবরারুল হক

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

সংকলকের আরয

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء

"নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীদের উত্তরসুরী"। (তিরমিযী শরীফ ১ : ৯৩)

নবীদের উত্তরসুরী হওয়ার অর্থ হল জীবনের প্রতিটি শাখায় দ্বীনী দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁরা পরিপূর্ণভাবে উম্মতকে সঠিক পথ দেখান। ইলমী ময়দান হোক বা আমলী ময়দান, উলামায়ে রাব্বানিয়্যীনের কর্মপদ্ধতি এবং তাঁদের দিকনির্দেশনাসমূহ উম্মতের জন্য আদর্শ ও মাইলফলক হয়ে থাকে। এজন্য একটি বর্ণনায় এসেছে-

عُلَمَاءُ أُمَّتِيْ كَأَنْبِيَاءِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ

অর্থাৎ "আমার উম্মাতের আলেমগণ বনী ইসরাঈলের নবীদের ন্যায়।"

আরেক বর্ণনায় এসেছে-

أَكْرِمُوا الْعُلَمَاءَ

"তোমরা আলেমদের সম্মান করো।"

অন্য একটি হাদীসে তো এ পর্যন্ত ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ لَمْ يَتَبَجَّلْ عَالِمِيْنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"যারা আমাদের আলেমদের সম্মান করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" (মুসতাদরাকে হাকিম)

আরেকটি হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ عَادٰى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "যে আমার কোন ওলীকে কষ্ট দিল, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম"। (সহীহ বুখারী)

এই সমস্ত হাদীস ও বর্ণনার আলোকে ফুকাহায়ে কিরাম ও মুহাদ্দিসীনে ইযাম উলামায়ে রাব্বানিয়্যীন ও মাশায়িখের অনেক অনেক হক্ব বয়ান

করেছেন। তাই তো দ্বীনী কাজে সাধ্যানুসারে তাঁদেরকে সহযোগিতা করাকে জরুরী আখ্যায়িত করেছেন। প্রয়োজনে সামর্থ্য অনুসারে ইকরামের সাথে তাঁদের অর্থনৈতিক খেদমত করাটাকেও তাঁদের হক্বসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

কিন্তু এইসব হক্ব ও ফাযায়েল ঐ সব আলেমদের জন্য প্রযোজ্য, যাঁদেরকে 'উলামায়ে রাব্বানিয়্যীন' বলা হয়। যাঁদের আমলী যিন্দেগী বাস্তবিকপক্ষেই নমূনা বানানোর উপযুক্ত। যাঁরা সত্যিকারার্থে ইলমী-আমলী এবং আখলাকী ময়দানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়ারিস এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। যাঁরা ইলম অনুযায়ী আমল করেন। যাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরীকাও সুন্নাতের সত্যিকার আশেক। এবং এগুলো প্রচার-প্রসার করার স্পৃহা অন্তরে লালন করেন এবং এর জন্য চেষ্টা করেন। যাঁদের বাহ্যিক হালত শরীয়তের মোতাবিক আর অভ্যন্তরীণ হালত ইশকে খোদা ও ইশকে নববীর নূরে নূরান্বিত। তাঁরা ইয়াহুদী-খ্রীস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের রীতি-নীতিকে অন্তর থেকে ঘৃণা করেন। তাঁদের শান তো হল وَ لَا يَخَافُوْنَ فِي اللّٰهِ لَوْمَةَ لَآئِمٍ অর্থাৎ "আল্লাহর পথে তাঁরা তিরষ্কারকারীর তিরষ্কারকে ভয় করে না।" (সূরা মায়িদাহ, আয়াত ৫৪) ফরযসমূহের বাইরে নাওয়াফিল, আল্লাহর যিকির এবং কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত তাঁদের মামূলাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা, গীবত, চোগলখোরী এবং অনর্থক কথাবার্তা থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকেন। এবং আখলাকে নববী হল, তাঁদের বিশেষ প্রতীক। তাঁরা অল্পে তুষ্ট থেকে দুনিয়াতে যাহেদানা যিন্দেগী যাপন করাকে ভালোবাসেন। এবং লোভ-লালসা ও চাটুকারিতা থেকে শত মাইল দূরে থাকেন। তাঁরা নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা, পর্দাহীনতার কাছেও যান না। তাঁরা বিভিন্ন ধরনের অন্যায়কর্ম কুপ্রথাসমূহ এবং বিদআত থেকে স্বীয় আঁচল গুটিয়ে রাখেন।

উম্মতের মধ্যে যখন এ জাতীয় আলেম পাওয়া যায়, তখন হেদায়েত এর ঝর্ণাধারা উৎসারিত হয় এবং উম্মতের মধ্যে কল্যাণ ও সাফল্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আকাবির ও মাশায়িখ, যাঁদেরকে আমরা কাছ থেকে দেখেছি তাঁরা হলেন, হযরত মাওলানা সায়্যিদ সিদ্দীক আহমাদ ছাহেব বান্দাভী (রহ.) মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.) মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী

রহ.। এ ছাড়া আমাদের আকাবিরের মধ্যে হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. শাইখুল হাদীছ হযরত মাওলানা যাকারিয়্যা ছাহেব রহ. উল্লেখিত গুণসমূহে গুণান্বিত ছিলেন। এইসব হযরতদের পূর্ণ প্রচেষ্টা এটাই ছিল যে, দ্বীনী মাদরাসার তালিবানে ইলম, ফারাগাত হাসিলকারী আলেমরাও যেন এসব গুণে গুণান্বিত হন। এ জন্য আমাদের বড়রা বিভিন্নমুখী উদ্যোগ নিয়েছেন।

মাদরাসার ছাত্রদের আমল আখলাক এর সংশোধনের ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন।

মাওয়ায়েয, খুতুবাত ও ইসলাহী মাজালিসে বিশেষভাবে এ ব্যাপারগুলোকে সামনে রেখেছেন এবং গুরুত্বসহ তুলে ধরেছেন।

হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ.এর ওয়াযসমূহ এবং শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়্যা কান্ধলভী রহ.এর আপবীতী বা আত্মজৈবনিক স্মৃতি ও অন্য কিছু রচনায় এ জাতীয় আত্মসংশোধনমূলক বিষয়বস্তুসমূহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যেগুলোর মধ্যে উলামা ও তালাবার ইসলাহের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করা হয়েছে।

হযরত মাওলানা সায়্যিদ সিদ্দীক আহমাদ ছাহেব বান্ধাভীও রহ. দ্বীনী মাদরাসার শিক্ষকবৃন্দ ও ফারেগীনের ব্যাপারে খুব চিন্তিত থাকতেন। তাঁদের আমল ও আখলাকের নেগরানী এবং ইসলাহ ও তারবিয়্যাতের ব্যাপারে নানা ধরনের চেষ্টাও করতেন। এই উদ্দেশ্যে কখনো আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দ্বীনের ওয়ায শোনাতেন আবার কখনো ইসলাহী মাজালিসের উদ্যোগ নিতেন।

হযরতের সব সময়ের অভ্যাস এই ছিল যে, ইশার নামাযের পর মসজিদে (যেখানে ছাত্রদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক ছিল) কোন ইসলাহী কিতাব শোনাতেন। কখনো ওয়ায করতেন। কখনো নসীহত করতেন। কখনো বকাঝকাও করতেন। সংশোধনের ভঙ্গি বড় অদ্ভূত ছিল, যা অন্তরে দারুণ রেখাপাত করত।

আমি অধমের প্রায় বিশ বছর হযরতের খেদমতে থাকার সৌভাগ্য হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের তাওফীকে হযরতে আকদাস রহ.-এর এ জাতীয় সমস্ত ইসলাহী কথাবার্তা, উপদেশসমূহ সংকলন করেছি। যার কিছু অংশ "ইফাদাতে সিদ্দীক" এবং "ইসলাহে নফস" নামে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান অংশটিকে "মাজালিসে সিদ্দীক" নামে নামকরণ করা হয়েছে। যা অনুরূপ উপদেশসমূহ ও মালফূযাতের সমষ্টি।

পনের বিশ বছরের এ দীর্ঘ সময়ে হযরত আকদাস রহ. এর এ জাতীয় ইসলাহী মাজালিসের উল্লেখযোগ্য অংশ আমার নিকট বিদ্যমান।

কিন্তু আফসোস! অধম নিজ অন্যান্য ব্যস্ততার দরুন এটাকে দ্রুত জনসম্মুখে পেশ করার ব্যাপারে অপারগ ছিলাম। দীর্ঘ দিন পর "মাজালিসে সিদ্দীক" এর এই প্রথম খণ্ড আপনাদের হাতে পৌঁছুচ্ছে। এখন এ ধরনের কয়েক খণ্ড ইনশাআল্লাহ বাজারে আসবে।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দের নিকট দুআর দরখাস্ত। আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে এটাকে কবূল করুন। এবং খুব দ্রুত এই ধারাবাহিকতা পূর্ণ করে দিন।

নিঃসন্দেহে এটা আমাদের বড়দের মূল্যবান সম্পদ, যার মধ্যে ছোটদের ইসলাহ বা সংশোধনের পাথেয় বিদ্যমান।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিজ নিজ ইসলাহের ফিকির এবং স্বীয় বড়দের মূল্যবান কথাবার্তাগুলোর মূল্যায়ন এবং সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন।

বড়দের এ কথাগুলো মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকদের নিকট খুব বেশি বেশি পৌঁছানো দরকার। এবং তাঁদেরকে পড়ে শোনানো উচিত।

আল্লাহ তাআলা আমার স্নেহাস্পদ মুফতী ইকবাল সাল্লামাহুকে উত্তম বদলা দান করুন। যিনি এর পাণ্ডুলিপির উপর পুনরায় নযর বুলিয়ে আমার বোঝা হাল্কা করে দিয়েছেন। এতে কিতাব দ্রুত সাধারণ মানুষের সামনে চলে এসেছে।

মুহাম্মাদ যায়েদ মাযাহেরী নদভী
শিক্ষক : শরীয়ত অনুষদ
দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌ (ভারত)
১৪ রবিউল আউয়াল ১৪২৮ হি.

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা ক্বারী সায়্যিদ সিদ্দীক আহমাদ ছাহেব বান্দাভী রহ. প্রতিষ্ঠাতা, জামি'আ আরাবিয়া হাতুরা বান্দা-এর বিভিন্ন মজলিসের অসাধারণ বাণীসংকলন مجالس صديق 'মাজালিসে সিদ্দীক' এর অনুবাদ এখন আপনার হাতে। যা সংকলন করেছেন হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ.-এর খাস শাগরিদ, ভারতের বিখ্যাত আলেম, জামিআ আরাবিয়া হাতুরা মাদরাসার সাবেক উস্তাদ, বর্তমানে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার উস্তাযুল হাদীস হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ যায়েদ ছাহেব মাযাহেরী নদভী (দাঃ বাঃ)

আকাবিরে দেওবন্দের মালফূযাতের প্রতি আমার আকর্ষণ ছোটকাল থেকেই। তখন তো শুধু পাঠ করতাম। আর এখন পাঠ করার পাশাপাশি কিছু কিছু অনুবাদ করার তাউফীকও হচ্ছে فَلَكَ الْحَمْدُ وَ لَكَ الشُّكْرُ يَا رَبِّ মাজালিসে আবরার, মালফূযাতে ফুলপুরী, মা'আরেফে মাসীহুল উম্মাত, ইরশাদাতে আকাবির, ইরশাদাতে গাঙ্গুহী, ইরশাদাতে হাকীমুল ইসলাম ও মালফূযাতে রায়পুরীর অনুবাদ এ ধারাবাহিকতারই দুঃসাহসী প্রয়াস।

হযরত মাওলানা সায়্যিদ সিদ্দীক আহমাদ বান্দাভী রহ. ভারতের বিখ্যাত আলেমদের মধ্যে অন্যতম প্রধান আলেম। তাঁর শত সহস্র মুরীদান ও ছাত্র সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। হাতুরা বান্দার জামিআ আরাবিয়া হল হযরতের নিজ হাতে করা ইলমী কানন। আমার কখনো যাওয়ার সুযোগ হয়নি। তবে যাঁরা সেখানে গিয়েছেন, তাঁদের মুখে শুনেছি যে, সেটা বিশাল স্থান নিয়ে বিশাল মাদরাসা। আমি যে বছর মাদারে ইলমী দারুল উলূম দেওবন্দে দ্বিতীয়বার দাওরায়ে হাদীস পড়ার জন্য যাই অর্থাৎ ১৪১৮ হিজরী মুতাবিক ১৯৯৭ ঈসায়ী। ঐ বৎসরই হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. ইন্তিকাল করেন। তবে তাঁর কথা আমি সর্বপ্রথম শুনতে পাই বন্ধুবর মাওলানা নূরুল ইসলাম ছাহেবের কাছে। তখন থেকেই হযরতের সাথে আমার গায়েবানা মহব্বত শুরু।

এদিকে আকাবির হাযারাতের মালফূযাতের প্রতি আমার সীমাহীন দুর্বলতার কথা জানতে পেরে আমার একান্ত স্নেহাস্পদ ছাত্র, নূরে চশম মৌলভী মাহফূয ইকবাল মিরাজ ২০১৪ ঈসায়ী বর্ষের শেষের দিকে আমার

নিকট مجالس صديق-এর একটি কপি লোক মারফত দেওবন্দ হতে হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করে। আমি আমার ছোটভাইতুল্য এ ছাত্রটির জন্য দুআ করি আল্লাহ পাক তাকে আপন শান অনুযায়ী জাযায়ে খায়র দান করেন। আমীন। শুধু তাই নয় পরবর্তীতে সে হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. এর ২ খণ্ডে প্রকাশিত বিশাল জীবনী تذكرة الصديق 'তাযকিরাতুস সিদ্দীক'ও অধমকে হাদিয়া হিসেবে পেশ করে চির তরে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলে।

فَجَزَاهُ اللهُ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ

হযরতওয়ালা সিদ্দীক আহমাদ বান্দাভী রহ. যেহেতু আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে অতটা পরিচিত নন, তাই গ্রন্থের শুরুতে হযরতের সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। নতুবা আমাদের দেশের কওমী মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষকগণ তাঁকে ভালোভাবেই চেনেন শরহে জামীর উর্দূ শরাহ التسهيل السامي ও তালিবে ইলমদের মূল্যবান পাথেয় آداب المتعلمين এর কল্যাণে।

'মাজালিসে সিদ্দীক'এর মালফূযগুলো মূলতঃ কওমী পড়ুয়া ছাত্রদের জন্য অধিক উপযুক্ত। তবে এর পাশাপাশি সর্বস্তরের সাধারণ মুসলমানদেরও অনেক উপকার হবে ইনশাআল্লাহ।

এ গ্রন্থের কোন কোন স্থানে হযরতওয়ালার নিজস্ব মতামত তুলে ধারা হয়েছে। যার সাথে সবাই একমত হওয়া জরূরী নয়। কেননা غير منصوص বিষয়ে মতপার্থক্য হতেই পারে। আর تفردات اكابر তো প্রসিদ্ধ বিষয়। সুতরাং এ সব ব্যাপারে বিতর্কে না জড়িয়ে ما فوق القياس মনে করে মেনে নেয়ার মধ্যেই কল্যাণ।

আল্লাহ তাআলা হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ.কে চিরশান্তির জান্নাত নসীব করুন। তাঁর اَلْبَاقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ কে কিয়ামত পর্যন্ত কবূল করুন। সঙ্গে সঙ্গে অত্র গ্রন্থের সংকলক অনুবাদক ও পাঠক-পাঠিকাবৃন্দকে বিনা হিসেবে জান্নাতুল ফিরদাউসের আ'লা মাকাম দান করুন। আমীন।

তারিখ
২০ রজব ১৪৩৯ হিজরী
০৮ এপ্রিল ২০১৮ ঈসায়ী
সকাল : ৭ : ৪৫ মিনিট

বিনয়াবনত
মুহাম্মাদ হাসান সিদ্দীকুর রহমান
জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

আরেফ বিল্লাহ
হযরত মাওলানা সিদ্দীক আহমাদ বান্দাভী রহ.

[১৩৪১-১৪১৮ হিজরী — ১৯২৩-১৯৯৭ ঈসায়ী]

নাম : সিদ্দীক আহমাদ
পিতা : সায়্যিদ আহমাদ
দাদা : আবদুর রহমান
মাতা : খাইরুন নিসা

জন্ম : ১৩৪১ হিজরী মুতাবিক ১৯২৩ ঈসায়ী

পিতার ইন্তিকাল : হযরতের বয়স যখন মাত্র ছয় বা সাত, তখন তাঁর সম্মানিত পিতা ইন্তিকাল করেন। হযরত ইয়াতীম হয়ে যান। মাত্র দশ বছর বয়সে হযরতের দাদাও দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

শৈশবে ঘরের দ্বীনী হালত : ছোটকালে হযরতের ঘরের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব দুর্বল ছিল। কিন্তু দ্বীনী হালত খুব মযবূত ছিল। ঘরের প্রত্যেক সদস্য যথা দাদা-দাদী, আব্বা-আম্মা, চাচা প্রমুখ দ্বীনদার ছিলেন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকেই নামাযের পাবন্দ, ইবাদতে আগ্রহী, তিলাওয়াতে কালামে পাকের আশেক, পুরুষেরা জামাআতের সাথে নামায আদায়কারী এবং সকলেই তাহাজ্জুদগুযার, শরয়ীত ও সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষা-দীক্ষা : হযরতের প্রাথমিক শিক্ষা-দীক্ষা নিজ বাসার পবিত্র পরিবেশে হয়েছে। পিতা-মাতার স্নেহের পাশাপাশি দাদা-দাদীর অতুলনীয় মায়া মহব্বতও ছিল। যা ঘরের শিশুদের মধ্যে হযরতের প্রতিই সবচেয়ে বেশি নিবদ্ধ ছিল।

এর কারণ এটা ছাড়া আর কিছুই নয় যে, হযরতের মুহতারাম দাদা নিজ ঈমানী বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে স্বীয় নাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যত দেখছিলেন। এজন্যই তিনি ইন্তিকালের সময় হযরতের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখার অসিয়্যত করেছিলেন।

শিক্ষার ধাপ : নিয়মতান্ত্রিকভাবে শিক্ষার ধাপ চার-পাঁচ বছর বয়সে আরম্ভ হয়। আনুমানিক সাত/আট বছর বয়সে সম্মানিত দাদার কাছে

তাজভীদসহ নাযেরা সমাপ্ত করেন। এরপর দাদা হিফয আরম্ভ করিয়ে দেন। দাদার কাছে আট পারা হিফয করেছিলেন। এর মধ্যেই দাদা আখেরাতের সফরে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

হাতুরা ও বান্ধার পর আনুমানিক দেড় দুই বছর কানপুরের তাকমীলুল উলূম ও জামিউল উলূমে পড়ালেখা করেন। সেখান থেকে আজমীর ও দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। কিন্তু কুদরতে ইলাহী হযরতকে পানিপথ পৌঁছে দেয়। সেখানে তিনি তিন বছর অবস্থান করেন। এ সময়ে হযরত আরবী নেসাবের তালিম কাফিয়া পর্যন্ত পূর্ণ করেন এবং কুরআনে মাজীদ এর দাওর খুব গুরুত্বসহ শোনান এবং উলূমে কুরআন ও তাজভীদ পরিপূর্ণ করেন।

পানিপথে পড়ালেখা শেষে হযরত সাহারানপুর গমন করেন। সেখানে পাঁচ বছর শিক্ষার ধারা চালু ছিল। শরহে জামী থেকে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত। মাঝে অবশ্য কয়েক মাস মুরাদাবাদেও থাকা হয়েছে।

সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ

১. মাওলানা আমীনুদ্দীন ছাহেব রহ.
২. মাওলানা উবাইদুর রহমান ছাহেব ইলাহাবাদী
৩. মাওলানা সোহরাব আলী ছাহেব
৪. মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমাদ ছাহেব লাখনভী
৫. ক্বারীউল কুররা ফাতাহ মুহাম্মাদ ছাহেব পানিপথী
৬. হযরত মাওলানা আব্দুল লতীফ ছাহেব
৭. শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়্যা ছাহেব
৮. হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান ছাহেব কামেলপুরী
৯. হযরত মাওলানা আসআদুল্লাহ ছাহেব রামপুরী
১০. মাওলানা সায়্যিদ যহুরুল হক ছাহেব দেওবন্দী
১১. মাওলানা জামীল আহমাদ ছাহেব থানভী
১২. আল্লামা সিদ্দীক আহমাদ ছাহেব কাশ্মীরী
১৩. মাওলানা আব্দুশ শাকূর ছাহেব কেম্বলপুরী
১৪. মাওলানা আমীর আহমাদ কান্ধলবী
১৫. মুফতী সাঈদ আহমাদ ছাহেব সাহারানপুরী
১৬. মাওলানা যারীফ আহমাদ ছাহেব

১৭. ফকীউল উম্মাত মুফতী মাহমূদ হাসান গাঙ্গুহী
১৮. মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া কুদ্দুসী
১৯. মাওলানা মনসূর আহমাদ খান ছাহেব এলাহাবাদী
২০. মাওলানা আব্দুর রহমান খান ছাহেব এলাহাবাদী
২১. মাওলানা জামীল আহমাদ ছাহেব মুযাফফারপুরী
২২. আল্লামা ইবরাহীম বলিয়াভী ছাহেব
২৩. মাওলানা আজব নূর ছাহেব, প্রমুখ।

হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভীর রহ. খানকায় উপস্থিতি

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. থানাভবনে কয়েকবার হাযিরী দিয়েছেন। অবশ্য প্রথম হাযিরীর সৌভাগ্য কবে হয়েছিল এটা বলা মুশকিল। এতদসত্ত্বেও একাধিকবার যে সফর হয়েছে এটা নিশ্চিত। কেননা একবার হযরতকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। আপনি কি হযরত থানভী রহ.কে দেখেছেন? তখন হযরত বললেন : অনেক অনেক।

এছাড়া একবার স্বয়ং হযরত লিখেন : "থানাভবনে আমার আসা-যাওয়া ছিল এবং হযরত হাকীমুল উম্মতের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হতে থাকল।"
(হায়াতে সিদ্দীক)

হযরত এটাও বলেন : "হযরত নাযেম ছাহেবের সাথে আমি থানাভবন যেতাম। একবার এক সপ্তাহ অবস্থান হয়েছিল।" (ইফাদাতে সিদ্দীক)

হযরত থানভী রহ.এর নিকট বাইআতের দরখাস্ত

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী রহ. এর নিকট বাইআতের দরখাস্ত করেছিলেন। কিন্তু তখন হযরত থানভী নিজ শারীরিক দুর্বলতা ও অসুস্থতার কারণে বাইআতের সিলসিলা স্থগিত করে দিয়েছিলেন। এজন্য ইরশাদ করলেন :

"میرے خلفاء اور مجازین میں سے جس سے زیادہ مناسبت محسوس ہو اسی سے تعلق قائم کر لو"

অর্থাৎ "আমার খলীফা ও অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁর সাথে মনের বেশি মিল হয়, তাঁর সাথেই (ইসলাহী) সম্পর্ক স্থাপন কর।"

মুরশিদ তো হযরত থানভীই কিন্তু পরোক্ষভাবে

হযরত থানভী রহ. এর খেদমতে পেশকৃত দরখাস্ত নামঞ্জুর হওয়ার পর হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. নিজেকে হযরত নাযেম ছাহেব মাওলানা আসআদুল্লাহ ছাহেব রামপুরী রহ. এর নিকট পুরোপুরি সঁপে দেন। আর যেহেতু হযরত নাযেম ছাহেব থানভী দরবারেই তারবিয়াতপ্রাপ্ত ও তৈয়ারকৃত মানুষ ছিলেন, এজন্য এটা বললে ভুল হবে না যে, হযরত বান্দাভীর রহ. মূল মুরশিদ বা শাইখ হযরত থানভী ছিলেন কিন্তু পরোক্ষভাবে।

বাইআত ও খেলাফতের তারিখ ও সন

হযরত নাযেম ছাহেব রহ. এর সাথে হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. -এর সম্পর্কের শুরু সেই ১৩৫৮ হিজরীর শাউয়াল মাস থেকে। যা হযরত নাযেম ছাহেবের ইন্তিকাল পর্যন্ত অর্থাৎ ১৩৯৯ হিজরী পর্যন্ত টানা ৪০ বছর অব্যাহত ছিল।

হযরত নাযেম ছাহেব রহ.এর নিকট তিনি বাইআত হন ১৩৬০ হিজরীর দিকে। এবং বাইআতের আনুমানিক পনের বৎসর পরে ১৩৭৬ হিজরীতে খেলাফত লাভ করেন। যখন হযরতের বয়স ছিল প্রায় ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) বছর।

নিজ শাইখের দৃষ্টিতে হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ.-এর মর্যাদা

মন্তব্য-১

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা আসআদুল্লাহ ছাহেব (নাযেম ছাহেব)-এর দৃষ্টিতে হযরতওয়ালা হাফেয সিদ্দীক আহমাদ বান্দাভী রহ. এর বিশেষ মাকাম ও মর্যাদা ছিল। কখনো তিনি হযরতের নাম নিতেন না বরং সম্মানস্বরূপ "হাফেয ছাহেব" উপাধিতে স্মরণ করতেন।

হযরত নাযেম ছাহেব রহ. বলতেন :

اگر کل قیامت کے دن حق تعالی مجھ سے پوچھیں کہ دنیا سے کیا لایا؟ میں حافظ صدیق احمد کو پیش کر دونگا۔

অর্থাৎ "যদি কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা আমার নিকট জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি দুনিয়া থেকে কী এনেছ? তখন আমি হাফেয সিদ্দীক আহমাদ ছাহেবকে পেশ করে দিব।" (ইয়াদে সিদ্দীক — মাওলানা ইযহার ছাহেব পৃ. ১০১)

মন্তব্য-২

একবার হযরত নাযেম ছাহেব মাওলানা আসআদুল্লাহ রামপুরী আরাম করছিলেন। তখন হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. নিজ শাইখের পা দাবিয়ে

দিচ্ছিলেন। তো হযরত নাযেম ছাহেব জিজ্ঞেস করলেন, হাফেয সিদ্দীক ছাহেব কোথায়? উত্তরে বলা হল : হযরতের পা দাবিয়ে দিচ্ছেন। এটা শুনে নাযেম ছাহেব বললেন : "আমার পা দাবিয়ে দিচ্ছে?

میرے اوپر حق ہے کہ میں انکا پاؤں دبا دوں

"আমার উপর হক হল আমি তাঁর পা টিপে দিব"।

হযরত নাযেম ছাহেব যখন এ কথা বললেন, তখন হযরত বান্দাভী রহ. বিনয়ের দরুন একেবারে নত হয়ে যাচ্ছিলেন আর বারবার বলছিলেন : "হযরত এমন নয়, হযরত এমন নয়।"

মন্তব্য-৩

মাওলানা নাসর আহমাদ বেনারসী রহ. বলেন : একদিন আসর বা মাগরিব এর নামাযের পর আমি হযরত মাওলানা আসআদুল্লাহ ছাহেব রহ. এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন :

میں نے اپنے شاگردوں میں دو مادرزادولی دیکھے مفتی عبد القیوم اور مولانا صدیق احمد باندوی

অর্থাৎ "আমি আমার শিষ্যদের মধ্যে দু'জন জন্মগত ওলী দেখেছি। মুফতী আব্দুল কাইয়ূম এবং মাওলানা সিদ্দীক আহমাদ বান্দাভী।"

(মাহমূদ দেওবন্দ, পৃষ্ঠা : ২০২)

মন্তব্য-৪

শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়্যা রহ.-এর সুযোগ্যপুত্র মাওলানা মুহাম্মাদ তালহা ছাহেব মু: আ: বলেন : "হযরত নাযেম ছাহেব রহ. বলতেন :

حافظ صدیق احمد کی کرامتیں مجھ پر واضح اور روشن ہیں

অর্থাৎ "হাফেয সিদ্দীক আহমাদের কারামতসমূহ আমার উপর সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল।" (রেসালায়ে নাসিরুদ্দীন লক্ষ্মীপুরী মাযাহেরে উলূম, ওয়াক্‌ফ)

হযরত বান্দাভী রহ. এর খলীফাবৃন্দ

(মুজাযীনে বাইআত)

১. মাওলানা আব্দুস সালাম ছাহেব বারাহবাঙ্কাভী
২. মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ ইবনে মাওলানা আসআদুল্লাহ

৩. মাওলানা মুহাম্মাদ মুরতাযা ছাহেব বাঙ্গালী
৪. মাওলানা আব্দুল গণী ছাহেব আহমাদাবাদী
৫. মাওলানা আব্দুস সামী ছাহেব কাসেমী নেপালী
৬. মাওলানা মুফতী শিব্বীর আহমাদ ছাহেব মিরাঠী
৭. মাওলানা গোলাম মুহাম্মাদ ছাহেব বিস্তানভী
৮. মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া ছাহেব দরভাঙ্গাভী
৯. মাওলানা মুফতী আতীকুর রহমান ছাহেব রামপুরী

(মুজাযীনে সোহবত)

১০. মাওলানা আহমাদ আবদুল্লাহ তায়্যিব ছাহেব হায়দারাবাদী
১১. মাওলানা মুহাম্মাদ মুহসিন ছাহেব আফেলাবাদী
১২. মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ যায়েদ ছাহেব মাযাহেরী কানপুরী (অত্র গ্রন্থের সংকলক)
১৩. মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ছাহেব সূরাতী

অসুস্থতা ও ইন্তিকাল

কিছু কিছু কষ্ট যেমন প্রচণ্ড মাথাব্যথা, মাথাচক্কর দেয়ার সমস্যা হযরতের ছেলেবেলা থেকেই ছিল। যা ধীরে ধীরে কমে এসেছিল। কিন্তু একেবারে নিঃশেষ কখনো হয়নি। যৌবনকালের পর অসুস্থতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশেষত অর্শরোগ, ঘাড়ের ব্যথা, ইন্তিকালের কয়েক বছর পূর্বে হার্টের ব্যথা এবং সর্বশেষে পায়ের ঐ ব্যথা যা হযরতকে বিলকুল শয্যাশায়ী বানিয়ে দেয়। এমনকি এই শয্যাশায়ী অবস্থায় হঠাৎ করেই আপন মালিকে হাকীকীর সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছেন।

১৪১৮ হিজরীর ২৩ রবিউছ ছানী মুতাবিক ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ আগস্ট বুধবার যুহরের পর উযু অবস্থায় প্যারালাইসিস ও ব্রেন হ্যামরেজের হামলা হয়। সকাল হতে হতে বেহুঁশ হয়ে পড়েন। ততক্ষণে হযরতকে লক্ষ্মৌ পৌঁছানো হয়েছিল। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ফলাফল এটাই আসল যে, আর কোন আশা নেই। সকাল ১০ টা বেজে ১০ মিনিটে মিল্লাতে মুসলিমাকে ইয়াতীম করে হযরতওয়ালা বান্দাভী আখেরাতের সফরে রওয়ানা হলেন। اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

জানাযার নামায ও দাফন

সঙ্গে সঙ্গে হযরতের লাশ নিয়ে লক্ষ্মৌ থেকে বান্দার উদ্দেশ্যে বিশাল কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেল। আনুমানিক বিকেল পাঁচটার দিকে হাতুরা পৌঁছল। মাগরিবের নামাযের পরপরই গোসল দেয়া হল। এবং ইশার নামাযের পরপরই মাদরাসা সংলগ্ন পূর্বপার্শের মাঠে জানাযার নামায আদায় করা হল। রাত **১১** টায় মাদরাসার দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত গ্রামের সাধারণ কবরস্থানের ঐ অংশে হযরতকে দাফন করা হল, যেখানে হযরতের মুহতারামা আম্মা ও সম্মানিতা স্ত্রী পূর্ব থেকেই আরাম করছিলেন।

সূত্র : তাযকিরাতুস সিদ্দীক (আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা হাফেয ক্বারী সায়্যিদ সিদ্দীক আহমাদ ছাহেব বান্দাবী রহ.-এর জীবনী) মাওলানা মুহাম্মাদ উবাইদুল্লাহ আলআসআদী (দাঃ বাঃ) কৃত।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. পূর্বসুরী বুযুর্গানে দ্বীনের জীবনী ও ঘটনাবলী পড়ার জন্য উৎসাহ প্রদান	৩১
২. হযরতের উস্তায ইমামুন্নাহু মাওলানা সিদ্দীক আহমদ ছাহেব রহ.-এর ঘটনা	৩১
৩. হযরত ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর অবস্থা	৩২
৪. বুযুর্গানে দ্বীনের সাথে সম্পর্ক রাখার গুরুত্ব	৩৩
৫. বুযুর্গানে দ্বীনের সাথে সম্পর্ক রাখার পদ্ধতি	৩৩
৬. বুযুর্গদের আগমন এবং তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করাও আল্লাহ পাকের দান	৩৪
৭. আসাতিযায়ে কেরামকে সম্মান করলে ইলমের মধ্যে উন্নতি হয়	৩৫
৮. হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবীর রহ. এত উচ্চ মর্যাদা কীভাবে নসীব হল?	৩৫
৯. হযরত ইমাম বুখারী রহ.-এর অবস্থা	৩৬
১০. আসল দোষ আমাদের	৩৬
১১. আমাদের শিক্ষকগণ এমন ছিলেন	৩৭
১২. ছাত্রদের উপর মেহনত করা হলে এখনও কাজের হতে পারবে	৩৮
১৩. এমন শিষ্য ও মুরীদদের নিকট ফয়েয পৌঁছে না	৩৯
১৪. বর্তমানে আসাতিযায়ে কিরাম ও মাশায়িখে ইযাম দ্বারা ফয়েয পৌঁছে না কেন?	৪০
১৫. শাহ আব্দুল কাদের ছাহেব রায়পুরী এবং শাহ আব্দুর রহীম ছাহেব রায়পুরী রহ.-এর ঘটনা	৪১
১৬. বনা বা বিগড়ানোর যমানা তালেবে ইলমীরই যমানা	৪২
১৭. যদি মাদরাসায় থেকেও বনতে না পারো তাহলে আর কোথায় গিয়ে বনবে?	৪৩
১৮. ছাত্রদেরকে সাবধান করা	৪৪
১৯. গুনাহ বর্জনের ব্যবস্থাপত্র	৪৪
২০. মাদরাসার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ নসীহতসমূহ	৪৬
২১. মেহনত ও চেষ্টা ব্যতীত ইলম হাসিল হয় না	৪৭
২২. ছাত্রদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ	৪৭

বিষয় | পৃষ্ঠা

২৩. কিছু করতে হলে বা বনতে হলে নিজেকে মিটিয়ে দাও ৪৮
২৪. দুই লোভী ৪৯
২৫. লোভের লক্ষণ ৫০
২৬. ছাত্রদের দায়িত্ব ৫১
২৭. মাদরাসার উদাহরণ এবং ছাত্র ও মাদরাসা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ৫১
২৮. নামায এবং সবকে উপস্থিতি ৫২
২৯. ক্বারী আব্দুর রহমান ছাহেব পানিপথী রহ. এর ঘটনা ৫৩
৩০. ইমাম শাফেয়ী রহ. এর ঘটনা ৫৩
৩১. ছাত্রদের দূরবস্থা ৫৩
৩২. হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ.-এর ঘটনা ৫৪
৩৩. তালিবে ইলমের গুণাবলী ৫৫
৩৪. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ইহতিমাম ৫৫
৩৫. মাদরাসার দায়িত্বশীল ও মুদাররিসদের যিম্মাদারী ৫৫
৩৬. সময়ের মূল্য, যবানের হেফাযত, নফসের নেগরানী ৫৬
৩৭. ইলমের সাথে সামঞ্জস্য এবং ইলমী ঝোঁক ও আগ্রহের লক্ষণ ৫৭
৩৮. সময়ের মূল্য ৫৮
৩৯. মাদরাসায় থেকে আমানত ও দিয়ানত শিখ ৫৯
৪০. দিয়ানত ও আমানত নেই তো কিছুই নেই ৬০
৪১. নিজের বড়দের সামনে স্বীয় ইলম ও যোগ্যতা প্রকাশ করা অনুচিত ৬০
৪২. তালিবে ইলমের হালাল খাদ্যের ব্যাপারে খুব যত্নবান থাকা চাই ৬২
৪৩. তালিবে ইলম ও নাস্তার গুরুত্ব ৬২
৪৪. কাজের মানুষ সাধারণত বেশি মোটা হয় না ৬৩
৪৫. বুযুর্গানে দ্বীনের আহার কম করার অবস্থা ৬৪
৪৬. ছাত্রদেরও সুন্নাত-নাওয়াফিলের ইহতিমাম করা উচিত ৬৪
৪৭. ছাত্রদের জন্য কিছু উপকারী মামূলাত ৬৫
৪৮. ছাত্রদের তারবিয়ত ৬৫
৪৯. উপরের জামাআতের ছাত্রদের মাঝে মাঝে প্রাথমিক কিতাবসমূহও দেখা উচিত ৬৬
৫০. ছাত্রদের জামাআত ছুটে যাওয়া বড় তাজ্জবের ব্যাপার ৬৬

বিষয় | পৃষ্ঠা

৫১. তোমরা নিজেরা যদি নেক এবং দ্বীনদার হতে না চা তাহলে অন্যরা কিছু করতে পারবে না ৬৮
৫২. মহান আল্লাহর অবাধ্যতার ক্ষতি ৬৮
৫৩. দ্বীনী মাদরাসাগুলোতে আল্লাহ পাকের রহমত কখন নাযিল হয়? ৬৯
৫৪. পরিবেশের প্রভাব ৬৯
৫৫. আজ ছাত্রদের থেকে ফয়েয লাভ হচ্ছে না কেন? ৭০
৫৬. ছাত্রদেরকে আদব দান ও সতর্ক করা ৭১
৫৭. কষ্টের কথা ৭১
৫৮. মাদরাসায় কাজের ছাত্র পরিমাণে কম হলেও হাজারো ছাত্রের ভীড়ে অনন্য ৭২
৫৯. এটা উন্নতি নয় অবনতি ৭২
৬০. অভ্যাস ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায় ৭৩
৬১. ছাত্ররা আন্তরিক হলে মাদরাসায় দ্বীনী পরিবেশ হতে পারে ৭৩
৬২. একটি কিতাবের সমাপ্তি উপলক্ষে ছাত্রদেরকে নসীহত ৪১
৬৩. ইফতা এবং সদ্যফারেগ ছাত্রদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ নসীহত ৭৪
৬৪. এক মাদরাসার নাযেম ছাহেবের ছেলেকে নসীহত ৭৬
৬৫. নাযেম না হওয়া, খাদেম হওয়া ৭৬
৬৬. নিজের ছেলেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নসীহত ৭৬
৬৭. ছাত্রদের কামেল হওয়ার একটি পদ্ধতি ৭৮
৬৮. ইসলাহের উপকারী ও সহজ ব্যবস্থাপত্র। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য দুটো জরুরী মুরাকাবা ৭৯
৬৯. ছাত্ররা ইশার পর কী করবে? ৭৯
৭০. ইশার পর কথাবার্তা বলা এবং অনর্থক বিদ্যুৎ ব্যবহার করা নিষেধ ৮০
৭১. এই যিকির বিদআত নয় ৮১
৭২. সমালোচনার দ্বারা নয়; অনুসরণের দ্বারা কাজ হয় ৮২
৭৩. এক ব্যক্তির আপত্তি ও তার উত্তর ৮২
৭৪. বড়দের ভুলের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব উপযুক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করা উচিত ৮৩
৭৫. বুখারী শরীফ-মিশকাত শরীফের হিফয ৮৩
৭৬. হযরতওয়ালার আমলী হেকমত, দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা ৮৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
৭৭. শুধু ইলম আর বয়ান করার ক্ষমতা যথেষ্ট নয়। আমল এবং তাকওয়াও জরুরী	৮৪
৭৮. উলামায়ে কেরামের পাকড়াও খুব শক্ত হবে	৮৫
৭৯. মাদরাসায় কাজের মানুষ কেন পাওয়া যায় না?	৮৫
৮০. সবক পড়ানোর গুরুত্ব	৮৬
৮১. জলসার কারণে সবক বাদ দেওয়া অনুচিত	৮৭
৮২. সবক পড়ানোর পদ্ধতি	৮৭
৮৩. সবক পড়ানোর অপূর্ব পদ্ধতি	৮৭
৮৪. পেশোয়ারের একটি মাদরাসার ব্যবস্থাপনা এবং পড়ানোর অদ্ভূত নিয়ম	৮৮
৮৫. আমাদের অঞ্চলের দুর্ভাগ্য	৮৯
৮৬. বিরোধিতা না করাও আল্লাহর বড় নেয়ামত	৮৯
৮৭. মুতালাআ ব্যতীত পড়ানো অনুচিত	৮৯
৮৮. সবকে ছাত্র ব্যতীত অন্যদের অংশগ্রহণ	৯০
৮৯. প্রথম যুগের মেহনত সব সময় কাজে আসে	৯১
৯০. যোগ্যতা সৃষ্টি না হওয়ার ক্ষেত্রে ছাত্রদের দায় বেশি	৯১
৯১. হযরত শাহ অসিয়্যুল্লাহ ছাহেব রহ. এর বাণী : “মুতালাআ ব্যতীত পড়াকে আমি হারাম মনে করি”	৯১
৯২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের রহ. অবস্থা	৯২
৯৩. মাদরাসাগুলোতে পদমর্যাদা এবং কিতাব বণ্টনের ক্ষেত্রে ইনসাফপ্রিয়তা এবং হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর ঘটনা	৯২
৯৪. ফেতনা দমন করার চেষ্টা করবে	৯৩
৯৫. দ্বীনের কাজের আগ্রহ কাম্য	৯৩
৯৬. আদবের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি কাম্য নয়	৯৪
৯৭. দ্বীনের খাতিরে দুনিয়াদার এবং মালদারদের সাথে সাক্ষাৎ করা	৯৪
৯৮. চুরির শাস্তি চোর অবশ্যই পাবে	৯৫
৯৯. হে আল্লাহ! চোরকে আপনি ধ্বংস করুন	৯৬
১০০. একটি টর্চলাইট চুরির ঘটনা এবং হযরতের ইরশাদ	৯৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
১০১. এমন ব্যক্তি খুব দ্রুত অপদস্থ হয়	৯৭
১০২. চুরির অভ্যাস হয় কিভাবে? একজন চোর মৌলভী ছাহেবের ঘটনা	৯৮
১০৩. এক চোরের কারণে পুরো জামাআতের বদনাম হয়	৯৮
১০৪. চুরি করার দুঃসাহস ঐ ব্যক্তিই করতে পারে যার অন্তরে আল্লাহর ভয় এবং বিশ্বাস নেই	৯৯
১০৫. মাওলানা মুযাফফার হুসাইন ছাহেব রহ.-এর ঘটনা	১০০
১০৬. মাদরাসা থেকে জনৈক ছাত্রকে বহিষ্কার	১০১
১০৭. কুকুরের উপর যুলুমের অপরাধে ছাত্রদেরকে বহিষ্কারের হুমকী	১০২
১০৮. স্বীয় মেহনত ও প্রচেষ্টা ব্যতীত কিছুই হাসিল হয় না	১০২
১০৯. মুজাহাদা ও রিয়াযত ব্যতীত ভালো কাজের যোগ্যতা সৃষ্টি হয় না	১০৩
১১০. এমন ইবাদত ইবাদতই নয় যার মধ্যে ঘরওয়ালাদের হক নষ্ট হয়	১০৪
১১১. মুজাহাদার মর্ম	১০৪
১১২. প্রথমে যে মুজাহাদা করে সে মুজাহাদা করায়	১০৫
১১৩. নিজেকে লুকিয়ে রাখার জীবনই ভালো	১০৫
১১৪. হযরতের পীর ও মুরশিদ হযরত নাযেম ছাহেব রহ.-এর অবস্থা	১০৬
১১৫. শাহ আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ.-এর অবস্থা	১০৬
১১৬. দিল থেকে যিকির জারী হওয়ার অর্থ	১০৬
১১৭. এক বুযুর্গের ঘটনা	১০৭
১১৮. নামাযের মধ্যে এখতিয়ার বহির্ভূত খেয়াল আসা খুশুখুযূর বিপরীত নয়। ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণার চিকিৎসা	১০৭
১১৯. নামাযের মধ্যে খুশুর হাকীকত এবং সেটা অর্জন করার পদ্ধতি	১০৮
১২০. অহংকার হল সর্বরোগের মূল এবং এর চিকিৎসা	১০৮
১২১. কৃতিত্ব তো এটাই যে, গোস্বা আসার পরও ধৈর্যধারণ করবে ও চুপ থাকবে	১০৯
১২২. নিসবত, ইজাযত ও খেলাফতের হাকীকত	১১০
১২৩. নিজ ছোটদের সামনেও নিজ বড়দের খেদমত ও তাঁদের সম্মান করা চাই	১১১
১২৪. জীবনী লেখার ব্যাপারে হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ.-এর চিন্তাধারা	১১১
১২৫. একটি দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা; আল্লাহ তাআলা যাকে ধ্বংস করতে চান তাকে নেক বান্দাদের পিছনে লাগিয়ে দেন	১১২

বিষয়	পৃষ্ঠা

১২৬. স্বপ্ন যার-তার কাছে বলা উচিত নয় ১১৩
১২৭. স্বপ্নে আল্লাহ পাকের যিয়ারত ১১৪
১২৮. মিসওয়াক বিহীন উযু এবং জামাআত বিহীন নামায ১১৪
১২৯. জমিনের উপর নামায পড়া ১১৪
১৩০. তাকওয়ার গুরুত্ব ১১৫
১৩১. হযরত শাহ অসিয়্যুল্লাহ ছাহেব রহ.এর ঘটনা ১১৫
১৩২. আমাদের বড়দের তাকওয়া ১১৫
১৩৩. মাওলানা ইনায়েত ইলাহী ছাহেবের তাকওয়া ১১৬
১৩৪. হযরত মাওলানা যহুরুল হক ছাহেব রহ. এর তাকওয়া ১১৬
১৩৫. মাওলানা মুহাম্মাদ মাযহার নানূতভী রহ.এর তাকওয়া ১১৬
১৩৬. হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহ.-এর তাকওয়া ১১৭
১৩৭. হযরত মাওলানা মুযাফ্ফার হুসাইন কান্ধলভী রহ.-এর তাকওয়া ১১৭
১৩৮. হযরত মাওলানা আহমাদ আলী সাহারানপুরী রহ.-এর তাকওয়া ১১৮
১৩৯. যে তাকওয়া অবলম্বন করতে চায় আল্লাহ পাক তাকে সাহায্য করেন ১১৯
১৪০. হযরত ইউসুফ আ. এর ঘটনা ১১৯
১৪১. অনেক সময় বড়দের দ্বারাও ভুল করানো হয় ১২০
১৪২. যতটুকু সামর্থ আছে ততটুকু করো, আল্লাহ সাহায্য করবেন ১২০
১৪৩. যে হারাম থেকে বেঁচে থাকে আল্লাহ তাআলা
তার জন্য হালাল তরীকায় ব্যবস্থা করেন ১২১
১৪৪. শাহ আব্দুল আযীয ছাহেব রহ. এর একজন শিষ্যের অদ্ভূত ঘটনা ১২১
১৪৫. যে ব্যক্তি হারাম থেকে বাঁচে আল্লাহ তাআলা
তার জন্য হালালের দরওয়াযাসমূহ খুলে দেন ১২৩
১৪৬. হযরত শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়্যা ছাহেব রহ.
এর তাওয়াক্কুল ১২৩
১৪৭. বিনা প্রয়োজনে খেদমত নেয়া অনুচিত ১২৪
১৪৮. নামায না পড়লে পেরেশানী দূর হবে না ১২৫
১৪৯. নামায না পড়লে ভূত ও শয়তান তোমাদের উপর সওয়ার থাকবে ১২৫
১৫০. নামায না পড়লে তাবীযের দ্বারা ফায়েদা হবে না ১২৬
১৫১. তাবীয আলেমদের জন্য নয় বরং মূর্খদের জন্য হয় ১২৬

বিষয়	পৃষ্ঠা

১৫২. তাবীযের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ১২৬
১৫৩. বাচ্চাদের জিদের কারণে পেরেশান হওয়া ঠিক নয় ১২৭
১৫৪. তাবীযওয়ালাদের কারণে পেরেশানী এবং দ্বীনী ক্ষতি ১২৭
১৫৫. শিক্ষিত ও দ্বীনদার মানুষের মধ্যেও যাদুটোনা ও
দুষ্ট আত্মার আশঙ্কা ১২৮
১৫৬. হিংসুকদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পাওয়ার আমল ১২৯
১৫৭. দৃষ্টি শক্তিশালী হওয়ার একটি আমল ১২৯
১৫৮. তাবীযের দ্বারা উপকার হয়নি তো ব্যস
আল্লাহর নিকট দুআ করো ১২৯
১৫৯. অসুস্থতা নাকি সন্দেহ ১৩০
১৬০. একটি ঘটনা ১৩০
১৬১. বান্দার মুন্নু ভাইয়ের ঘটনা : স্ত্রী নেককার হলে
স্বামীকেও নেককার বানিয়ে দেয় ১৩১
১৬২. বান্দা শহরে হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মাদ তায়্যিব ছাহেব রহ.-এর
আগমন বিরোধীপক্ষের ফেতনা সৃষ্টির অপচেষ্টা এবং
আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্যের অত্যাশ্চর্য ঘটনা ১৩২
১৬৩. বিদআতী সম্প্রদায়ের বিশৃংখলা সৃষ্টি এবং ব্যর্থ প্রচেষ্টা ১৩৩
১৬৪. হজ্ব বাজি ১৩৪
১৬৫. বাসযোগে হজ্বের সফর ১৩৪
১৬৬. সুদখোরের ঘটনা ১৩৫
১৬৭. সূরা ফাতিহার সংক্ষিপ্ত তাফসীর ১৩৬

ইসলাহে মু'আশারাহ বা সমাজ সংশোধন # ১৩৮-১৬৭

১৬৮. বিবাহ একটি ইবাদত, এটাকে ইবাদত মনে করে
মসজিদে করা উচিত ১৩৮
১৬৯. আত্মীয়তার সম্পর্ক করার পূর্বে ছেলের মেযাজও দেখা উচিত ১৩৯
১৭০. নেককার মহিলাদের অবস্থা ও তাঁদের গুণাবলী ১৪০
১৭১. নারী বদদ্বীন হলে পুরো ঘর বদদ্বীন হয়ে যাবে ১৪১
১৭২. লেনদেনের শুদ্ধতা এবং ব্যবস্থাপনাগত
ব্যাপারে নবীগণের আ. শিক্ষা ১৪২
১৭৩. মায়ের পর খালার গুরুত্ব ১৪৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
১৭৪. আত্মীয় স্বজনের হক	১৪৪
১৭৫. গরীব আত্মীয় স্বজনের গুরুত্ব	১৪৪
১৭৬. দ্বীনদার ও গরীব মানুষের মূল্যায়ন এবং তাঁদের জানাযায় অংশগ্রহণের চিন্তা	১৪৫
১৭৭. নতুন সভ্যতার দুটি জিনিস আমার খুব পসন্দ	১৪৫
১৭৮. ঘরের দরওয়াযায় কলিং বেল লাগানোর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	১৪৬
১৭৯. দ্বীন এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কহীনতার পরিণাম	১৪৬
১৮০. অত্যাচারী ছেলে অত্যাচারিত মা	১৪৭
১৮১. মেহমানদের জন্য নাস্তা বা খানায় অন্যকে শরীক করা জায়েয নেই	১৪৮
১৮২. জনৈক মেহমানকে সতর্ক করার চিত্তাকর্ষক ঘটনা	১৪৮
১৮৩. মেহমানদেরকে খাওয়ানোর জন্য অন্যদের থেকে খানা আনা	১৫০
১৮৪. মাওলানা মুযাফ্ফার হুসাইন কান্ধলভী রহ. ও মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. এর সরলতা ও অকৃত্রিমতা	১৫০
১৮৫. অকৃত্রিম ও সাদাসিধে সামাজিকতা	১৫১
১৮৬. কানাআত বা অল্পে তুষ্টি	১৫২
১৮৭. ঈদে মিলাদুন্নবীর নামে জলসা জুলূস ও সাজসজ্জা	১৫২
১৮৮. ফেরকাভিত্তিক দাঙ্গা হাঙ্গামার সময় মযলূম মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মালফূয	১৫৪
১৮৯. কাজের মধ্যে হেকমত অবলম্বন না করার ক্ষতি	১৫৫
১৯০. কাযী মুজাহিদুল ইসলাম রহ.-এর প্রশংসা	১৫৬
১৯১. মুসলমানদের উচিত শরয়ী আদালতের মাধ্যমে নিজেদের সমস্যার সমাধান করানো	১৫৬
১৯২. শাইখুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ ইউনুস ছাহেব রহ. এর প্রশংসা	১৫৭
১৯৩. ইলমের অবমূল্যায়ন কেন?	১৫৭
১৯৪. ফকীহ এবং মুফতীর জন্য বালাগাত ও মাআনী সম্পর্কে অবগতিও জরুরী	১৫৮
১৯৫. দাড়ি মুণ্ডনকারী ও কর্তনকারী হাফেয ছাহেবদের উপর তারাবীহ নামায না পড়ানোর পাবন্দী লাগিয়োনা বরং চেষ্টা করতে হবে যেন তারা শরীয়াহ মুতাবিক দাড়িও রাখে	১৫৮
১৯৬. পূর্বসুরীদের অনুগ্রহ	১৫৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
১৯৭. জনৈক বিদআতীর প্রশ্ন ও তার উত্তর	১৬০
১৯৮. শর্ত নেই তো শর্তযুক্ত জিনিসও নেই	১৬০
১৯৯. বড়দের কথা পরবর্তীতে মনে পড়ে	১৬১
২০০. আযানের কতিপয় কালিমায় মাদ্দ	১৬১
২০১. কাকতালীয় কিছু ঘটে যাওয়ার উদাহরণ	১৬১
২০২. নূরুল আনওয়ার, হুসামী, আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ির ও শরহে বিকায়াহ	১৬২
২০৩. গোসল করার উপকার ও সুন্নাত অনুসরণের বরকত	১৬৩
২০৪. স্মৃতিশক্তিও মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও দান	১৬৩
২০৫. মুসাফিরখানা বানানোর অভিলাষ	১৬৪
২০৬. সুপারিশীপত্র কার নিকট লেখা যায়?	১৬৪
২০৭. বিনা অনুমতিতে অন্যের বই ছাপানোর উপর অসন্তোষ প্রকাশ	১৬৫
২০৮. মূর্খ লেখকদের মূর্খতা	১৬৬
২০৯. একটি কৌতুক	১৬৭
২১০. আরেকটি কৌতুক	১৬৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মাজালিসে সিদ্দীক

১. পূর্বসুরী বুযুর্গানে দ্বীনের জীবনী ও ঘটনাবলী পড়ার জন্য উৎসাহ প্রদান

একটি কিতাবের দারস দেওয়ার সময় হযরতওয়ালা ফার্সী কিছু কবিতা পাঠ করেন। অতঃপর সেগুলোর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বয়ান করেন। যার সারকথা হল-

যদি তোমরা এটা কামনা কর যে, তোমাদের অন্তরের দাগ সবুজ-শ্যামল, সজীব-সতেজ থাকবে, তাহলে পূর্বসুরী বুযুর্গানে দ্বীনের জীবনী পাঠ কর। তাঁদের জীবনী পাঠ করলে অন্তরে একটি চোট্ লাগবে যে, তাঁরা কী ছিলেন? আর আমরা কী? যখন ঐ দাগ সতেজ ও তাজা হবে, তখন অন্তরও সতেজ হয়ে উঠবে। কেননা যখন অন্তরে দাগ হয় (চোট্ লাগে) তখন সেটার প্রতিক্রিয়া অবশ্যই হয়। যেমন দাগ হবে সেরকমই প্রতিক্রিয়া হবে। ভালো দাগ হবে তো ভালো প্রভাব পড়বে।

মহান পূর্বসুরীদের জীবনী পাঠ করলে বুঝতে পারবে, তাঁরা দ্বীনের জন্য কী কী ত্যাগ স্বীকার করেছেন। অমুক বুযুর্গ এটা করেছেন।

এভাবে দিলে চোট্ লাগবে এবং কাজ করার হিম্মত হবে।

২. হযরতের উস্তায ইমামুন্নাহু মাওলানা সিদ্দীক আহমদ ছাহেব (রহ.)-এর ঘটনা

হযরতওয়ালা বান্ধাভী রহ. বলেন : আমার উস্তায হযরত মাওলানা সিদ্দীক আহমাদ ছাহেব রহ. কে নাহুর (আরবী ব্যাকরণশাস্ত্র) ইমাম মনে করা হত। মাযাহেরে উলূম সাহারানপুরে সামান্য বেতনে শিক্ষকতা করতেন। অবস্থা এই

ছিল যে, অনাহারের পর অনাহার চলত। তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করতেন। বিভিন্ন স্থান থেকে মোটা অংকের বেতনে চাকুরী করার প্রস্তাব এসেছে। কিন্তু মাওলানা কোথাও যাননি। দারুল উলূম দেওবন্দের কর্তৃপক্ষও দাওয়াত করেছেন। তাঁরা বলতেন যে, ব্যস, "মাওলানা সিদ্দীক ছাহেবের কমতি আছে"। দক্ষ শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। আর মাওলানা সিদ্দীক ছাহেব নাহুর ইমাম ছিলেন। এ জন্য দেওবন্দ মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তাঁকে বারবার দাওয়াত দিতেন। কিন্তু মাওলানা যাননি। অনাহার আর দারিদ্রের যিন্দেগী কাটিয়ে চলে গেছেন। আরে যিন্দেগী তো একভাবে না একভাবে কেটেই যায়। যা তাকদীরে ছিল তাই খেয়েছেন, পান করেছেন। কিন্তু নমূনা হয়ে থেকেছেন। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য উত্তম নমূনা রেখে গেছেন। পরবর্তী লোকেরা দেখুক এমনটিও হতে পারে। এবং এভাবেও জীবন যাপন করা হয়।

কারো উপর কোন বিপদ আসলে অন্যের অবস্থা দেখে সান্ত্বনা লাভ করা চাই যে, আমার পূর্বেও মানুষদের সামনে এ জাতীয় অবস্থা এসেছে। এটা নতুন কোন ঘটনা নয়। এ জাতীয় মুহূর্তে তাঁরা কী করেছেন? সেটাই আমাদেরও করা উচিত।

বুযুর্গানে দ্বীনের হালাত ও জীবনী পাঠ করলে মনে দারুণ শক্তি পাওয়া যায়।

৩. হযরত ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর অবস্থা

হযরতওয়ালা বান্ধাভী রহ. বলেন : আমাদের পূর্বসুরীরা তো এমন ছিলেন যে, ইলম হাসিল করার জন্য যখন বের হয়েছেন তখন বছরের পর বছর ঘরে ফিরে আসেননি। হযরত ইমাম শাফেয়ী রহ. ইলম শেখার জন্য গিয়েছেন তো তের বছর পর ফিরে এসেছেন। তাঁর আম্মা একলা থাকতেন। কিন্তু শুধুমাত্র ইলমের জন্য ধৈর্যধারণ করেছেন। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী রহ. এ সময়ে নিজের খবরাখবর তাঁর আম্মাকে পৌঁছাতে থাকতেন। যখন কোনো কাফেলা যেত, তাদের মাধ্যমে সংবাদ পাঠিয়ে দিতেন।

স্বয়ং আমাদের এলাকাতেও এমনও মানুষ গত হয়েছেন। তিনি ইলম অর্জনের জন্য বের হয়ে বহু বছর পর ফিরেছেন। বড় দ্বীনদার, মুত্তাকী, পরহেযগার ছিলেন। তাঁর প্রচুর কাশফ হত। ঐ এলাকার তিনিই সর্বপ্রথম আলেম। কিন্তু আফসোস! আজ তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাদের আত্মীয়দের সাথে ঝগড়া করে।

৪. বুযুর্গানে দ্বীনের সাথে সম্পর্ক রাখার গুরুত্ব

হযরতওয়ালা বান্ধাভী (রহ.) বলেন : মানুষ নিজের বড়দের সাথে সম্পর্ক রাখে না। আর নিজেকে তাঁদের থেকে বড় মনে করে। প্রত্যেকটা কাজ নিজ মর্জি মত করে। বড়দের কোন দিকনির্দেশনাও নেয় না। তাঁদের সাথে পরামর্শও করে না। তাঁদের সাথে সাক্ষাৎও করে না।

এজন্যই আজকাল আমাদের কাজের মধ্যে বরকত নেই। আর যে পরিমাণ ফয়েয থাকা দরকার সে পরিমাণ ফয়েয নেই।

মাশওয়ারা বা পরামর্শের মধ্যে আল্লাহ তাআলা খায়র ও বরকত রেখেছেন। পরামর্শের ভিত্তিতে যে কাজ করা হয়, তার মধ্যে খাইর ও বরকত হয়। এজন্য যে কোন কাজ করার পূর্বে প্রথমে নিজের মুরব্বীদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করবে। তাঁদের সাথে পরামর্শ করবে। নিজের মত অনুযায়ী কখনো কাজ করবে না। অতঃপর দেখবে ইনশাআল্লাহ খাইর ও বরকত হবে।

বর্তমানে অনেকে মাদরাসা পরিচালনা করেন। নিজেই মাদরাসা খুলে মুহতামিম ও নাযেম বনে যান। যা মনে চায় তাই করেন। কাউকে কিছু জিজ্ঞেসও করেন না। পরামর্শও করেন না। যাকে মনে চায় রাখেন যাকে মনে চায় বের করে দেন।

এজন্যই বর্তমানে মাদরাসাগুলোর মধ্যে খাইর নেই। ইসলাহের কাজ হচ্ছে না। আর যে পরিমাণ ফয়েয হওয়ার কথা ছিল সেটাও হচ্ছে না।

৫. বুযুর্গানে দ্বীনের সাথে সম্পর্ক রাখার পদ্ধতি

হযরতওয়ালা বান্ধাভী (রহ.) বলেন : হযরত আব্দুর রহমান বিন কাসেম রহ. হযরত ইমাম মালেক রহ. এর খেদমতে বিশ বছর ছিলেন। আঠারো বছর পর্যন্ত তো ইলমে আদব ও আখলাক (ইসলাহে নফস বা আত্মসংশোধন) শিখেছেন। আর দুই বৎসর ইলমে যাহের বা বাহ্যিক ইলম শিখেছেন। অথচ বর্তমানে আমাদের দ্বীনী মাদরাসাগুলোতে আদব-আখলাক ও ইসলাহে নফসের কোন ঘরই নেই।

ছাত্ররা এক বৎসর এ মাদরাসায় পড়ে তো আরেক বৎসর পড়ে ঐ মাদরাসায়। এভাবে নাচানাচি করে। এ কারণেই তাদের মযবূত ইলমী যোগ্যতাও সৃষ্টি হয় না। আর দিলের রোগের সংশোধনও হয় না। কেননা ইসলাহে নফস ও বাতেনী ফুয়ূয যা বুযুর্গানে দ্বীন থেকে হাসিল হয়, সেটা তো মহব্বত ও ভক্তির পরে হয়। আর মহব্বত ও ভক্তি সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয় না

বরং ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়। যখন মহব্বত পয়দা হয় তখন ধীরে ধীরে তার আখলাকের প্রভাব এর উপর পড়ে।

এখন যদি এক বছর কোন বুযুর্গের কাছে থাকে, আর কম বেশি মনের মিল পয়দা হয়। এরপর ঐ স্থান ছেড়ে অন্য স্থানে চলে গেল। এক বৎসর পর সেখান থেকেও চলে গেল!! এদিকেরও হল না ঐ দিকেরও হল না। কারো সাথেই মুনাসাবাত সৃষ্টি হল না। কোন মুরব্বীর রঙ তার উপর পড়ল না। এ জন্য কোন স্থানে থাকলে জমে থাকবে। কারো সাথে সম্পর্ক করলে সেটা ধরে রাখবে। তাহলেই ধাপে ধাপে ফায়েদা হয়। এক মুহূর্তেই ফয়েয পৌঁছে না। বরং মুনাসাবাত যত বেশি বাড়তে থাকে উত্তরোত্তর ফয়েযও তত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বর্তমানে আমাদের ইসলাহ বা সংশোধন না হওয়ার কারণ এটাই যে, কারো সাথে মনের মিল হয় না। এ জন্য আমরা কারো থেকে পুরোপুরি উপকৃত হতে পারি না।

৬. বুযুর্গদের আগমন এবং তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করাও আল্লাহ পাকের দান

হযরতওয়ালা বান্ধাভী (রহ.) বলেন : বান্দাগণের উপর আল্লাহ তাআলার অসংখ্য নেয়মত আছে। যদি ঐসব নেয়ামতের শোকর আদায় করা হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা নেয়ামত আরো বাড়িয়ে দেন। নেয়ামতের কদর না করলে আল্লাহ তাআলা নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করে দেন। নেয়ামত তো মহান আল্লাহর অনেক। কিন্তু কিছু কিছু নেয়ামত আছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর সেটা হল আল্লাহ পাকের নেক বান্দাগণের সাহচর্য। তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করা ও তাঁদের সান্নিধ্য। এইসব আল্লাহ পাকের অনেক বড় নেয়ামত।

মাদরাসার বরকতে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর অনেক বান্দা এখানে আসতে থাকেন। তাঁদের সাথে সাক্ষাৎকে গনীমত মনে করা উচিত। তাঁরা আগমন করলে তাঁদের থেকে উপকার গ্রহণ করা উচিত। তাঁদের কথা মনোযোগের সাথে শোনা উচিত।

আজকে যে মেহমান এখানে এসেছেন (মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ সালমান ছাহেব মনসূরপুরী, উস্তায মাদরাসায়ে শাহী মুরাদাবাদ।) তিনি হযরত হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. এর দৌহিত্র। মাশাআল্লাহ আল্লাহ পাক তাঁকে ইলম ও আমলের দৌলতে ধন্য করেছেন। তিনি কেমন সেটা আপনারা নিজেরাই দেখতে পাবেন। অতঃপর হযরতওয়ালা ছাত্রদের মজমায় তাঁকে দিয়ে বয়ান করিয়েছেন।

৭. আসাতিযায়ে কেরামকে সম্মান করলে ইলমের মধ্যে উন্নতি হয়

হযরতওয়ালা বান্ধাভী (রহ.) বলেন : আসাতিযা বা শিক্ষকদের আদব খুব জরুরী বিষয়। এর দ্বারা ইলমের মধ্যে বরকত হয়। ইলম অর্জনের অনেক পদ্ধতি আছে। তার মধ্যে আদবও একটি। আদব দ্বারা ইলম হাসিল হয়।

ইমাম মালেক রহ. বলেন : আমি পড়ার তুলনায় আদবের মাধ্যমে বেশি ইলম হাসিল করেছি। উস্তাযের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হলে উস্তাযের অন্তরে ঐ ছাত্রের কদর হয়। কলব প্রসন্ন হয়। দিল থেকে দুআ বের হয়। উস্তাযের দুআও ক্রিয়া করে আবার বদদুআও। উস্তাযের দুআ দ্বারা ইলমের মধ্যে বরকত ও উন্নতি হয়। তাঁকে কখনো নারায করবে না। যদি তিনি কখনো অন্যায়ভাবেও অসন্তুষ্ট হয়ে যান অথবা প্রহারও করেন, তবুও তাঁকে খারাপ মনে করবে না। এবং তাঁর প্রতি বিরাগভাজন হবে না। তাঁর অগোচরে তাঁর সমালোচনা করবে না। অন্তরেও তাঁর সম্মান থাকা উচিত। তোমরা ইলম অর্জনের উপলক্ষ অবলম্বন করো। অতঃপর দেখো ইলমের মধ্যে বরকত হয় কি হয় না?

বর্তমানে আমাদের মধ্যে উস্তাযদের আদব নেই। তাঁদের সামনে দিয়ে দ্রুত হেঁটে চলে যাই। জোরে চিৎকার দেই। মনে হয় যেন উস্তায কোন জিনিসই না। এ জন্যই ইলমের মধ্যে বরকত নেই।

আর যেমনিভাবে উস্তাযের আদব ইহতিরাম করা উচিত, তেমনিভাবে নিজের বড় ও উপরের শ্রেণীর ছাত্র ভাইদেরও সম্মান করা উচিত।

৮. হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবীর রহ. এত উচ্চ মর্যাদা কীভাবে নসীব হল?

হযরতওয়ালা বান্ধাভী (রহ.) বলেন : হযরত মাওলানা (সায়্যিদ আবুল হাসান) আলী মিয়াঁ ছাহেব এ মুহূর্তে দুনিয়ার ইমাম। সিরিয়ায় যান তো বড় বড় মানুষ তাঁর জুতা সোজা করে। তাঁকে খুব যত্ন করে নিজেদের কাছে ডাকে। এ পর্যন্ত অনুরোধ করে যে, হযরত! আপনি আমাদের এখানে এসে থাকবেন।

দামেশকের জামে মসজিদে তাঁকে দাওয়াত দেয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, আপনি বছরে শুধুমাত্র তিন মাসের জন্য এখানে চলে আসুন। আপনার বসবাসের জন্য উন্নত বিল্ডিং হবে। সফরের জন্য বিমানের ব্যবস্থা হবে। আপনার কোন প্রকারের কোন কষ্ট হবে না। কাজও সে রকম কিছু

নয়। স্রেফ প্রতি মাসে ছাত্রদের সামনে চারটি বক্তব্য রাখবেন। মোটা অংকের বেতনও ঠিক করা হয়েছিল।

কিন্তু হযরত মাওলানা পরিষ্কার উত্তর দিয়ে বলেছেন : আমি যেখানে থাকি (ভারতে) সেখানেই কাজের অনেক প্রয়োজন। এজন্য আমার পক্ষে পাবন্দী সম্ভব নয়। তবে খেদমতের উদ্দেশ্যে আমি উপস্থিত হব। যখন সুযোগ হবে, সময় বের করে আমি নিজে উপস্থিত হয়ে যাব। কিন্তু ভাড়া বা সফর খরচ কিছুই নিব না। নিজ খরচেই আসব।

হযরত মাওলানার রহ. এই যে মাকবূলিয়্যাত, এর রহস্য কি? মাওলানার তো আরো সাথী সঙ্গী ছিলেন যাঁরা তাঁর সহপাঠী, কিন্তু তাঁরা কেন এমন হতে পারলেন না? এর কারণ এটাই যে, তিনি তাঁর শিক্ষক মহোদয়দের খুব বেশি সম্মান করতেন। তাঁদেরকে ভালোবাসতেন। তাঁদের খেদমতে উপস্থিত হতেন। প্রতিটি কাজ নিজ বড়দেরকে জিজ্ঞেস করে করতেন। তোমরাও এমন হওয়ার চেষ্টা করো।

৯. হযরত ইমাম বুখারী রহ.-এর অবস্থা

হযরতওয়ালা বান্ধাভী রহ. বলেন : হযরত ইমাম বুখারী রহ. কত বড় ইমাম ও মুহাদ্দিস। ইলমের পাহাড়। স্বীয় শিক্ষকদেরকেও টপকে গিয়েছিলেন। কিন্তু এত বড় হওয়ার পরও তিনি বলতেন : "আফসোস! এখন আর আমাদের শিক্ষকগণ জীবিত নেই। যদি তাঁরা থাকতেন, তাহলে অল্প সময় তাঁদের কাছে গিয়ে বসতাম"।

এটাই আসল কথা। প্রতিটা মানুষের তাঁর শিক্ষকদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা উচিত। তাঁদের কাছে গিয়ে বসা উচিত। এ সবের দ্বারাই বরকত হয়, ফয়েয হয়, উন্নতি হয়।

বর্তমানে তালিবে ইলমদের হোটেলে বসতে, চা-পানের দোকানে আড্ডা দিতে ভালো লাগে। সিনেমা হলে বসতে ভালো লাগে। কিন্তু উস্তায বা বুযুর্গদের নিকট বসতে এবং তাঁদের নিকট যেতে ভালো লাগে না। তার মন চায় না। এটা মনের নষ্ট হওয়া ছাড়া আর কী? এ কারণেই আজ অধঃপতন আর অধঃপতন।

১০. আসল দোষ আমাদের

হযরতওয়ালা বান্ধাভী রহ. বলেন : বর্তমানে শিক্ষকবৃন্দ ও বড়রাও তো এমন নয় যে, ছোটরা তাঁদের নিকট এসে বসবে। আসল দোষ তো

আমাদের, আমাদের সেই যোগ্যতা নেই। সেই আখলাক নেই। ছাত্রদের সাথে যে রকম ব্যবহার করা দরকার আমরা সে রকম করি না। তাহলে ছাত্ররা আমাদের নিকট আসবে কেন? বসবে কেন? আসল দোষ তো আমাদের। প্রথমে আমাদের নিজেদের সংশোধন করা উচিত। কিন্তু যার মাধ্যে সাচ্চা তলব হয়, আল্লাহ তাআলা তাকে বঞ্চিত করেন না। মানুষের উচিত নিজের দোষ দেখা। অন্যের দোষ না দেখা। আমরা যদি আমাদের বড়দের নিকট সাচ্চা তলব নিয়ে যাই, তাহলে নিঃসন্দেহে সাফল্য আমাদের পদচুম্বন করবে। আমাদের অবস্থার উন্নতি হবে। আমাদের ফয়েয ছড়িয়ে পড়বে। তার মধ্যে যোগ্যতা না থাকলে আল্লাহ তাআলা যোগ্যতা দান করবেন। আল্লাহ তাআলা তো শুকনো বৃক্ষের মাধ্যমেও কাজ নেন। ছোট ছোট চড়ুই পাখির দ্বারাও কাজ নেন। আল্লাহ তাআলা তো গায়েব থেকে আওয়াযও শোনাতে পারেন। কিন্তু মানুষের মধ্যে সাচ্চা তলব তো থাকতে হবে।

১১. আমাদের শিক্ষকগণ এমন ছিলেন

হযরতওয়ালা বান্ধাভী (রহ.) বলেন : আমরা এমন এমন শিক্ষক দেখেছি যাঁদের দূর দূরান্ত পর্যন্ত কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

আমি যখন পানিপথ পড়াশোনার জন্য গিয়েছি, তখন আমার উস্তায ছিলেন মাওলানা আব্দুল হালীম ছাহেব। যার দাদা হাতুরা জেলায় ছিলেন। হাতুরার সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। এই নিসবতের কারণেই আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আর এমন মেহনত করে পড়াতেন যে, এমনটি আমি আর কাউকে দেখিনি। শীতকালে রাত আড়াইটায় সবক পড়ানো আরম্ভ করতেন। ছাত্ররা সেখানেই ঘুমাত। আর তাদের কারণে মাওলানাও সেখানেই ঘুমাতেন। এটা তাঁর সারা জীবনের অভ্যাস ছিল। এটা সাধারণ ব্যাপার নয়। বলা সহজ, ছাত্রদেরকে পড়ানোর কারণে বাসায় যেতেন না। ক্লাস রুমেই ঘুমাতেন। রাত আড়াইটায় পড়ানো আরম্ভ করে ফজর পর্যন্ত পড়াতে থাকতেন। আর ফজরের পরে এগার বারটি শাখায় তাফসীর পড়ানোর জন্য যেতেন। ঐ শাখাগুলোও একটা থেকে আরেকটা যথেষ্ট দূরত্বে ছিল। কিন্তু তিনি সব স্থানে নিয়মিত যেতেন। সকল শাখায় পড়িয়ে যুহরের নামাযের পূর্বে ফিরে আসতেন। যুহরের পরে ক্বারী ফাতাহ মুহাম্মাদ ছাহেব তাঁর কাছে হেদায়া পড়তেন। অথচ বয়সের বিচারে সমান সমানই হবেন বরং বড় হবেন। কিন্তু তাঁর কাছে পড়তেন। পূর্ণ দিন পড়ানোর মধ্যে কাটাতেন। কখনো নাস্তা আসলে খেতেন। আর না আসলে না খেয়েই থাকতেন।

আমাকে তিনি কয়েকটি কিতাব পড়াতেন। যতক্ষণ "হেদায়া" ইত্যাদি পড়াতেন, ততক্ষণ আমি ক্বেরাআতে সাবআর ইজরা লিখতাম। কানযুদ দাকায়িকের তাকরীরও লিখতাম। ইজরায় যতটুকু লিখতাম, অতটুকুই সবক হত। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি লিখতেই থাকতাম। যেটা লিখতাম ইশার পর সেটাই পড়তাম। আর পড়ার পর সব ছাত্র সেখানেই শুয়ে পড়তাম। রাত আড়াইটায় পুনরায় সবক আরম্ভ হয়ে যেত, প্রতিদিন এ মামূলই ছিল। সহজ নয়। শুনিয়ে দেওয়া তো সহজ কিন্তু আমল করা কঠিন।

আমি এমন শিক্ষকবৃন্দকে দেখেছি এবং এমন শিক্ষকবৃন্দের নিকট পড়েছি। এজন্য অন্য কারো মেহনত আমার মনে ধরে না। কেউ যত মেহনতই করুক, তাঁদের মত কে করতে পারবে?

ঐ সময় থেকেই আমার এ অভ্যাস গড়ে উঠেছে। ফজরের পূর্বে উঠার অভ্যাস। ঐ সময় তো অনেক কষ্টে রাত-দিন মিলিয়ে মাত্র দুই ঘণ্টা ঘুমানোর জন্য পেতাম। এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করা বা অনর্থক কথাবার্তা বলার তো সময়ই পাওয়া যেত না। এজন্যই এখনো এদিক সেদিকের কথাবার্তা বলতে আমার ভালো লাগে না।

সংকলকের বক্তব্য

অধম সংকলক আরয করছে যে, এটারই প্রভাবে হযরতওয়ালা বান্দাভীও রহ. ফজরের পূর্বেই সবক পড়িয়ে দিতেন। বিশেষত যদি দিনে সফর থাকত, তাহলে রাত্রেই ছাত্রদেরকে জানিয়ে দেওয়া হত যে, ফজরের পূর্বে সবক হবে। ইবারত বা মূলপাঠ তো হযরত ইশার পরই শুনে নিতেন। আর সবক ফজরের পূর্বে পড়িয়ে দিতেন। যাতে করে সফরের কারণে ছাত্রদের সবক বাদ না যায়। আর কিছু কিছু কিতাব স্বতন্ত্রভাবে ফজরের পূর্বেই পড়াতেন। আমি অধম হেদায়া তৃতীয় খণ্ড হযরতওয়ালার নিকট ফজরের পূর্বেই পড়েছি। হযরতওয়ালা তাঁর বাসায় ঘুমাতেন। আমি অধম মাদরাসা থেকে হযরতওয়ালা বাসায় হযরতওয়ালাকে আনতে যেতাম। আবার অনেক সময় হযরত নিজেই তাশরীফ আনতেন। সবক না থাকলে হযরত ফজরের পূর্বে চিঠিপত্রের উত্তর লিখতেন।

১২. ছাত্রদের উপর মেহনত করা হলে এখনও কাজের হতে পারবে

হযরতওয়ালা বান্ধাভী রহ. বলেন : কারখানায় উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্ট সামান তৈরী হয়। বিভিন্ন ডিজাইনের কাপড় তৈরী হয়। কিন্তু মাদরাসার ছাত্র একজন থেকে আরেকজন ভালো বের হয় না কেন? কেননা কাপড় বানানোর মধ্যে

মেহনত করা হয়। সেটার নেগরানী করা হয়। সমস্যা থাকলে সেটার সমাধান করা হয়। এমন নয় যে, সুতা ছিড়ছে তো ছিড়ছেই। আর কাপড় বুনতে থাকবে। কাপড়ের মধ্যে ফাটা ফাঁড়া আসছে তো আসছেই। আর এভাবে কাপড় তৈরী হতে থাকবে!! বরং বাস্তব অবস্থা হল যে অসুবিধা আছে, সঙ্গে সঙ্গে সেটার সংশোধন করা হয়। তখনই উন্নত কাপড় তৈরী হয়। উপর দিয়ে শুধু পলিশ করে দেওয়া হয় না যে, এর লেবেল তো দারুণ চিত্তাকর্ষক কিন্তু ভিতরে নষ্ট মাল! বরং খারাবীকে সঙ্গে সঙ্গে দূর করা হয়। মেহনত করা হয়, নেগরানী করা হয়, তখনই উৎকৃষ্ট পণ্য প্রস্তুত হয়। ছাত্রদের মধ্যেও যদি এমন মেহনত করা হয়, তাঁদের নেগরানী করা হয়। তাদেরকে বানানোর ফিকির ও চেষ্টা করা হয় তাহলে তাদের সংশোধন কেন হবে না? আর কেনইবা তারা বনবে না?

লোহার উপর মেহনত হলে লোহা বনে যায়। মাটির উপর মেহনত করা হলে সে বনে যায়। এটা কিভাবে সম্ভব যে, মানুষের উপর মেহনত করা হবে অথচ সে বনবে না। তাকে বানানোর চেষ্টা তো করতে হবে। শুধু পলিশ করে দিলে কাজ হবে না।

বর্তমানে মাদরাসাগুলোতে ছাত্রদের সংশোধনের দিকে মনোযোগ দেওয়া হয় না। ব্যস, উপর দিয়ে পলিশ করা হয় যে, এ বছর এ পরিমাণ ছাত্র আমাদের মাদরাসা থেকে ফারেগ হয়েছে (নিয়মতান্ত্রিক পড়াশোনা শেষ করেছে) বার্ষিক জলসায় ইশতিহার ছেপে দেয়া হয় যে, এ বছর সদ্য ফারেগ ছাত্রদের সংখ্যা দেড়শত। তাদের দস্তারবন্দী (মাথায় পাগড়ী বাঁধা) হবে। সনদ দেওয়া হবে। এগুলো সবই বায়বীয় অন্তসার শূন্য কাজ। আমলী ময়দানে এগুলোর কোন মূল্যই নেই। এগুলো পলিশ নয় তো কী?

ইশতিহারে ছাপা হয় : মাদরাসার দারুণ উন্নতি হচ্ছে। দুই হাজার ছাত্র। দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে। এত কক্ষ আছে। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। ব্যস এটা পলিশ হয়ে গেল। এর দ্বারা কিছু হয় না। ছাত্রদেরকে বানানোর চেষ্টা করুন যাতে কিছু কাজের ছাত্র বের হয়, এটা হল প্রকৃত উন্নতি। যদি সত্যি সত্যিই ছাত্রদের উপর মেহনত করা হয়, তাহলে তারা কেন বনবে না?

১৩. এমন শিষ্য ও মুরীদদের নিকট ফয়েয পৌঁছে না

হযরতওয়ালা বান্ধাভী রহ. বলেন : এখনো গনীমত যে ছাত্রদেরকে ধমক দেওয়া যায়। সতর্ক করা যায়। তাদেরকে বেহায়া ও বেশরম বলা যায়।

একটা সময় এমনও আসবে যখন ছাত্রদেরকে বেহায়া ও বেশরমও বলতে পারবেন না। বরং কোন কোন মাদরাসায় তো এমন যামানা এসেও গেছে। শুধুমাত্র ধমক দেওয়ার কারণে বা বেহায়া-বেশরম বলার দরুন দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও স্ট্রাইক পর্যন্ত গড়িয়েছে।

যে ছাত্র এমন যে উস্তায তাকে বকা দিতে পারে না, সাবধান করতে পারে না, এমন ছাত্রের ফয়েয পৌঁছে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ছাত্র উস্তাযের সামনে নিজেকে এমনভাবে পেশ না করে যে, উস্তায তাকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে বকা দিতে পারে, অতক্ষণ পর্যন্ত ছাত্র পর্যন্ত ফয়েয পৌঁছে না।

যে ডাক্তার রোগীর চিকিৎসা করতে বা অপারেশন করতে ভয় পায় যে, রোগী আবার অসন্তুষ্ট হয়ে যায় কিনা, তো এমন রোগীর ফায়েদা হয় না। ফায়েদা তো ঐ রোগীর হবে যে নিজেকে সম্পূর্ণ সোপর্দ করে দেয় আর বলে যে আপনি অপারেশন করুন বা না করুন, যেখানে ইচ্ছা অপারেশন করুন, যতটুকু মনে চায় কাটুন। তখনই রোগীর সঠিক চিকিৎসা হবে। তার প্রকৃত উপকার হবে নতুবা নয়।

মুরীদ ও ছাত্রের অবস্থাও তদ্রূপ। যদি উস্তায ছাত্রকে আর পীর ছাহেব মুরীদকে ভয় করে, তাহলে এমতাবস্থায় ঐ ছাত্র বা মুরীদের কী ফায়েদা হবে?

১৪. বর্তমানে আসাতিযায়ে কিরাম ও মাশায়িখে ইযাম দ্বারা ফয়েয পৌঁছে না কেন?

হযরতওয়ালা বান্ধাভী রহ. বলেন : বর্তমানে তো অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে, উস্তায ছাত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আর পীর ছাহেব মুরীদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। উস্তায ভয় পায় যে, ছাত্র আবার নারায হয়ে যায় কিনা? পীর ছাহেব চিন্তা করেন যে, মুরীদ আবার অসন্তুষ্ট হয়ে যায় কিনা?

ছাত্র ও মুরীদের প্রতি লক্ষ রাখা হয় যাতে তারা রুষ্ট হয়ে চলে না যায়। তো এমন ছাত্র ও মুরীদের কখনো উপকার হবে কি? এদের দ্বারা ফয়েয হবে? পূর্বের যুগে মানুষ সব কিছু সহ্য করত। উস্তায ছাত্রকে, পীর মুরীদকে। চাই যতই বকা দিক বা মারুক সবকিছু বরদাশত করত। ফলে তাঁরা কিছু একটা হয়ে বের হতেন। পুরো এলাকা তাঁর মাধ্যমে উপকৃত হত।

এখন ঐ জিনিস কোথায়? কিন্তু সিলসিলা এখনো বন্ধ হয়নি। এখনো যদি কেউ মুজাহাদা করে সবকিছু বরদাশত করে। বড়কে মেনে চলে, তাহলে আজও বনতে পারবে।

জুনায়েদ বাগদাদী, ইমাম রাযী, গাযালী রহ. প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য মুসলিম মনীষীবৃন্দ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হননি। এ পৃথিবীতেই বনেছেন। কারো অধীনে থেকেছেন। মেহনত ও মুজাহাদা করেছেন। সবকিছু বরদাশত করেছেন। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে চমকিয়েছেন এবং তাঁদের দ্বারা দ্বীনের বহুমুখী কাজ নিয়েছেন।

১৫. শাহ আব্দুল কাদের ছাহেব রায়পুরী এবং শাহ আব্দুর রহীম ছাহেব রায়পুরী রহ.-এর ঘটনা

হযরতওয়ালা বান্ধাভী রহ. বলেন : শাহ আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ. শাহ আব্দুর রহীম ছাহেব রায়পুরী রহ. এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বাইআতের দরখাস্ত করলেন। শাহ আব্দুর রহীম ছাহেব হলেন হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. এর বিশিষ্ট খলীফা। গাঙ্গুহী রহ. তখনো জীবিত। শাহ আব্দুর রহীম ছাহেব রহ. বললেন : "আমার শাইখ মাওলানা গাঙ্গুহী রহ. তো এখনো জীবিত আছেন। তাঁর কাছে যাও। সেখানে ফায়েদা বেশি হবে। তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজন স্বীকৃত। প্রত্যুত্তরে শাহ আব্দুল কাদের ছাহেব রহ বললেন : "হযরত! আপনি যা কিছু বললেন : সব ঠিক। কিন্তু আমি তো আপনার কাছেই হাযির হয়েছি। আপনার এখান থেকেই আমাকে যা নেওয়ার নিতে হবে।"

ব্যস, এখানেই পড়ে থাকলেন। সরার নামও নিলেন না। অতঃপর দেখুন আল্লাহ তাআলা তাঁকে কীভাবে সম্মানিত করেছেন। ভরে ভরে দিয়েছেন। ছাপ্পড় ফেড়ে দিয়েছেন। তাঁর মাধ্যমে কত মানুষ উপকৃত হয়েছেন। তাঁর মুরীদের সংখ্যাই তো প্রায় এক লাখ।

পীরের সাথে এমন মহব্বতই থাকা চাই। নজর থাকবে একমাত্র তাঁর দিকেই। মজনু লায়লাকে ভালোবাসত। ফলে লায়লার কুকুরকেও ভালোবাসত। যার সাথে মানুষের মহব্বত হয়ে যায়, তার প্রতিটি জিনিসের সাথে মহব্বত হয়ে যায়।

১৬. বনা বা বিগড়ানোর যমানা তালেবে ইলমীরই যমানা

হযরতওয়ালা বান্ধাভী রহ. বলেন : তালিবে ইলম যদি তালিবে ইলমীর যমানায় বনে যায়, তাহলে তো বনে গেল। আর যদি বিগড়ে যায় তাহলে বিগড়ে গেল। পরে আর বনতে পারবে না। খুব কঠিন। এর উদাহরণ হল স্বর্ণের হারের মতো। হার বনার সময় যদি স্বর্ণকে খুব জ্বালানো হয়, উত্তপ্ত

করা হয়, তাহলে হার ভালো বনবে। পক্ষান্তরে যদি বনার সময়েই স্বর্ণে খুঁত থাকে, তাহলে ঐ হারে খুঁতই থাকবে। সেটা কখনো দূর হবে না। রাজা বা রাজার কন্যার কাছে গেলেও ঐ খুঁত ঠিকই থাকবে। এমন নয় যে অমুক সুদর্শন-সম্পদশালী, ফলে তার জন্য স্বর্ণের খুঁত আর থাকবে না। ঠিক তদ্রূপ তালিবে ইলম যদি তালিবে ইলমীর যমানায় না বনে, তাহলে তার মধ্যে এই খুঁত সব সময় থেকে যাবে। সে পড়ালেখা করে ফারেগ হয়ে যাবে। কোন মাদরাসার মুদাররিস, মুহতামিম ও নাযিমও হয়ে যাবে কিন্তু তারপরও তার মধ্যে খুঁত থেকে যাবে। কেননা বনার সময় তার মধ্যে খুঁত রয়ে গিয়েছিল অবশ্য এরপরও বনার একটি সূরত আছে। আর সেটা হল এই যে, স্বর্ণে যদি খুঁত থাকে তাহলে তাকে পুনরায় জ্বালাতে হবে। এর পেছনে মেহনত করতে হবে। তবেই এর খুঁত দূর হবে।

এমনিভাবে তালিবে ইলম যদি ফারেগ হওয়ার পর জ্বলা, পেষা ও মুজাহাদার জন্য প্রস্তুত থাকে, তাহলে তারও সংশোধন হতে পারে।

কিন্তু এমনটি খুব মুশকিল। মুদাররিস, নাযিম ও শাইখুল হাদীস হওয়ার পর ছোট হওয়া কি এত সহজ? কারো জুতা সোজা করা কি এত আসান? তখন তো নিজের কাজ নিজে করতেও লজ্জা লাগে। এ জন্য এমন ব্যক্তির মধ্যে সব সময় খুঁত থেকে যায়। তার রোগ কখনো দূর হয় না। সে যেখানেই যাক না কেন তার মধ্যে ঐ রোগ থাকবে। কোন বুযুর্গের নিকট গেল বা খানকায় গেল, তবুও তার ঐ খুঁত অবশিষ্ট থাকবে। কেননা বনার সময়েই তার মধ্যে খুঁত রয়ে গিয়েছিল।

এ জন্য শুনে নিন। এই সময়টা হল বনা বা বিগড়ানোর সময়। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে ভালো পরিবেশ এবং ভালো হওয়ার স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখানে কুরআন শরীফ পড়ার পরিবেশ। দ্বীনী কথাবার্তা বলা শোনা এবং অন্যায় কাজে বাধা দেওয়ার মতো পরিবেশ। এই পরিবেশের মূল্যায়ন করলে আরো উন্নতি নসীব হবে। ইরশাদ হচ্ছে-

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

অর্থাৎ "যদি তোমরা শোকর বা কৃতজ্ঞতা আদায় করো তাহলে আমি অবশ্যই অবশ্যই তোমাদেরকে আরো বাড়িয়ে দিব। আর যদি নাশোকরী করো তাহলে মনে রেখ নিশ্চয়ই আমার আযাব ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক।"

(সূরা ইবরাহীম, আয়াত ৭)

মানুষের অবস্থা এক রকম থাকে না। কিছু দিন পর তোমাদের অবস্থা অন্য রকম হয়ে যাবে। ঘরে তোমাদের অবস্থা হবে আরেক রকম। পরবর্তীতে যদি তোমরা কিছু করতেও চাও, তাহলে খুব কঠিন হবে। এ জন্য যা কিছু করার এখনই করে নাও। নিজেকে বানাতে হলে এখনই বানিয়ে নাও। আজকের থেকেই এর ফিকির শুরু করে দাও। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তাউফীক নসীব করুন। আমীন।

১৭. যদি মাদরাসায় থেকেও বনতে না পারো তাহলে আর কোথায় গিয়ে বনবে?

হযরতওয়ালা বান্ধাভী রহ. ছাত্রদেরকে সম্বোধন করে বলেন : তোমরা ঈমানদারীর সাথে বলো এত বছর যাবত তোমরা মাদরাসায় আছো, তোমাদের একটি আমলও কি এমন পাওয়া যায় যার মধ্যে দৃঢ়তা ও পাবন্দী পাওয়া যায়। কোন একটা আমলের কথা তোমরা বলো যেটাকে তোমরা পাবন্দীর সাথে করো। মাদরাসায় তোমাদের এতগুলো বছর কেটে গেল অথচ এখনো পর্যন্ত একটি আমলেও পাবন্দী আসেনি। তাকবীরে উলার গুরুত্ব এখনো তোমাদের মধ্যে আসেনি।

অন্য মানুষ তোমাদেরকে মুখের মাধ্যমে ভালো কথা বলতে পারে, উৎসাহ দিতে পারে এর থেকে বেশি আর কী করতে পারে? করতে তো হবে তোমাদেরকেই। অন্য কেউ করার দ্বারা কি তোমরা দ্বীনদার হয়ে যাবে? ডাক্তার ঔষধ দিতে পারে, বুঝাতে পারে। কিন্তু ঔষধ তো রোগীকেই খেতে হবে। মাদরাসা হল বনার স্থান। বনার স্থানে যদি তোমরা বনতে না পারো তাহলে আর কোথায় গিয়ে বনবে?

মণ্ডির দোকানে এবং কারখানায় পণ্য বিক্রি হয়। লোকেরা সেখান থেকে কিনে নিয়ে আসে, কারখানায় বিভিন্ন ধরনের জিনিস তৈরী হয়। প্রত্যেক ধরনের জিনিস তৈরি হয়। প্রত্যেক জিনিসের কারখানা ভিন্ন ভিন্ন। সর্বশেষে মানুষ বনারও তো কোন কারখানা হওয়া চাই। মানুষ বনার এবং তাদের সংশোধন ও দীক্ষার কারখানা এই দ্বীনী মাদরাসাগুলোই। এখানে এসেও যদি কেউ মানুষ হতে না পারে, তাহলে আর কোথায় বনবে?

আমাদের কাজ তো হল শুধু বলা ও বুঝানো। এর চেয়ে বেশি আমরা কিছুই করতে পারি না।

১৮. ছাত্রদেরকে সাবধান করা

হযরতওয়ালা বান্ধাভী রহ. বলেন : একজনের পেছনে অন্যজন কতক্ষণ পর্যন্ত পড়ে থাকবে? আর কতক্ষণ পর্যন্ত কঠোরতা করবে? শুধুমাত্র কঠোরতাই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়।

পিতা সন্তানকে এ জন্য প্রহার করে যাতে আগামীতে এমন কাজ না করে এবং করণীয় কাজগুলো যেন গুরুত্বের সাথে করে। তার মাথায় জুতা এজন্য লাগানো হয় যে, এখন তো মার খেয়ে কাজ করবে। পরবর্তীতে এটাই তার অভ্যাসে পরিণত হবে। তখন নিজে নিজেই ঐ কাজটি করবে। কঠোরতার প্রয়োজন হবে না।

কিন্তু যে সাজায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে। জুতা খাওয়া যার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত জুতা খায় না অতক্ষণ পর্যন্ত কাজই করে না, তো এমন জুতা খাওয়া আর এমন কঠোরতায় কী লাভ?

জুতা লাগানো বা কঠোরতা কোনটাই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। কঠোরতার মূল উদ্দেশ্য ছিল যেন তার কাজের অভ্যাস গড়ে উঠে এবং আগামীতে কঠোরতা ছাড়াই কাজ করতে থাকে। কিন্তু তোমরা কঠোরতা আর জুতা লাগানোটাকেই আসল মনে করলে?

আরে কেউ তোমাদের সাথে কঠোরতা করুক বা না করুক। তোমাদেরকে কেউ দেখুক বা না দেখুক তোমরা নিজেরাই নিজেদের নেগরানী করো।

চিন্তা করো তোমরা মাদরাসায় থেকে কী অর্জন করছো? তোমরা নিজেদের পিতা-মাতাকে ছেড়ে এখানে এসেছো। তাহলে কি জন্য এখানে পড়ে আছো? এখানে থেকে তোমরা কী হাসিল করছো? তোমরা কী করছো? নিজেরাই দেখে নাও। তোমাদের তো প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহর জন্য হতে হবে। কেউ দেখুক আর না দেখুক আল্লাহ তো তোমাদেরকে দেখছেন। প্রতিটি কাজ আরম্ভ করার পূর্বে চিন্তা কর যে, এ কাজে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট নাকি অসন্তুষ্ট। তোমার এই কাজে আল্লাহ তাআলা খুশী হবেন না নাখোশ।

কত আফসোসের কথা যে, এখন পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে এই স্পৃহা ও মনোভাব সৃষ্টি হয়নি যে, আল্লাহ পাক আমাকে দেখছেন।

১৯. গুনাহ বর্জনের ব্যবস্থাপত্র

হযরতওয়ালা বান্ধাভী রহ. ইশার নামাযের পর ছাত্রদেরকে উপদেশ প্রদান করে বলেন : যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মধ্যে কোন জিনিসের তলব পয়দা না হয়, অতক্ষণ পর্যন্ত সে ঐ জিনিসকে হাসিল করতে পারে না। কোন

জিনিসের তলবের অর্থ হল ঐ জিনিস অর্জনের আসবাব অবলম্বন করবে। যদি সেটার আসবাব অবলম্বন না করে, তাহলে বুঝবে যে, এর মধ্যে তলব নেই। কারো যদি খানার তলব থাকে, তাহলে সে এর আসবাব বা উপকরণ অবলম্বন করে। নতুবা বুঝতে হবে যে, তার খানার তলব নেই।

অসুস্থ ব্যক্তি যদি সুস্থতা কামনা করে, তাহলে সে এর আসবাব অবলম্বন করে ডাক্তারের নিকট যায়। ঔষধ আনায়। ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী আমল করে। ডাক্তার সাহেব যে সব জিনিস পরিহার করতে বলেছেন সেগুলো পরিহার করে চলে। পক্ষান্তরে যদি সে এ সব আসবাব অবলম্বন না করে তাহলে এর অর্থ হল ঐ ব্যক্তি সুস্থতাপ্রত্যাশী নয়।

মানুষের ইসলাহ বা সংশোধনের ব্যাপারটিও অনুরূপ। যদি কেউ নিজের সংশোধন করাতে চায় তাহলে তার জন্য এর আসবাব অবলম্বন করা জরুরী। সংশোধনের জন্য গুনাহ বর্জন জরুরী। যদি কেউ গুনাহ বর্জন না করে তাহলে বুঝতে হবে যে, সে নিজেই নিজের সংশোধন কামনা করে না।

যেমনিভাবে শারীরিক ব্যাধি হয় যদ্দরুন শরীরের ক্ষতি হয়। অনুরূপভাবে রূহানী বা আত্মিক ব্যাধিও হয় যা মানুষের ভেতর সৃষ্টি হয় এবং তার ঈমানকে ধ্বংস করে ফেলে।

এর চিকিৎসা পদ্ধতি এটাই যে, সমস্ত গুনাহ ছেড়ে দিবে। অন্তরে মহান আল্লাহর ভয় থাকবে। গুনাহের ক্ষতি মনের মধ্যে থাকবে। সাথে সাথে এটাও ধ্যান করবে যে, আল্লাহ তাআলা আমার প্রতিটি গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছেন। একদিন মরতে হবে। আল্লাহর কাছে যেতে হবে। তাঁকে মুখ দেখাতে হবে। এটা মনের মধ্যে থাকলে একজন মানুষ কীভাবে গুনাহ করতে পারে?

যদি মাদরাসা ও খানকায় থেকে, ভালো মানুষদের সঙ্গে থেকে, ভালো পরিবেশে থেকেও গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি না হয় তাহলে আর কোথায় গিয়ে গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে?

মাদরাসায় যাঁরা থাকেন তাঁদের প্রত্যেকের নিজ ইসলাহের ফিকির থাকা জরুরী। মাদরাসাগুলো তো এজন্যই বানানো হয়েছে যেন মাদরাসায় থেকে আল্লাহ পাকের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত হয়। আত্মিক ব্যাধিগুলোর চিকিৎসা হয়। হাসপাতালে কি কেউ প্রমোদ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যায়? যদি কেউ প্রমোদ ভ্রমণের উদ্দেশ্যেই যায়, তাহলে এ ব্যক্তির কখনো ইসলাহ নসীব হবে না।

কেউ গুনাহ থেকে বাঁচতে চাইলে এর হাজারো পথ ও পন্থা আছে। আর কিছু না হোক অন্ততপক্ষে এটা মনের মধ্যে উপস্থিত রাখবে যে, "আমার আল্লাহ আমাকে দেখছেন" এই মুরাকাবার দ্বারা ইনশাআল্লাহ গুনাহ ছুটে যাবে।

২০. মাদরাসার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ নসীহতসমূহ

হযরতওয়ালা বান্ধাভী রহ. বলেন : কিছু কাজ থাকে করণীয় যেগুলো করতে হয়। আর কিছু কাজ থাকে বর্জনীয় যেগুলো পরিহার করতে হয়। করণীয় কাজ যদি কেউ না করে। আর বর্জনীয় কাজ যদি পরিহার না করে তাহলে তারই ক্ষতি।

ইরশাদ হচ্ছে :

فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি সঠিক পথে আসবে, বস্তুত সে নিজের জন্যই পথে আসবে। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট থাকবে, তার পথভ্রষ্টতা তার উপরই বর্তাবে"।

(সূরা ইউনুস, আয়াত ১০৮)

এ জন্য যে কোন কাজ করার পূর্বে প্রথমে ভাব যে, এ কাজ করলে আমার লাভ না ক্ষতি? উদাহরণস্বরূপ : নামায পড়তে মন চাচ্ছে না। অলসতা লাগছে, তখন এটা চিন্তা কর যে এ কাজটি করলে আমার লাভ না ক্ষতি? মানুষ যে জিনিসের মধ্যে নিজের উপকার মনে করে সেটা করে। চাই মনে চাক বা না চাক। খানা খাওয়ার ক্ষেত্রে মানুষ অবহেলা করে না। কেননা এর মধ্যে সে উপকারিতা বুঝে। আর যতগুলো উপকারী কাজ আছে প্রত্যেকটা কাজ সময় মত করে। আর যে সব কাজে সময় নির্ধারিত নেই, সেগুলোরও একটা সময় থাকে। উদাহরণস্বরূপ : খানার সময় থাকে। পায়খানার সময় থাকে, ব্যস যখনই তাকাযা হয় তখনই সেটার সময়। আর এ সব কাজ সময় মত করা হয়। এর মধ্যে নেগরানীর প্রয়োজন হয় না। এমনটি হয় না যে কেউ এক মাসে এক সাথে মাত্র ৩বার খানা খেয়ে নিল অতঃপর ছুটি। বরং সময় মত খানা খায়। এমনিভাবে নামায পড়া, সবকের পাবন্দী করা এগুলোও আমার কাজ। এগুলোও সময় মত গুরুত্ব সহকারে করতে হবে। না করলে নিজেরই ক্ষতি।

আমার বুঝেই আসে না মাদরাসায় হাজিরা ডাকার প্রয়োজন কেন দেখা দেয়? নিজের লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে নিজেরই চিন্তা ভাবনা করা উচিত। বর্তমানে মাদরাসাগুলোতেও ফিকিরের অভাব। তোমরাই বলো যদি কেউ করণীয় কাজ না করে আর বর্জনীয় কাজ করে তাহলে এর মধ্যে তার ক্ষতি আছে কি নেই? খানা না খেলে পানি পান না করলে তার ক্ষতি হবে কি হবে না? এভাবে প্রত্যেকটি কাজের ব্যাপারে চিন্তা কর। হিম্মত কর এবং কাজে লাগ।

২১. মেহনত ও চেষ্টা ব্যতীত ইলম হাসিল হয় না

হযরতওয়ালা বান্ধাভী রহ. বলেন : যে কোন কাজে চেষ্টা চালানোর উদ্দেশ্য হল কাংখিত বস্তু অর্জিত হওয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত কাংখিত বস্তু অর্জিত না হবে, অতক্ষণ পর্যন্ত পরিশ্রম অব্যাহত রাখতে হবে। পরিশ্রমের কোন সীমা পরিসীমা নেই। এর সীমা ব্যস এটাই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কাংখিত বস্তু অর্জিত না হবে মেহনতে লেগে থাকবে। উদাহরণস্বরূপ : যতক্ষণ পর্যন্ত সবক বুঝে না আসবে মেহনতে লেগে থাকবে। একজনের থেকে না বুঝলে দ্বিতীয়জন থেকে, দ্বিতীয়জন থেকে না বুঝলে তৃতীয়জন থেকে বুঝবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সবক বুঝে না আসবে লাগাতার মেহনতে লেগে থাকবে। কিন্তু লোকেরা মনে করে যে, কোন জিনিসের জন্য একবার দু'বার চেষ্টা করলে কিছুই অর্জিত হয় না।

সম্পদ উপার্জনের জন্য মানুষ চেষ্টা করে। অনেক চেষ্টার পর সে কয়েকটা পয়সা পায়। তাহলে মেহনত ও চেষ্টা ব্যতিরেকে ইলম কীভাবে হাসিল হবে? ছাত্ররা তো মেহনত ছাড়াই সনদ হাসিল করে নেয়। আর এটাকেই যথেষ্ট মনে করে। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত ইলমের দাস না হবে অতক্ষণ পর্যন্ত ইলম হাসিল হবে না। অনেক খোশামোদের পর কিছু ইলম পাওয়া যায়। তাহলে ইলম না এসে পারবে না। আসল কথা হল বর্তমানে ইলমের প্রতি ঝোঁক নেই। নতুবা যোগ্যতা অর্জন করতে চাইলে পথ এখনো উন্মুক্ত। কিন্তু মেহনতই করে না। আর বিনা মেহনতে তো কিছুই হাসিল হয় না।

২২. ছাত্রদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

ছাত্রদেরকে উদ্দেশ্য করে হযরতওয়ালা বান্ধাভী রহ. বলেন : কখনো অহংকার করবে না। অহংকার মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। নিজের সাথী বা সহপাঠীদের সাথে অহংকার করা অনুচিত।

উদাহরণস্বরূপ : কোনা সাথী কিছুই পারে না। ইবারত পড়তে পারে না। তরজমা করতে পারে না। কিন্তু তুমি পার। তো এ কারণে তোমার অহংকার করা অনুচিত। কেননা তোমার যাবতীয় কৃতিত্ব হল মহান আল্লাহর দান। তিনি চাইলেই ছিনিয়ে নিতে পারেন। কেউ কিছু করতে পারবে কি? মাত্র এক মিনিটে কত কিছু হয়ে যেতে পারে। যে খোদা আমাকে সৃষ্টি করেছেন ঐ খোদাই তাকেও সৃষ্টি করেছেন। এরপর আবার কিসের অহংকার? আল্লাহ পাক তো আমাকেও তার মতো সৃষ্টি করতে পারতেন। আমার মেধা তাকে ও তার মেধা আমাকে দিতে পারতেন। এটা তো মহান আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহ। এর উপর শোকর বা কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিত। এবং ভয় করতে থাকা

উচিত। আল্লাহ তাআলা যাকে কোন নেয়ামত দিয়েছেন তার জন্য অহংকার করা সমীচীন নয়। এটাকে আল্লাহর দান মনে করবে। আল্লাহ পাক যে নেয়ামত দিয়েছেন সেটার মাধ্যমে অন্যদের উপকার সাধন করবে। অন্যদেরকে শেখাবে, বলবে। যে সব সাথী বিশুদ্ধ ইবারত পড়তে পারে না অথবা মর্ম বুঝে না, তাদেরকে শিখিয়ে দিবে।

হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে,

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَّنْفَعُ النَّاسَ

"ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে মানুষের উপকার করে।" (জামউল জাওয়ামি)

তুমি অন্যের উপকার কর। স্বয়ং মহান আল্লাহ তোমার উপকার করবেন। তোমার উন্নতি হবে। উন্নতি এভাবেই হয়। দুচারজন ছেলে নিয়ে বসে যাও। যাদের কুরআনে কারীম সহীহ নেই তাদের কুরআন সহীহ কর।

এটা তো হল কুরআনে পাক সম্পর্কিত কথা। পক্ষান্তরে যে সব ছাত্র সঠিকভাবে ইবারত পড়তে পারে না তাদের দু-চারজনকে নিয়ে বসে যাও। বল, আসো আমি তোমাদের ইবারত শুদ্ধ করে দিব। সারফ-নাহু-সীগা ও তা'লীলের মশক করিয়ে দাও।

কয়েকটা তা'লীল আছে। ঘুরে ফিরে সেগুলোই আসে। এতটুকু করে দেখ উন্নতি হয় কি না হয়।

আমার যা কিছু অর্জন সব এ পদ্ধতির বরকত। আমার একজন সাথী ছিলেন। এখনো জীবিত আছেন। বর্তমানে শাইখুল হাদীস। তিনি হাদীসের মূলপাঠ বিশুদ্ধই পড়তেন। কিন্তু কারণ জিজ্ঞেস করলে বলতে পারতেন না যে, এই এরাব কেন পড়েছেন? আমাকে বললেন : আমি শরহে মিআতে আমেল কিতাবটি ভালোভাবে মেহনত করে পড়িনি : আমি বললাম এতে সমস্যা কী? আমি আপনাকে তাকরার করিয়ে দিব। হেদায়ার বছর আমি তাকে শরহে মিআতে আমেল তাকরার করিয়েছি। এখন তিনি শাইখুল হাদীস। কয়েকবার বলেছি আমার এখানে তাশরীফ আনার জন্য। আসেন না। কখনো আসলে বলব ও দেখাব যে, তিনি কেমন সহজ সরল ও ভদ্র বুযুর্গ।

২৩. কিছু করতে হলে বা বনতে হলে নিজেকে মিটিয়ে দাও

হযরতওয়ালা বান্ধাভী রহ. বলেন : হযরত মাওলানা মুযাফফার ছাহেব রহ. নিজেকে খুব লুকিয়েছেন। নিজেকে একেবারেই মিটিয়ে দিয়েছিলেন।

এরফলেই আল্লাহ তাআলা তাঁকে এমন মাকবূলিয়্যাত ও মাহবূবিয়্যাত দান করেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজেকে মিটিয়ে না দেয় অতক্ষণ পর্যন্ত

তার মধ্যে গুণ পয়দা হয় না। সবুজ শ্যামল ক্ষেত কখন আন্দোলিত হয়? যখন বীজ মাটিতে গিয়ে মিশে। চামেলী ও গোলাপের সুঘ্রাণ কখন ছড়িয়ে পড়ে? যখন সে নিজের হাকীকতকে মিটিয়ে দেয়। মাটিতে মিশিয়ে দেয়।

বর্তমানে এই জিনিসটারই অভাব। কীভাবে গুণ সৃষ্টি হবে? প্রত্যেকের স্বীয় নাকের চিন্তা। সবাই চায় আমার নাকটা উঁচু থাকুক। আমার সম্মান সুনাম ও প্রসিদ্ধি বাড়ুক।

এটা নিয়েই ঝগড়া করে যে, আমাকে অমুক কিতাব পড়াতে দেয়া হল না। ঐ কিতাব আমার পাওয়া উচিত ছিল। বুখারী শরীফ পড়ানো তো আমার হক ছিল। অমুককে কেন দেওয়া হল? অমুক জুনিয়র অমুক সিনিয়র। এই সব তখনই হয় যখন নাক উঁচু করার ফিকির থাকে।

এজন্যই বর্তমানে আলেমদের থেকে ফয়েয পৌঁছুচ্ছে না। এবং তাঁদের থেকে যে নূর ও বারাকাত প্রকাশ হওয়ার কথা তা হচ্ছে না। এর আসল কারণ এটাই যে, বর্তমানে আলেমগণ নিজেকে মিটিয়ে দেন না। নিজ নফসের সংশোধন করান না। এমন মানুষ যেখানেই যাবে, যে মাদরাসাতেই যাবে, তার থেকে ফাসাদ আর ফাসাদই ছড়াবে। যদি কিছু কাজ করার ইচ্ছা থাকে। তাহলে নিজেকে মিটিয়ে দিন। কোন আল্লাহওয়ালার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করুন। তাঁর জুতা সোজা করুন। এটা ছাড়া সাফল্য অসম্ভব।

সত্যিকারের পড়ুয়া ছাত্ররা মেহনতী হয়। যোগ্যতাসম্পন্ন হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল তাদের নফসের ইসলাহের ফিকির নেই। এরা 'শাইখুল হাদীস', 'শাইখুল আদব' এবং 'মুফতী' পদবী দ্বারা প্রসিদ্ধ হওয়ার ফিকিরে থাকে। তাদের যোগ্যতাও আছে। পরিশ্রমও করে। কিন্তু নিজেকে মিটানোর চিন্তা নেই। নিজেকে ছোট মনে করে না। অহংকারে লিপ্ত থাকে, এ সব মানুষ দ্বারা ইসলাহ এর কাজ হয় না। আর যে ফয়েয তাদের দ্বারা পৌঁছার কথা ছিল তা পৌঁছে না। আর যারা মাদরাসায় শুধু নাম ডাকের জন্য আসে, কোন বোর্ডের স্কুলে পরীক্ষা দিয়ে ডিগ্রী অর্জন করে। এদের সম্পর্কে তো কিছু বলাই অর্থহীন। এদের ইখলাস কোথায়? এদের উদ্দেশ্য শুধু দুনিয়া উপার্জন করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে ইসলাহ নসীব করুন। আমীন।

২৪. দুই লোভী

হযরতওয়ালা বান্ধাভী রহ. বলেন : হাদীসে পাকের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

مَنْهُوْمَانِ لَا يَشْبَعَانِ مَنْهُوْمٌ فِيْ الْعِلْمِ وَ مَنْهُوْمٌ فِي الْمَالِ

অর্থাৎ দুই লোভী কখনো পরিতৃপ্ত হয় না। এক হল ইলমের লোভী আর এক হল সম্পদের লোভী। (বাইহাকী : শুআবুল ঈমান)

সম্পদের লোভী সব সময় চেষ্টা করে দোকান একটি থাকলে দুটি করার জন্য। দুটি থাকলে তিনটি করার জন্য। প্রথমে দোকান এরপর কারখানা দেওয়ার চিন্তা করে। এদিক সেদিক হাত মারে। এটা তো অভিজ্ঞতার কথা। সবাই এটা দেখে থাকেন।

ইলমের লোভীরও একই অবস্থা। কিন্তু বর্তমানে সম্পদের লোভী অনেক দেখা গেলেও ইলমের লোভী বেশি একটা দেখা যায় না।

২৫. লোভের লক্ষণ

হযরতওয়ালা বান্ধাভী রহ. বলেন : সম্পদের লোভী তো কখনো ক্লান্ত হয় না। সে সব সময় সম্পদ অর্জনের ধান্ধায় থাকে। সম্পদের লোভে সে সব কিছু ভুলে যায়। পানাহার ভুলে যায়। কিন্তু ইলমের লোভী সব কিছু মনে রাখে। শুধুমাত্র ইলমকেই মনে রাখে না।

কিন্তু যে যুগে ইলমের সত্যিকার লোভীগণ ছিলেন। তাঁদের অবস্থাও এমন ছিল যে, ক্লান্তি কাকে বলে তা তাঁরা আদৌ জানতেন না। এ জন্য সমস্ত মুসীবত সহ্য করা তাঁদের জন্য সহজ ছিল। ব্যস তাঁদের একটাই ফিকির ছিল যেন ইলম এসে যায়। দেশের থেকে আসলে বহু বছর পর দেশে ফিরে যেতেন। জঙ্গলের পাতা খেয়ে খেয়ে, রুটির শুকনো টুকরো পানিতে ভিজিয়ে, মুলার পাতা খেয়ে তাঁরা জীবন যাপন করতেন। এবং ইলমে দ্বীন অর্জন করতেন। এমনও হয়েছে যে, কিছুই নেই ফলে বাবুর্চীর কাছে গিয়ে স্রেফ রুটির সুঘ্রাণ শুঁকে আসতেন। এ জাতীয় শত সহস্র ঘটনা আছে। না আছে থাকার ঠিকানা। না আছে খাওয়ার ব্যবস্থাপনা। যেখানেই স্থান পেয়েছেন সেখানেই অবস্থান করেছেন। এভাবে কষ্ট করে ইলম হাসিল করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁদের মাধ্যমে কত উপকার পৌঁছিয়েছেন!! কোন কোন কিতাব আশি খণ্ড পর্যন্ত লিখেছেন। যেগুলো পাঠ করাও কঠিন। অথচ বর্তমানে ইলম অর্জনকারী ছাত্রদের জন্য কত আসানী করা হয়েছে। যা ইতোপূর্বে ছিল না। আরাম ও শান্তির সমস্ত উপকরণ প্রস্তুত। বরং দিন দিন শান্তির উপকরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু ইলমের উন্নতির পরিবর্তে অবনতি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

২৬. ছাত্রদের দায়িত্ব

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : হে স্নেহাস্পদ ছাত্রগণ! আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এখানে প্রেরণ করেছেন। তিনি তোমাদের এখানে থাকা ঠিক করেছেন। তোমাদের আব্বা-আম্মা তোমাদেরকে এখানে পাঠিয়েছেন। আর তোমরা নিজেরাও কিছুটা চিন্তা ভাবনা করেই এখানে এসেছ। এমন নয় যে বন্যার পানি তোমাদেরকে এখানে ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে। অথবা কেউ তোমাদেরকে এখানে নিক্ষেপ করেছে। বরং কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করে স্বেচ্ছায় তোমরা এখানে এসেছ। আর আল্লাহ তোমাদেরকে এ মাদরাসায় পাঠিয়ে দিয়েছেন।

মাদরাসার উদাহরণ হল হাসপাতাল এর ন্যায়। রোগী যখন হাসপাতালে ভর্তি হয়, তখন কিছু দায়িত্ব থাকে রোগীর। কিছু যিম্মাদারী থাকে কর্মচারীদের। যদি রোগী হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর ডাক্তার সাহেব নির্দেশিত ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী না চলে বরং নিজ মর্জি ও ইচ্ছা মত আমল করে, তাহলে এই রোগী কখনো সুস্থ হতে পারবে না। উদাহরণস্বরূপ : ডাক্তার যে ঔষধ ঠিক করেছেন ঐ ঔষধই ব্যবহার করতে হবে। পানি পান করতে বললে পানি পান করতে হবে। মোটকথা ডাক্তারের প্রতিটি নির্দেশনা অনুযায়ী চলতে হবে। তবেই উপকার হবে অন্যথায় নয়। আর ডাক্তার সাহেবও যে ব্যবস্থাপত্র দেন সেটা নিজের উপকারের জন্য দেননা বরং এতে সরাসরি রোগীরই উপকার। রোগীরই হিত কামনা। আর হিতকামনার দাবী হল, রোগীর অবস্থা অনুযায়ী যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন সে ব্যবস্থাই গ্রহণ করা।

এখন যদি রোগী মনে করে যে, আমার সাথে যুলুমের আচরণ করা হচ্ছে। ডাক্তার আমার কল্যাণকামী নয়। সকাল-সন্ধ্যা আমাকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হচ্ছে। আমার কোন ইচ্ছা পূর্ণ হচ্ছে না! ডাক্তার আমার সাথে ভালো ব্যবহার করে না! অযথাই ডাক্তারের প্রতি কু ধারণা পোষণ করে। এমন রোগীর ঐ ডাক্তারের দ্বারা কখনো উপকার লাভ হবে না।

২৭. মাদরাসার উদাহরণ এবং ছাত্র ও মাদরাসা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : অবস্থার প্রেক্ষিতে ছাত্রদের জন্য কিছু উসূল ও মূলনীতি নির্ধারণ করা হয়। এগুলো ছাত্রদের ফায়েদার জন্যই করা হয়। এখন ছাত্ররা যদি মনে করে যে, আমাদের উপর যুলুম করা হচ্ছে। শিক্ষকগণ আমাদের কল্যাণকামী নন। তাহলে এমন ছাত্রের কখনো ফায়েদা লাভ হবে না। ফায়েদা তো শ্রেফ ঐ ছাত্রদেরই হবে যারা সব ধরনের

কঠোরতা সহ্য করতে এবং তিক্ত ঔষধ পানের জন্য প্রস্তুত। ডাক্তারের কঠোরতা এবং তিক্ত ঔষধকে কল্যাণকামনা মনে করা উচিত। এমনিভাবে হাসপাতালের কর্মচারীদের বিভিন্ন দায়িত্ব থাকে। যেমন সময় মত ঔষধ পান করানো। ইঞ্জেকশন দেয়া। ডাক্তার যে ঔষধ যতবার পান করাতে বলেন এবং যে ইঞ্জেকশন যত বার সাব্যস্ত করেন কর্মচারীদের দায়িত্ব হল নিজ দায়িত্বের অনুভূতি মাথায় রেখে ঐ ঔষধ পান করানো। তাহলেই রোগীর উপকার হবে নতুবা নয়।

যদি কর্মচারীবৃন্দ নিজ কাজে কর্মে অলসতা করে। উদাহরণস্বরূপ : রাত্রের ঔষধ দিনে বা দিনের ঔষধ রাতে পান করায় অথবা দিনে তিন বার ইঞ্জেকশন লাগানোর ক্ষেত্রে ত্রুটি করে, তাহলে সে ক্ষেত্রেও রোগীর কখনোই ফায়েদা হবে না।

এটা আল্লাহ তাআলার তাকদীরের ফয়সালা যে, তিনি তোমাদেরকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখন তোমাদের উচিত এ ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা। আর যখন আল্লাহ তাআলা পাঠিয়েই দিয়েছেন, তখন পূর্ণ বছরের জন্য সিদ্ধান্ত হয়ে গেল যে, এখান থেকে যাওয়া যাবে না। এখন নিজেকে মাদরাসা কর্তৃপক্ষের নিকট সোপর্দ করে দাও। যে সব কানূন এবং নীতিমালা মাদরাসা কর্তৃপক্ষ প্রণয়ন করেছেন সে অনুসারে আমল করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেল।

২৮. নামায এবং সবকে উপস্থিতি

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : ঐ সমস্ত মূলনীতিসমূহের মধ্যে একটি হল নিয়মিত উপস্থিতি। আমাদের এখানে নিয়ম হল শ্রেণীকক্ষে সবকের জন্য এবং মসজিদে নামাযের জন্য হাযিরা ডাকা হয়। হওয়া তো উচিত ছিল এমন যে, হাজিরা হোক বা না হোক নামাযের ক্ষেত্রে যেন কোন অবহেলা না হয়। ঘুমানোর সময়, খানা খাওয়ার সময় হাজিরা ডাকার এবং নেগরানীর প্রয়োজন হয় না। কেননা এগুলো প্রকৃতিগত বিষয়। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ঘুমায় ও খাওয়া-দাওয়া করে এবং এর প্রয়োজন অনুভব করে। কত বড় আফসোসের কথা যে, তালিবে ইলমদের নামাযের জন্য হাজিরা ডাকতে হয়। সবকের জন্য হাজিরা ডাকতে হয়।

মাদরাসায় আসার যেটা আসল উদ্দেশ্য তথা পড়ালেখা। এর জন্য আবার হাজিরা ডাকতে হবে কেন?

পূর্বের যুগে এর কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না যে, শ্রেণীকক্ষে এভাবে হাজিরা ডাকা হয়েছে।

২৯. ক্বারী আব্দুর রহমান ছাহেব পানিপথী রহ. এর ঘটনা

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : হযরত ক্বারী আব্দুর রহমান ছাহেব রহ. এর কখনো সবক ছুটেনি। এক মাইল পদব্রজে যাতায়াত করা সহজ কাজ ছিল না। বিশেষত ঐ যুগে তো খুবই মুশকিল ছিল। রাতে সফর করতে হত। কিন্তু কখনো সবক বাদ যায়নি। নিজের কাছে চেরাগের পয়সাও ছিল না। ছাত্ররা রাত্রে টহল দিত। যেখানে আলো পেতেন সেখানে গিয়ে কিতাব দেখতেন। কোন কোন ছাত্র এমনটি করতেন যে, কোন দোকানদারকে গিয়ে বলতেন যে, আমি সারা রাত আপনার দোকান পাহারা দিব। আমার জন্য চেরাগের তেলের ব্যবস্থা করে দিন। এরপর রাত জেগে কিতাব দেখতেন। আটার দলা দিয়ে চেরাগ জ্বালাতেন আর সকালে ঐ আটাই খেয়ে নিতেন। এভাবে তাঁরা ইলম হাসিল করেছেন।

৩০. ইমাম শাফেয়ী রহ. এর ঘটনা

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : একদিন ইমাম শাফেয়ী রহ. সবকে অনুপস্থিত ছিলেন। উস্তাদজী খুব হতবাক হলেন। খোঁজ খবর নেওয়ার পর জানতে পারলেন যে, তাঁর কাছে পরিধানের কাপড় নেই। আর টাকা পয়সা যা ছিল সেটা ঋণ পরিশোধে ব্যয় হয়ে গেছে।

বর্তমান যুগের ন্যায় পাকুড়া আর জিলাপীর নাস্তা করতে গিয়ে এই ঋণ হয়নি। বরং ইলমের প্রয়োজনীয় সামান যথা কাগজ কলম ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে গিয়ে ঋণ হয়ে গেছে। আর ঋণের ব্যাপারে হাদীস পাঠ করেছেন। তখন খেয়াল হয়েছে যে, যদি এই অবস্থায় আমার ইন্তিকাল হয়ে যায় তাহলে ঋণগ্রস্ত হয়ে মারা যাব। এ জন্য তাৎক্ষণিক যেভাবে পেরেছেন ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছেন। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর উস্তাদজী স্বীয় কাপড় পাঠিয়ে দিয়েছেন যে, এটা পরে নাও। কিন্তু আত্মমর্যাদা এটাকেও সহ্য করেনি। ফলশ্রুতিতে আরয করলেন যে এর পরিবর্তে আমার থেকে কাজ নিন। ফলে তিনি কিতাব লেখা ও সংশোধনের কাজ করে এ কাপড় কবূল করেন।

৩১. ছাত্রদের দূরবস্থা

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : কত বড় আফসোসের কথা। তোমাদের জন্য চেষ্টা করা হয়। এত কষ্ট করে চাঁদা করে পয়সা জমা করা হয়। তোমাদের জন্য সব ধরনের আরাম ও শান্তির উপকরণ প্রস্তুত রাখা হয়। কোন কিছু ছাড়াই বসে বসে আরামে খানা পাওয়া যায়। ঘরের মধ্যেও এত

আরামের সাথে খানা পাওয়া যায় না। বরং প্রথমে ঘরের কিছু কাজ করতে হয়। কৃষকের প্রথমে মহিষের ব্যবস্থা করতে হয়। এরপর খানা পাওয়া যায়। ঘরের আরো অনেক কাজ করতে হয়। এখানে তো কিছুই করতে হয় না। ব্যস পড়ে পড়ে খেতে থাকো। আরাম আর আরাম। কিন্তু তারপরও ছাত্ররা আরো আরাম চায়। ঐ সব মাদরাসাতে বেশি যায়, যেখানে আরামের উপকরণ বেশি এবং সব ধরনের স্বাধীনতা বিদ্যমান। আজ এই মাদরাসায় তো কাল ঐ মাদরাসায়। সারা বছর সে শুধু মাদরাসাই বদলাতে থাকে। আর মাদরাসা কর্তৃপক্ষও মাদরাসাকে দোকান বানিয়ে রেখেছে যে, আমাদের এখানে গ্রাহক বেশি আসবে। আমাদের এখানে ছাত্রদের আধিক্য হবে। আর বেশি থেকে বেশি আরাম পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয় যাতে ছাত্র বেশি আসে।

কিন্তু এই সব সুবিধা ও আরামের উপকরণ থাকা সত্ত্বেও ছাত্রদের যেভাবে মেহনতের সাথে ইলমে দ্বীন হাসিল করা উচিত এবং তাদের মধ্যে যা যা থাকা দরকার সেগুলো নেই।

কত বড় অনুশোচনার ব্যাপার। বর্তমানে দ্বীনী মাদরাসাগুলোতে ফজরের পূর্বে এমন মনে হয় যেমন কবরস্থানের সুনসান নীরবতা। না আছে কোন তিলাওয়াতকারী, না আছে কোন যিকিরকারী। রাত্রে বিলম্বে শয়ন করলেও কমপক্ষে ফজরের আযানের পরপরই উঠে যাওয়া উচিত। অথচ এটাও হয় না।

৩২. হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ.-এর ঘটনা

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : হযরতওয়ালা আব্দুল কদের রায়পুরী রহ. একটি মসজিদে থাকতেন। ঐ সময় তো দারুল ইকামাহ বা ছাত্রাবাসের ব্যবস্থাপনা ছিল না। আমাদের সময়েও দারুল ইকামাহ ছিল না। হযরত রায়পুরী রহ. ঐ মসজিদে চাটাই বিছিয়ে শুয়ে থাকতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদের মুতাওয়াল্লীর পক্ষ থেকে বাতি জ্বালানোর অনুমতি থাকত, অতক্ষণ পর্যন্ত বাতির আলোতে কিতাব দেখতেন। এরপর হাম্মামখানার আগুনের আলোতে কিতাব দেখতেন। শীতের রাতে গায়ে জড়াবার মত কিছুই ছিল না। মসজিদের চাটাইয়ে লেপ্টে যেতেন।

এভাবে ইলমে দ্বীন অর্জন করেছেন। এরপর দেখো আল্লাহ তাআলা তাঁর মাধ্যমে কেমন কাজ নিয়েছেন।

যদি কোন তালিবে ইলম সত্যিকার তালিবে ইলমের মত জীবন যাপন করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাঁর মাধ্যমে কাজ নেন। বর্তমান যুগেও দরওয়াযা উন্মুক্তই আছে। কিন্তু আমরা নিজেরাই দরওয়াযা বন্ধ করে রেখেছি।

৩৩. তালিবে ইলমের গুণাবলী

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : তালিবানে ইলমের পেট ভরা পরিমাপ দুটি রুটির উপর তুষ্ট থাকা উচিত। যার দ্বারা তাঁদের কোমর সোজা থাকবে। সামান রাখার স্থান যদি পাওয়া যায় আর পড়ালেখার জন্য যদি আলোর ব্যবস্থা হয়ে যায়, এটাই যথেষ্ট। এখানে মাদরাসার পক্ষ থেকে আলোর ব্যবস্থা করা হয়। জেনারেটর চলে। কিন্তু যদি ব্যবস্থা না থাকে, অথবা কিছুটা বিলম্ব হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে তালিবে ইলমের উচিত নিজের পক্ষ থেকে এর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা। প্রতিটি কক্ষে একটি লণ্ঠন থাকা উচিত। জেনারেটর চালাতে বিলম্ব হলে লণ্ঠন জ্বালিয়ে কিতাব দেখা আরম্ভ করে দিবে।

দুটি ব্যাপারে খুব যত্নবান থাকার চেষ্টা করবে। একটি হল নামাযের গুরুত্ব। আরেকটি হল ক্লাসের পাবন্দী। এতে অনুপস্থিত থাকা অনুচিত। হাযিরা ডাকা হোক বা না হোক। কোন নেগরান থাকুক বা না থাকুক আমাদের কাজ আমাদেরকেই করতে হবে।

৩৪. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ইহতিমাম

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : এ সব কিছুর সাথে সাথে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার খুব বেশি ইহতিমাম করবে। কামরার সামনের বারান্দা খুব পরিষ্কার থাকা উচিত।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

نَظِّفُوْا أَفْنِيَةَ بُيُوْتِكُمْ

"তোমরা নিজেদের ঘরের আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখো।" (তিরমিযী শরীফ)

যখন আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখারই নির্দেশ দেওয়া আছে, তাহলে ঘর পরিষ্কার রাখার নির্দেশ কোন্ পর্যায়ের হবে তা তো বলাই বাহুল্য।

মাদরাসার মধ্যে যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ইহতিমাম না করা হয় তাহলে আর কোথায় হবে?

এমন যেন না হয় যে, প্রত্যেক কামরার সামনে ময়লা আবর্জনার স্তূপ লেগে থাকল। যারা কামরায় অবস্থান করে তারাই পালাক্রমে সাফাঈ এর ইহতিমাম করবে।

৩৫. মাদরাসার দায়িত্বশীল ও মুদাররিসদের যিম্মাদারী

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : মুদাররিস বা শিক্ষকদের উচিত নিজেদের যিম্মাদারী বা দায়িত্ব বুঝে নেয়া। ছাত্রদের নেগরানী করা। খুব বেশি

নয়। মাত্র চারটি বা পাঁচটি কক্ষ প্রত্যেক মুদাররিসের দায়িত্বে আসবে। এ সব কক্ষের নেগরানী করলে ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। আমাদের এটা চিন্তা করা উচিত যেন আমাদের দ্বারা ছাত্ররা বেশি থেকে বেশি উপকৃত হতে পারে।

একজন তালিবে ইলম মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার পর তাঁর তালীম-তারবিয়ত তথা শিক্ষা-দীক্ষার যিম্মাদারী আমাদের উপরই এসে পড়ে। শিক্ষকবৃন্দ হলেন স্নেহশীল পিতার ন্যায়। ছাত্রগণ নিজেকে সন্তান মনে করবে আর শিক্ষকগণ নিজেকে পিতা মনে করবেন এবং নিজের ছেলেদের মত আচরণ করবেন।

বাচ্চাকে কখনো কখনো কোলে নিতে হয় আবার কখনো পায়খানাও পরিষ্কার করতে হয়। প্রয়োজন হলে থাপ্পরও মারতে হয়। কিন্তু নফসের জন্য নয় বরং সংশোধনের জন্য। আর এটা তো আল্লাহ পাক ভালোভাবেই জানেন ও দেখেন আমরা কার সাথে কেমন আচরণ করছি? অন্য মানুষ আর কী জানে?

মোটকথা শিক্ষকবৃন্দের দায়িত্ব হল ছাত্রদের সাথে নিজের সন্তানের ন্যায় আচরণ করা।

৩৬. সময়ের মূল্য, যবানের হেফাযত, নফসের নেগরানী

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : সময়ের খুব মূল্যায়ন করা উচিত। আমাদের প্রতিটি নতুন দিন গত দিনের তুলনায় ভালো হওয়া উচিত। যদি কারো গতকাল আর আজকের দিন সমানই থাকে। আর একদিনে সে উন্নতি করতে না পারে তাহলে এটা তার জন্য অনেক বড় ব্যর্থতা। একজন মানুষ ২৪ ঘণ্টা সময় পেল অথচ এর মধ্যে সে কিছুই উপার্জন করতে পারল না। এটা কত বড় আফসোস এর কথা।

এজন্যই বুযুর্গানে দ্বীন এক এক মিনিটের মূল্যায়ন করেছেন। সামান্য একটা অনর্থক কথা মুখ দিয়ে বের হওয়াকেও তারা পসন্দ করতেন না। যিন্দেগী তো দেওয়াই হয়েছে এজন্য যে এর কদর করা হবে। কদর করলেই উন্নতি হয়।

হাদীসে পাকে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। জনৈক সাহাবী শহীদ হয়ে গেলেন। তাঁর এক সপ্তাহ পর অন্য একজন সাহাবীর ইনতিকাল হল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাযি.কে জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা তোমাদের এই মরহুম ভাইয়ের জন্য কী দুআ করেছো? তাঁরা আরয করলেন : আমরা এই দু'আ করেছি "হে আল্লাহ! আমাদের এই ভাইকে শহীদ ভাইয়ের সাথে মিলিয়ে দিন। এবং তাঁকেও ঐ মর্তবা দান করুন।"

তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যদি তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য এই দু'আ করে থাকো, তাহলে বড় ক্ষতিকর দু'আ

করেছো। তাঁর এক সপ্তাহের আমল কোথায় যাবে? ঐ সাহাবী শহীদ হয়েছেন। ঠিক আছে। শাহাদাতের মর্যাদা অনেক। কিন্তু এই এক সপ্তাহ সে যে নেক আমল করেছে। এর বদৌলতে সে কোথায় পৌঁছে গেছে।

তাহলে দেখুন এক সপ্তাহে শহীদের চেয়ে আগে বাড়তে পারে। তাহলে ষাট সত্তর বছরে আগে বাড়তে পারবে না?

এটাই জীবন। এর মূল্যায়ন করুন। আর এমনভাবে এটাকে খরচ করুন যেন এক মিনিট সময়ও নষ্ট না হয়। তাহলে মানুষ অনেক উপরে উঠতে পারবে।

আমাদের তো অনর্থক কথাই শেষ হয় না। জানি না মানুষের মনে কেমন লাগে এদিক সেদিকের অনর্থক গল্প গুজবে?

প্রত্যেকের উচিত প্রতিটি মুহূর্তে নিজের ব্যাপারে হিসাব কিতাব নেওয়া যে, কোন সময় নষ্ট হচ্ছে না তো? কোন কাজ আল্লাহ পাকের মর্জির বিপরীত হচ্ছে না তো? মুখ দিয়ে কথা বলার পূর্বে চিন্তা ভাবনা করে বলা উচিত যে এর পরিণাম কী হবে?

অবাধ্যতার দরুন অধঃপতন হয়। আর আনুগত্যের দ্বারা মানুষ উন্নতি করে। আগে বাড়ে। আর যদি নফস বা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা না হয় ও তার উপর পাবন্দী আরোপ করা না হয়, তাহলে সে পুরোপুরি স্বাধীন হয়ে যাবে। ফলে মুখে যা আসে তা-ই বলবে। তার আকলের মধ্যে ত্রুটি দেখা দেয়। হাত পা হয়ে যায় অনুভূতিহীন। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ হয়ে যায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তার যা মনে চায় তাই করে। যেখানে মনে চায় সেখানে যায়। যা মুখে আসে তাই বলে। যা ভালো লাগে তাই খায়।

নফসকে সামান্য ছাড় দিলেই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বাধীন হয়ে যায়। এজন্য সবসময় নফস এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমীক্ষা নিতে থাকবে। তবেই উন্নতি হতে পারে। নতুবা উন্নতির পরিবর্তে শুধু হবে অবনতি আর অবনতি।

৩৭. ইলমের সাথে সামঞ্জস্য এবং ইলমী ঝোঁক ও আগ্রহের লক্ষণ

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : এত দীর্ঘ সময় মাদরাসায় থাকার পরও যদি ইলম এর সাথে মুনাসাবাত বা সামঞ্জস্য সৃষ্টি না হয়, আর আমাদের মধ্যে ইলমী যওক ও শওক পয়দা না হয় এবং আমাদের ইলমী মেযাজ বা মন-মানসিকতা তৈরি না হয়, ইলম ও কিতাবের সাথে ইশক তথা গভীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে না উঠে, তাহলে এটা হবে বড় আশ্চর্যজনক ব্যাপার।

আমাদের তো জীবন-মরণ, উঠা-বসা এই সব কিতাবই হওয়া উচিত। কিতাব ছাড়া আমাদের শান্তি পাওয়া উচিত নয়। ভীষণ আফসোসের ব্যাপার হবে যদি দশ বারো বছর মাদরাসায় সময় লাগানোর পরও আমাদের এই মানসিকতা গড়ে না উঠে।

আমাদের অবস্থা তো এমন হওয়া উচিত যে, মাদরাসার চারদেয়াল আর কিতাবের ছায়াতেই আমাদের প্রশান্তি লাভ হবে। কিতাব অধ্যয়নই হল আমাদের আনন্দ-ফূর্তি। এটাই হবে আমাদের বিনোদনের মাধ্যম। পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে আনন্দ-ভ্রমণে আমাদের আনন্দ লাগে না, মন বসে না। আমাদের আনন্দ ভ্রমণের কেন্দ্রভূমি হল এই সব কিতাব।

জনৈক কবি কত সুন্দর বলেছেন :

ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا + مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہو گا کفن اپنا

দুনিয়ার সাথে আমাদের কিসের সম্পর্ক? মাদরাসাই হল আমাদের ওয়াতন (ঠিকানা),

মরব আমরা কিতাবের উপরই কাগজ হবে আমাদের কাফন।

বাস্তবিকপক্ষে আমাদের অবস্থা এমন হওয়া উচিত।

যার যে জিনিসের সাথে সম্পর্ক হয় সে সেটাকে ভুলতে পারে না। দোকানদার দোকান বন্ধ করে না। অসুস্থ হয়ে পড়লেও দোকান খোলার চিন্তা করে। কারখানা বন্ধ হয় না। অথচ সামান্য অজুহাতে সবকে উপস্থিতি বাদ দিয়ে দেয়।

৩৮. সময়ের মূল্য

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. এর জনৈক স্নেহাস্পদ বিবাহের বরযাত্রায় হযরত রহ.কে সঙ্গী হওয়ার জন্য দরখাস্ত করার প্রেক্ষিতে হযরতওয়ালা রহ. বলেন : আমাকে বাধ্য করো না। আমি এক এক মিনিট সময় বাঁচিয়ে চলি। তোমাদেরকে তো আমি জানি যে, তোমরা এটাকে খারাপ মনে করবে না আগামীকাল অমুকের বিবাহ। (তিনিও হযরতের স্নেহাস্পদ) সে আজব ধরনের মানুষ। না গেলে নারায হয়ে যাবে। এ জন্য বাধ্য হয়ে যেতেই হবে।

সে তো পূর্ব থেকেই ডংকা পিটিয়ে দিয়েছে। আর লোকদেরকে বলাবলি করছে। "মাওলানা ছাহেব আমার বিবাহে কেন আসবেন তিনি তো বড়দের দাওয়াতে যান"। হযরত বলেন : এ জন্য আমাকে ঐ দাওয়াতে যেতেই হবে। কিন্তু তোমরা যেহেতু বুঝদার। আমি জানি তোমরা নারায হবে না। এ জন্য আমাকে ছেড়ে দাও। আমি কাজের চাপে পেশাব-পায়খানা আটকে বসে

থাকি। গত মাসে মাত্র ৩/৪ বার ৪/৫ মিনিটের জন্য বাসায় যেতে পেরেছি। শুধু এটাই চিন্তা করেছি যে, ইত্যবসরে কিছু কাজ করে নিব।

আমি অধম (সংকলক) আরয করলাম যে, আগামীকাল তো হযরতকে কানপুরেও যেতে হবে। হযরত বললেন : এখন আর যাব না। জানতে পেরেছি যে, বিবাহ অনুষ্ঠানে লোকজন নেচে নেচে চলাফেরা করে খানা খাবে। ফ্যাশন ও প্রথা অনুসারে বিবাহ-শাদী হচ্ছে। আমি জানতে পেরেছি। এ জন্য এখন আর সেখানে যাব না।

৩৯. মাদরাসায় থেকে আমানত ও দিয়ানত শিখ

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. অভ্যাস অনুযায়ী ফজর এর নামাযের পর সবক পড়ানো আরম্ভ করলেন। হযরতের অভ্যাস ছিল ফজরের পর আলোকিত হয়ে যাওয়ার কারণে বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে সমস্ত বাল্ব বন্ধ করিয়ে দিতেন। প্রয়োজন হলে শুধু একটি বাল্ব জ্বলত।

একদিন হযরত দেখলেন যে, বিনা প্রয়োজনে তীব্র আলোসম্পন্ন বাতি জ্বলছে অথচ সকালের আলো যথেষ্ট হয়েছিল। এই প্রেক্ষিতে হযরতওয়ালা রহ. বললেন : এটাকে বন্ধ করে দাও। এখন আর আলোর প্রয়োজন নেই। এটাও অপচয়। অপচয় বলা হয় : বিনা প্রয়োজনে খরচ করা অথবা প্রয়োজন থেকে বেশি খরচ করা। উদাহারণস্বরূপ : প্রয়োজন হল এক বাল্বের। কিন্তু জ্বালানো হচ্ছে দুটি বাল্ব। এটাও অপচয়। প্রয়োজন হাল্কা আলোর। কিন্তু জ্বালিয়ে রাখল তীব্র আলো। এটাও অপচয়।

এজন্যই আমি বলে থাকি : প্রত্যেক কামরায় দুটো বাল্ব থাকা দরকার। একটি হল পড়ার জন্য তীব্র আলো। মুতালাআ বা অধ্যয়নের সময় এটাকে জ্বালিয়ে নাও। আরেকটা বাল্ব হওয়া দরকার হাল্কা আলোর। জিরো পাওয়ারের। যদি কথাবার্তা বলার প্রয়োজন হয় অথবা অন্য কোন কাজ করতে হয় তখন সেটাকে জ্বালিয়ে নাও। কথা বলার সময় বেশি আলোর কী প্রয়োজন?

মাদরাসায় থেকে এসব জিনিসই শিখতে হয়। কিন্তু বর্তমানে মাদরাসা থেকে এসব জিনিস উঠে যাচ্ছে। এসব কাজ আমানত ও দিয়ানত (সততা) পরিপন্থী কাজ।

ব্যক্তিগত জিনিস হলেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার করা নিষেধ। নতুবা অপচয়ের গুনাহ হবে।

নিজস্ব জিনিসেরই যদি এই বিধান হয়, তাহলে মাদরাসার জিনিস যা হল আমানত তার মধ্যে আরো কত সতর্কতা প্রয়োজন?

বর্তমানে এ বিষয়গুলোতে অবহেলার কারণে মাদরাসাগুলো থেকে খাইর ও বরকত উঠে যাচ্ছে।

বড় বড় মানুষের মধ্যে আমানতদারী নেই। দিয়ানতদারী নেই। তাকওয়া নেই।

আল্লাহর বান্দাগণ! আমানত শিখুন। দিয়ানত শিখুন।

আফসোস! বর্তমানে এ সব কথা কেউ বলে না। কেউ ধরেও না।

আজকের রাতে আমি দেখলাম যে, ঘুমানোর সময় কোন কোন কামরায় খুব উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। ঐ সময় এর কী প্রয়োজন ছিল?

এজন্যই আমি বলি : আমানত ও দিয়ানত শিখুন। নতুবা মাদরাসায় থেকে কী লাভ?

৪০. দিয়ানত ও আমানত নেই তো কিছুই নেই

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে :

لَا دِيْنَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ

অর্থাৎ "যার মধ্যে আমানদতারী নেই তার মধ্যে দ্বীনদারীও নেই।"

(বাইহাকী, শুআবুল ঈমান)

অর্থাৎ সে সত্যিকার মুমিন নয়। দ্বীনদারীর অপর নাম হল তাকওয়া। কেউ দেখুক বা না দেখুক। ব্যস আল্লাহ পাকের ভয় অন্তরে থাকতে হবে। এখানে মসজিদে ছাত্ররা ফ্যান চালিয়ে ঘুমায়। এটা দ্বীনদারী ও দিয়ানতদারীর পরিপন্থী কাজ নয় কি? অবশ্যই দ্বীনদারী পরিপন্থী কাজ। কেউ দেখুক বা না দেখুক আল্লাহ পাক তো দেখছেন।

৪১. নিজের বড়দের সামনে স্বীয় ইলম ও যোগ্যতা প্রকাশ করা অনুচিত

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : নিজ মুরব্বী ও উস্তাদদের সামনে কখনো নিজ ইলম প্রকাশ করতে নেই। তাঁদের সামনে ছোট হয়েই থাকবে। যদি তাঁরা কোন কথা বলেন আর সে কথা তোমার জানাও থাকে, তখনো এভাবে কথা বলা অনুচিত যে, হযরতজী! এটা আমারও জানা আছে। তিনি যা কিছু বলেন সেটা শুনবে। এমন ভাব ধরবে যেন তুমি কিছুই জাননা। এসব

বিষয়ের কারণে উস্তাদের অন্তরে ছাত্রের প্রতি মহব্বত ও অনুরাগ সৃষ্টি হয়। আর যদি কোন কথা বলতেই হয় তাহলে এভাবে বলবে যে হযরত! এ কথাটা আমি এভাবে বুঝেছি। টীকার মধ্যে এভাবে লিখেছে, আমি কি তাহলে সঠিক বুঝেছি? অর্থাৎ কথা বলার ভঙ্গি হওয়া উচিত বিনয়সুলভ।

সাহাবায়ে কিরামের পদ্ধতি এটাই ছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে কোন কথা জিজ্ঞেস করলে প্রতিউত্তরে তাঁরা বলতেন اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَعْلَمُ অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালো জানেন।

ইলম থাকা সত্ত্বেও শুধু আদব ও সম্মানের কারণে তাঁরা এমনটি বলতেন।

একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাযি.কে জিজ্ঞেস করলেন : এটা কোন্ মাস ও কোন্ দিন? কোন্ স্থান? প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এটাই বললেন : "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সব থেকে ভালো জানেন।" সাহাবায়ে কেরামের রাযি. কি ঐ দিন সম্পর্কে জানা ছিল না? যে আজ কোন্ দিন? এখন কোন্ মাস? এটা কোন্ স্থান? প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা একই কথা বলেছেন।

কারণ তাঁরা নিজেদের ইলমকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলমের সামনে তুচ্ছ মনে করেছেন যে, আমরা যা জানি ভুল জানি। আমরা যা বুঝেছি ভুল বুঝেছি। আমারা ভুল বুঝতে পারি। আমাদের ইলমও ভুল হতে পারে। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কথা বলবেন সেটা অবশ্যই সত্য হবে। যদি তিনি দিনকে রাত বলেন তাহলে সেটা রাতই হবে। যদিও আমাদের চোখ দিন দেখছে।

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, বড়দের সামনে স্বীয় ইলম ও বড়ত্ব প্রকাশ করতে নেই। কোন কিছু জানলেও প্রকাশ করবে না। আদবের চাহিদা এটাই। দ্বিতীয়ত : হতে পারে যে আমরা ভুল বুঝেছি।

তবে হাঁ, যদি বড় ব্যক্তি কোন কিছু জিজ্ঞাসা করেন, জানতে চান এবং বলার নির্দেশ দেন, তখন আদবের সাথে বলা এবং সঠিক উত্তর দেওয়া জরুরী। নতুবা এটা চরম পর্যায়ের মূর্খতা ও অবাধ্যতা হবে। لِأَنَّ الْأَمْرَ فَوْقَ الْأَدَبِ বা কারো নির্দেশ পালন করা হল সর্বোচ্চ পর্যায়ের আদব।

৪২. তালিবে ইলমের হালাল খাদ্যের ব্যাপারে খুব যত্নবান থাকা চাই

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : তালিবে ইলমের হালাল খাদ্যের ব্যাপারে খুব বেশি যত্নবান থাকা চাই। হারাম থেকে খুব সতর্ক থাকা উচিত। অভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হয়। কিন্তু বর্তমানে এদিকে লক্ষই করা হয় না। যা মনে চাইল পানাহার করল। কারো কোন জিনিস চুরি করলে তার কষ্ট হবে। মনে ব্যথা লাগবে। সে পেরেশান হবে। যার উপলক্ষ হল এই চোর। ফলশ্রুতিতে এর আখেরাত ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি কেউ কারো লুঙ্গী চুরি করে পরিধান করে, তাহলে এমন ব্যক্তির কি কখনো ইলম নসীব হবে? হালালের ব্যাপারে যত্নবান না থাকলে নেক আমলের তাওফীকই হবে না। তার থেকে যে সব আমল প্রকাশ পাবে সেগুলোকে নেক আমল বলাই হবে না। নবীগণ আ.কে পর্যন্ত হালাল খানার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাইতো ইরশাদ হয়েছে :

يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ

অর্থাৎ "হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র (হালাল) খাদ্য খাও এবং নেক আমল করো।" (সূরা মুমিনূন, আয়াত ৫১)

মুফাসসিরীনে কেরাম এর গুরুত্ব বর্ণনা করে লিখেন যে, আল্লাহ পাক হালাল খাদ্যের আলোচনা প্রথমে করেছেন। নেক আমলের কথা পরে বলেছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, প্রথমে হালাল খাদ্য হতে হবে, তবেই আমল ভালো হবে। এজন্যই হালাল খাদ্যকে নেক আমলের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪৩. তালিবে ইলম ও নাস্তার গুরুত্ব

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন, ছাত্রদের মধ্যে সকালে নাস্তা করার প্রচলন বর্তমানে বেশি দেখা যাচ্ছে। নতুবা আমার ছাত্র যমানা পর্যন্ত ছাত্রদের মধ্যে নাস্তার অভ্যাস ছিল না। যে ছাত্র খুব গুরুত্বসহ নাস্তা করত, তাকে ভালো দৃষ্টিতে দেখা হত না। হ্যাঁ, সন্ধ্যাবেলায় বেঁচে যাওয়া শুকনা রুটি যদি কেউ সকালে খেয়ে নিত তাহলে তো খেয়েই নিল। নতুবা সাধারণভাবে ছাত্ররা নাস্তায় অভ্যস্ত ছিল না। শুধু দুই বেলার খানাকেই যথেষ্ট মনে করা হত। মানুষ যেরকম অভ্যাস গড়ে নেয় সেটাই তার অভ্যাসে পরিণত হয়। নিজেকে এভাবে অভ্যস্ত করে নিলে দুইবেলার খানা কেন যথেষ্ট হবে না?

রামাযান মাসে বারো-তের ঘণ্টা পানাহার ব্যতীত থাকতে পারবে না!! শরীর দুর্বল হয়ে যাবে। মস্তিষ্ক কমজোর হয়ে যাবে। স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবে! ইত্যাদি এগুলা ফালতু কথা। যে ব্যক্তি যেভাবে তার মানসিকতা গড়ে তোলে, সেভাবেই তার মানসিকতা গড়ে উঠে।

পূর্বের যুগের মানুষেরা তো নাস্তা করত না। অথচ তাদের দেমাগ তো নষ্ট হয়ে যায়নি।

আমাদের মহান পূর্বসুরীগণ তো এমন ছিলেন যে, নাস্তা না করে রুটির শুকনো টুকরো যা ঘর থেকে বেঁধে নিয়ে যেতেন রাতে পানিতে ভিজিয়ে সকাল বেলা লবণ মিলিয়ে সেটাই খেয়ে নিতেন। এটাই তাঁদের নাস্তা আর এটাই তাঁদের খানা হত। তাঁরা এভাবে শুকনো রুটি খেয়ে খেয়ে যুগের গাযালী ও রাযী হয়েছেন। তাঁদের মস্তিষ্ক নষ্ট হয়নি। বরং এমন সব কালজয়ী অমর গ্রন্থ রচনা করে গেছেন যা আজ আমাদের চলার পথের পাথেয়।

আমাদের হযরত নাযেম ছাহেবও (হযরতওয়ালা পীর ও মুরশিদ হযরত মাওলানা আসআদুল্লাহ ছাহেব রহ.) নাস্তায় অভ্যস্ত ছিলেন না। ৬৫ বছর পর্যন্ত তো নাস্তাই করেননি। ৬৫ বছর পর যখন শরীরে দুর্বলতা দেখা দেয় এবং চিকিৎসা শুরু হয়। তখন ডাক্তারদের পরামর্শ অনুযায়ী নাস্তার মধ্যে ছোট বিস্কুট চা দুধের সাথে খাওয়া আরম্ভ করেন। নতুবা সারা জীবন তাঁর নাস্তার অভ্যাস ছিল না।

হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান ছাহেব রহ. দাওরায়ে হাদীস জামাআতের বড় বড় কিতাব পড়াতেন। কিন্তু কখনো নাস্তা করতেন না। তাঁর মস্তিষ্কও দুর্বল হয়নি। স্বাস্থ্যও খারাপ হয়নি। সারা যিন্দেগী পড়িয়েছেন।

আমিও নাস্তা করি না। এখনো পর্যন্ত করিনি। আসল কথা হল মানুষ যে জিনিসের অভ্যাস বানিয়ে নেয় সেটাই তার মেযাজ বনে যায়।

৪৪. কাজের মানুষ সাধারণত বেশি মোটা হয় না

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. যখন জনৈক আলেমের ব্যাপারে জানতে পারলেন যে, অনেক দুর্বল হয়ে গেছেন। (হযরত রহ. তাঁর সম্পর্কে মোটামুটি জানতেন) তখন বললেন যে, এটা এ কথার আলামত যে তিনি কাজ করছেন। কাজের মানুষ চিন্তিত থাকার কারণে সাধারণত বেশি একটা মোটা হয় না।

৪৫. বুযুর্গানে দ্বীনের আহার কম করার অবস্থা

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন, হযরত শাহ আব্দুর রহীম ছাহেব রহ. পুরো রামাযান মাস মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে শুধু দুই কাপ চা পান করতেন। এ ছাড়া আর কিছুই পানাহার করতেন না।

হযরত শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া রহ. একবার পুরো রামাযান এমনভাবে কাটালেন যে, শুধু এক পোয়া দধি সাহরীতে খেতেন। এছাড়া কিছুই খেতেন না।

এক বুযুর্গের ব্যাপারে কিতাবের মধ্যে লিখেছে যে, তিনি প্রতি ৪০ দিনে মাত্র একটি বাদাম খেতেন!

অধম সংকলক আরয করছে যে, স্বয়ং আমাদের হযরতের মেযাজও এ ধরনেরই। খানা খুব কম খেতেন। ইফতারের সময় এবং ইশার পর অতি সামান্য খেতেন। এ ছাড়া কিছুই খেতেন না। সুন্নাত অনুসরণের নিয়্যতে সাহরীতে দুই এক ঢোক পানি পান করেন। পনের বছর যাবত আমি অধম হযরতের এ অভ্যাস দেখেছি।

আর একবার হযরত নিজেও বলেছেন যে, প্রথমে আমার অভ্যাসও এটাই ছিল যে, সাহরী খেতাম না। অবশ্য সুন্নাত অনুসরণের নিয়্যতে দুই এক লোকমা খেয়ে পানি পান করে নিতাম। আর সফরে তো অনেক সময় তিন দিন পার হয়ে যায় কিন্তু খানা খাওয়ার সুযোগ হয়ে উঠে না। এর কারণ হল সফরে সামনে খানা খেতে লজ্জা লাগে। আর অনেক সময় মেযবান এত বেশি থাকে যে, একজনেরটা ছেড়ে অন্যজনেরটা খেলে অন্য সেটা বুঝতে পারে।

এছাড়া খানা খেতে প্রচুর সময় ব্যয় হয়। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় অনেক সময় দুই ঘণ্টা ব্যয় হয়ে যায়। এজন্য হযরতের মামূল হল বয়ানের পরপরই ফিরে আসেন। আর মাদরাসায় আসার পর সর্বপ্রথম কাজ হল ছাত্রদেরকে সবক পড়ানো এবং আগন্তুক মেহমানদের ইকরাম করা। অতঃপর আসত খাওয়ার পালা। আবার অনেক সময় বিশেষ মেহমান চলে আসলে ঐ খানাও মেহমানদেরকে খাইয়ে দেন। নিজে ক্ষুধার্ত থাকেন। এটাই হযরতের বেশির ভাগ সময়ের পবিত্র অভ্যাস।

৪৬. ছাত্রদেরও সুন্নাত-নাওয়াফিলের ইহতিমাম করা উচিত

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন, বর্তমানে ছাত্রদের মধ্যে সুন্নাত-নফলের পাবন্দী খুব কম। আমাদের দুই রাকাত সুন্নাত শেষ হওয়ার পূর্বেই

এরা সুন্নাত-বিতর সব শেষ করে ফেলে। নফল তো পড়েই না। আরে যদি ইশরাক-তাহাজ্জুদ না পড়ো তাহলে কমপক্ষে এ সব নামাযের সুন্নাত ও নফল তো পূর্ণ করবে। এর অনেক উপকার আছে। অন্তরে নূর পয়দা হয়। যেহেন তেজ হয়।

৪৭. ছাত্রদের জন্য কিছু উপকারী মামূলাত

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন, তোমরা যারা হাফেযে কুরআন তারা দৈনিক এক মানযিল কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করবে। ফজরের পর, আউয়াবীনে এবং নামাযের পূর্বে বিভিন্ন সময়ে এক মানযিল তিলাওয়াত করা কোন ব্যাপারই নয়। আর যারা হাফেয নয় তারা দৈনিক এক পারা করে তিলাওয়াত করবে। প্রত্যহ একশত বার দুরূদ শরীফ পাঠের অভ্যাস করবে। ঘুমানোর সময় কথাবার্তা বলার পরিবর্তে দুরূদ শরীফ পাঠ করতে করতে যদি ঘুমিয়ে যায় অথবা রাস্তায় চলার পথে যদি দুরূদ শরীফ পাঠ করে তাহলে কী সমস্যা?

মামূলাতের মধ্যে যা কিছু ছুটে যাবে, জুমুআর দিন যেহেতু অবসর আছে তাই সমস্ত কমতি এ দিন পুরো করে দিবে। যত পারা রয়ে গেছে জুমুআর দিন তিলাওয়াত করে নিবে।

এছাড়া জুমুআর দিন সূরা কাহ্ফও নিয়মিত তিলাওয়াত করবে। হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে, "যে ব্যক্তি জুমুআর দিন সূরা কাহ্ফ তিলাওয়াত করবে সে ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।" আর যে ব্যক্তি জুমুআর দিন সূরা কাহ্ফ তিলাওয়াত করে আল্লাহ তাআলা তার কপালে এমন নূর সৃষ্টি করে দেন যা এক সপ্তাহ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে।

এছাড়া জুমুআর দিন পুরো সপ্তাহের সবক এবং তাকরার পুনরায় আলোচনা করবে। অবশ্যই উন্নতি হবে।

৪৮. ছাত্রদের তারবিয়ত

ছাত্ররা মসজিদ থেকে বের হচ্ছিল। তখন ছাত্রদেরকে সম্বোধন করে হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বললেন : মসজিদ থেকে বের হওয়ার দু'আ তোমরা পড়েছ কি? দুআ পড়বে এবং জোরে পড়বে। যাতে অন্য মানুষদেরও স্মরণ হয়। এবং তাদেরও পড়ার তাউফীক হয়। কিন্তু এত জোরে নয় যে, হট্টগোল হয়। ব্যস, মোটামুটি এ পরিমাণ আওয়াজে বলবে যেন পাশের মানুষ শুনতে পারে।

৪৯. উপরের জামাআতের ছাত্রদের মাঝে মাঝে প্রাথমিক কিতাবসমূহও দেখা উচিত

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন, ছাত্ররা যখন বড় কিতাব পড়তে থাকে, তখন ছোট কিতাব দেখাটাকে লজ্জার বিষয় মনে করে। আমি যখন জালালাইন শরীফ পড়তাম, তখনও নাহবেমীর দেখতাম। কমপক্ষে পঞ্চাশ বার আমি নাহবেমীর কিতাব অধ্যয়ন করেছি।

৫০. ছাত্রদের জামাআত ছুটে যাওয়া বড় তাজ্জবের ব্যাপার

জামাআতের সময় কিছু ছাত্র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছিল। নামাযের পর হযরত দেখলেন কিছু ছাত্র মাসবূকও আছে। তাদের রাকআত ছুটে গেছে। হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. অসন্তুষ্ট হয়ে প্রচণ্ড গোস্বার হালতে দাঁড়ালেন এবং বললেন : বড় আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে, মাদরাসায় থেকেও তোমাদের জামাআত ছুটে যায়। যখন তোমাদের মনের বিপরীত বা মেযাজ পরিপন্থী কোন কাজ হয়ে যায় তখন তোমাদের অবস্থা কেমন হয়? আর শরীয়তের বিপরীত কাজ হবে অথচ সে দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। জামাআত দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরও তোমরা কথা বলছো? সবচেয়ে বেশি অনুশোচনা লাগে ঐ সব মানুষের জন্য যারা দেখার পরও বাধা দেয় না। আমি এটা সহ্য করতে পারি না। অন্যায় কাজে বাধা প্রদানের মন-মানসিকতাই নেই। এ সব কারণেই বর্তমানে মাদরাসাগুলো থেকে খাইর ও বরকত উঠে যাচ্ছে। মাদরাসায় থাকা অবস্থায় জামাআত এবং তাকবীরে উলা ছুটে যাওয়া মুমিন ব্যক্তির শান নয়। মুমিন ব্যক্তির শান তো হবে এমন যে, যা কিছুই হোক না কেন, তার সমস্ত কাজ আগপিছ হয়ে গেলেও তার নামায ছুটবে না। মুমিন ব্যক্তির জান বের হয়ে যেতে পারে, কিন্তু দ্বীনের উপর আমল ছুটে যাবে এটা কিছুতেই হতে পারে না। এসব কারণেই বর্তমানে আমরা সর্বত্র বঞ্চিত ।

সেনাবাহিনীতে ভর্তির সময় কাউকে নেওয়া হচ্ছে আর কাউকে নেওয়া হচ্ছে না। এখন যাকে নেয়া হচ্ছে না এটা তার জন্য আফসোসের ব্যাপার নয় কি? নিশ্চয়ই তার মধ্যে কোন ত্রুটি আছে। যদ্দরুন তাকে ভর্তি করা হচ্ছে না। তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অথবা কেউ ভর্তি ছিল কিন্তু তাকে চাকুরিচ্যুত করা হল। নিশ্চয়ই কোন না কোন বিচ্যুতি তার মধ্যে অবশ্যই আছে।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর দ্বীনের কাজ তাদের দ্বারাই নেন যাদের মধ্যে ইখলাস আছে। আর যার মধ্যে ইখলাস আছে তার আলামত হল তিনি করণীয় কাজগুলো ছাড়েন না। ভুলেন না। আর নিষিদ্ধ কাজগুলো করেন না।

আল্লাহর কসম! কান্নার কথা, কেন আজ আমাদের দ্বারা দ্বীনের কাজ নেওয়া হচ্ছে না?

আমি একা আর কী করতে পারি? আমি তো তোমাদেরকে শুধু বোঝাতেই পারি। এরচেয়ে বেশি আর কী করতে পারি? করতে তো হবে তোমাদেরকেই। মেশিন কি আর নিজে নিজে চলতে পারে? যখন সেটাকে চালানো হয় তখন চলে। শুধু দুআ করলে কি মেশিন চলবে? যদি কোন অলী বা নবীও এসে দুআ করে তবুও মেশিন নিজে নিজে চলবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সেটাকে চালানো না হবে।

দুনিয়া হল দারুল আসবাব বা উপকরণের ঘর। এখানে তো আসবাব অবলম্বন করতেই হবে।

যত কাজ আছে শুধু দুআর দ্বারা হয় না বরং সেটা করতে হয়। আসবাব অবলম্বন করতে হয়। তবেই সে কাজটি হয়।

আর যতক্ষণ পর্যন্ত تَعَاوُنْ عَلَى الْبِرِّ বা সৎকাজে পারস্পরিক সহযোগিতা না হবে অতক্ষণ পর্যন্ত ঐ কাজ হবেই না।

এজন্যই হাযারাতে আম্বিয়ায়ে কিরামদের আ. জন্যও সহকারী ও সাহায্যকারী হত। এ জন্যই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى

"তোমরা সৎকাজে ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা করো।" (সূরা মায়িদা, আয়াত ২)

অথচ তোমরা কিছুই করতে চাও না। কীভাবে তোমাদের দ্বারা দ্বীনের কাজ হবে? কীভাবে তোমাদের উন্নতি হবে?

যদি বাস্তবেই কিছু হতে চাও তাহলে তার জন্য এখন থেকেই কিছু করতে হবে। জামাআতের সাথে নামায আদায়ের পাবন্দী করতে হবে। যা যা হেদয়াত দেওয়া হয় সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। তবেই ইনশআল্লাহ উন্নতি হবে। সাফল্য তোমাদের পদচুম্বন করবে।

৫১. তোমরা নিজেরা যদি নেক এবং দ্বীনদার হতে না চাও তাহলে অন্যরা কিছু করতে পারবে না

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : তোমাদেরকে নেক এবং দ্বীনদার বানানোর চেষ্টা করা হয়। সবধরনের কৌশল অবলম্বন করা হয়। অথচ তোমরা নিজেরা ভালো হতে চাও না। তবে কি অন্য মানুষের ভালো হয়ে যাওয়ার দ্বারা তোমরা ভালো হয়ে যাবে? তুমি নিজে যদি খানা না খাও বরং তোমার সামনে অন্য কেউ খানা খায় তাহলে কি তোমার পেট ভরবে? যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজেরা চেষ্টা না করবে এবং স্বয়ং তোমরা দ্বীনদার না বনবে এবং ভালো হওয়ার যে সব উপকরণ আছে সেগুলো অবলম্বন না করবে অতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত ভালো মানুষ ও দ্বীনদার হতে পারবে না। আসল কথা হল, তোমরা দ্বীনদার হতেই চাও না। এটা কীভাবে বলা যেতে পারে যে, তোমরা ভালো হতে চাও? যদি সত্যিকার দ্বীনদার হতে চাও তাহলে যদি কেউ বলে যে, আমার ক্ষুধা লেগেছে। খানা খেতে চাই। খানা তার সামনে রাখাও আছে। দস্তরখান বিছানো আছে। কিন্তু সে খাচ্ছেনা। ক্ষুধা ক্ষুধা বলে চিৎকার করছে। তাহলে কেউ কি বলবে যে এর ক্ষুধা লেগেছে? যদি আসলেই ক্ষুধা লাগত তাহলে তো সামনে রাখা খানা খেত।

হে মাদরাসার তালিবানে ইলম! এর উপর তোমরা নিজেদের অবস্থা তুলনা করে নাও। হাসপাতালে সে ব্যক্তিই যায় যার সুস্থ হওয়ার ইচ্ছা আছে। যে সব ধরনের রোগ থেকে মুক্তি চায়। তোমরা দ্বীনী মাদরাসায় পড়ে আছো। তোমাদের মধ্যে তো সর্বদিক দিয়ে দ্বীনদারী থাকা উচিত। এবং সব ধরনের অভ্যন্তরীণ ব্যাধি থেকে তোমাদের মুক্ত থাকা উচিত।

৫২. মহান আল্লাহর অবাধ্যতার ক্ষতি

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতার শাস্তি দুনিয়াতেও হয় আখেরাতেও হবে। উভয় জগতে সে বঞ্চিত হবে। শুধু আর্থিক প্রাচুর্য ও সাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপন দেখে বিভ্রান্ত হওয়া অনুচিত।

জেলখানায় যে বন্দী থাকে খানা তো সেও খায়। তাহলে কি তার জন্য এটা মনে করা সঠিক হবে যে, সবাই আমার প্রতি সন্তুষ্ট? আর আমি নৈকট্যপ্রাপ্ত।

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর অবাধ্যতা করে তার উদাহরণ হল অপরাধী বন্দীর মতো। অপরাধীদের মত অবাধ্য বান্দাও পানাহার করে কিন্তু বঞ্চিত

থাকে। আল্লাহ পাকের নৈকট্য তার নসীব হয় না। নেক কাজের আগ্রহ তার অন্তর থেকে বের হয়ে যায়। এটা হল অবাধ্যতার শাস্তি। শুধু কাছে থাকাকে নৈকট্য বলে না। নৈকট্য তো তাকেই বলে যেটা খুশী এবং সন্তুষ্টির সাথে হয়। নতুবা দাগী আসামীও বাদশার সামনে উপস্থিত হয়। কিন্তু তার ব্যাপারে কেউ এ কথা বলবে কি যে সে বাদশার নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি? বাদশার মাহবূব বা প্রেমাস্পদ মানুষ!!

৫৩. দ্বীনী মাদরাসাগুলোতে আল্লাহ পাকের রহমত কখন নাযিল হয়?

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : একটা সময় ছিল যখন দ্বীনী মাদরাসাগুলোতে আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হত। মাদরাসার ছাত্ররাও এমন হত যাঁদেরকে দেখে ফেরেশতারা পর্যন্ত ঈর্ষা করত। তাঁরা তালিবে ইলমদের পায়ের নিচে নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন।

এখন তোমরাই বলো তোমরা কি তালিবে ইলম? তোমরা তো মাদরাসায় ডেরা স্থাপন করে আছ। অবৈধ দখল দিয়ে বসে আছ।

যার অন্তরে দ্বীনের সামান্য জযবা নেই। অন্যায় কাজে বাধা প্রদানের মেযাজ নেই, ভালো কাজে প্রচার-প্রসারের স্পৃহা নেই, তার মধ্যে কোন কল্যাণই নেই। তার অবস্থা ভালো নয়। তার উচিত স্বীয় ইসলাহ বা সংশোধনের ফিকির করা। এমন মানুষদেরকে কি তালিবে ইলম বলা যায়?

প্রকৃত তালিবে ইলম তো সেই যে নিয়মিত নেক আমল করে। তার মধ্যে ভালো কাজের আগ্রহ এবং অন্যায় কাজে বাধা প্রদানের মন মানসিকতা বিদ্যমান। অথচ তোমাদের অবস্থা হল চোখের সামনে অন্যায় অপকর্ম হতে থাকে কিন্তু তোমাদের জিহ্বা নড়ে না। ঘুমন্ত ব্যক্তির সামনে দিয়ে চলে যাও অথচ তাকে নামাযের জন্য জাগ্রত কর না। সারা দিন এদিক সেদিকের হাজারো কথাবার্তা বল, গালিগালাজ কর। কিন্তু দুটো ভালো কথা বলতে পার না। কামরা থেকে বের হওয়ার সময় কামরায় উপবিষ্ট সাথীদেরকে এটা বলতে পার না যে, 'আসুন! জামাআতের সময় নিকটবর্তী'। চলন্ত অবস্থায় এটা বলতে কতটুকু সময় লাগে?

৫৪. পরিবেশের প্রভাব

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : এক সময় হাতুরায় দ্বীনী পরিবেশ ছিল এবং দ্বীনদারীর বড় চর্চা ছিল। যুবক শ্রেণির মধ্যেও দ্বীনী ভাবধারা প্রবল

ছিল। পরস্পর প্রতিযোগিতা হত যে, কে কার থেকে দ্বীনী কাজে আগে বেড়ে যেতে পারে। আযান দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা হত। প্রত্যেক জামাআত কামনা করত যে, আমাদের মানুষ আযান দিবে।

আমাদের সময় দুটি জামাআত ছিল। এক জামাআতে আমি ও ভুট্টো ভাই (হযরতের স্নেহাস্পদ) ছিলাম। ফজরের আযান দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা কে কার আগে ফজরের আযান দিবে? ফজরের আযান দেওয়ার জন্য রাত ভর জেগে থাকত। আমরাও পালাক্রমে জাগ্রত থাকতাম। ঘটনাক্রমে একবার কেউ তার আগে আযান দিয়ে ফেলল। খুব হৈ চৈ হল। আমরা পরস্পর একে অন্যকে তিরস্কার করলাম। আমার সাথী বলল যে আগে দেখ কয়টা বাজে? জানা গেল যে, রাত দুইটায় ফজরের আযান দিয়ে দিয়েছে!

যেখানে আযান দেওয়ার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা হত আজ সেখানে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, নামাযেরও পাবন্দী নেই। কত পরিবর্তন!

আসলে যুগের বাতাস। পরিবেশের প্রভাব। পূর্বের যুগে গ্রামে দ্বীনী ভাবধারা প্রবল ছিল। রামাযান মাসে মানুষ সারা দিন মসজিদে থাকত। সবাই যিকির তিলাওয়াতে লেগে থাকত। আর এখন তো মসজিদ খালী পড়ে থাকে। দু এক জনকে শুধু তিলাওয়াত করতে দেখা যায়।

৫৫. আজ ছাত্রদের থেকে ফয়েয লাভ হচ্ছে না কেন?

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. ছাত্রদেরকে সম্বোধন করে বলেন : যে ব্যাপারে নিষেধ করা হয়, যে জিনিসের উপর পাবন্দী লাগিয়ে দেওয়া হয়, তারপরও সেটা থেকে নিবৃত্ত না হওয়া আর ঐ কাজই পুনরায় করা কত খারাপ কথা।

বর্তমানে ছাত্রদের মধ্যে আনুগত্যের স্পৃহা নেই। এ জন্যই বর্তমান যুগের ছাত্ররা উপকৃত হতে পারছে না। মানুষ পড়ালেখা করে ফারেগ হয়ে যায় কিন্তু মূর্খই থেকে যায়। এ জাতীয় লোকগুলো পরবর্তীতে হয় তেল বিক্রি করে অথবা হাল চালায় অথবা অন্য কোন কাজ করে। দ্বীনের কাজ বা দ্বীনের ফয়েয তাদের দ্বারা হয় না।

যে তালিবে ইলম নিজ উস্তাদদের কথামত চলে না, তার দ্বারা কী ফায়েদা হাসিল হবে? কখনোই নয়। নাম হয়ত হবে যে অমুক মাদরাসা থেকে ফারেগ হয়েছে। আলেম হয়েছে। ইশতিহারে নাম এসে যাবে। সনদও লাভ হবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি নসীব হবে না। দ্বীনের প্রকৃত ফয়েয তার দ্বারা লাভ হবে না।

আজ তোমাদের কারণে (ছাত্রদেরকে সম্বোধন করে) আমাদের কত ধরনের পেরেশানী উঠাতে হয়। কত কিছুর ব্যবস্থা করা লাগে। তোমাদের বিশৃংখলার কারণে নিময়-কানূন বানাতে হয়। কিন্তু এরপরও তোমরা কানূনের বরখেলাপ কর। হাদীসে পাকে ঐসব মানুষের উপর অভিশাপের কথা এসেছে যারা অপরের পেরেশানীর উপলক্ষ হয়। ছাত্র উস্তাদের প্রতিটি শাসনও প্রতিটি কথা যতক্ষণ পর্যন্ত মানার জন্য প্রস্তুত না হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার মন মানসিকতা এভাবে গড়ে না উঠবে, অতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ছাত্রের দ্বারা কিছুই হবে না।

৫৬. ছাত্রদেরকে আদব দান ও সতর্ক করা

ছাত্রদেরকে লক্ষ্য করে হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : তোমরা মাদরাসায় এসেছ কেন? নিজেদের জীবন গড়তে এসেছ নাকি বিগড়াতে এসেছ? তোমরা নিজেরাই দেখ তোমরা গড়ে উঠছ নাকি বিগড়ে যাচ্ছ? তোমরা লোকদেরকে এবং ঘরের মানুষদেরকে ধোঁকা দিচ্ছ। তোমাদের পিতামাতা টাকা পাঠাচ্ছেন এই আশায় যে, ছেলে মেহনত করে পড়ছে। অথচ তোমরা এখানে স্বাধীনভাবে ঘুরাফেরা করছ। পড়ালেখার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। ভালো ভালো ছাত্র সবকে উপস্থিত হয় না। প্রায় দিন অভিযোগ শুনতে হয় যে, ছাত্ররা অনুপস্থিত। এ অনুপস্থিতি কেন? অন্য কিছুর মধ্যে তো অনুপস্থিত দেখা যায় না। খাওয়ার সময় তো কাউকে অনুপস্থিত দেখা যায় না।

অন্যান্য ছাত্রদের কর্তব্য হল যে সব ছাত্র পড়ালেখায় অমনোযোগী বা বে পরোয়া, নামায পড়ে না, মাদরাসার দায়িত্বশীলদেরকে চুপে চুপে জানিয়ে দিবে। নেগরান হুযূরদেরও স্বীয় দায়িত্বের অনুভূতি নেই। আরে কমপক্ষে ছাত্রদের চেহারায় তো দৃষ্টি পড়েই। যদি কোন ছাত্র দাড়ি কাটে অথবা তার মাথার চুল বড় থাকে, তবে এর সংশোধন করা উচিত। আমাদের দায়িত্ব হল এদের সংশোধন করা। এদেরকে বোঝানো। এরপরও বিরত না থাকলে এসব ছাত্র মাদরাসায় থাকারই যোগ্য নয়।

৫৭. কষ্টের কথা

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : আমার জন্য সবচেয়ে বেশি কষ্টও পীড়াদায়ক মুহূর্ত হল, যখন আমি দ্বীনী মাদরাসাগুলোতে কোনো অন্যায় কাজ হতে দেখি, আর সেটার কোনো প্রতিবাদও হয় না। আমার এত কষ্ট হয় যে, মনে হয় যেন কেউ আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। মাদরাসায় থেকে অন্যায় কাজ। কত বড় তাজ্জবের ব্যাপার। আরে ভাই ভুল মানুষের হতেই পারে। কিন্তু বারবার নিষেধ করার পরও কোনো প্রভাব না পড়া বড় পীড়াদায়ক ব্যাপার।

আমাকে যদি কেউ দৈনিক ১০০ ঘা জুতা লাগায় সেটাও আমি সহ্য করতে পারব কিন্তু অন্যায় কাজ আমি সহ্য করতে পারি না। আমার খুবই কষ্ট হয়। এটাই আমার জন্য শক্ত মুজাহাদা। আমি চিন্তা করি যদি দ্বীনী মাদরাসাগুলোতে এগুলোর ফিকির করা না হয় এবং অন্যায় কাজে বাধা দেওয়া না হয় তাহলে আর কোথায় হবে?

আজ সকালে যখন আসলাম তখন দেখলাম যে, তীব্র আলোময় বাল্ব জ্বলছে অথচ ছাত্ররা ঘুমুচ্ছে! এত তীব্র আলোসম্পন্ন বাতি জ্বালানোর কী প্রয়োজন? এত বড় বাল্ব যদি মাদরাসার বারান্দায় লাগিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে পুরো মাদরাসা আলোকিত হয়ে যাবে। এ জাতীয় অন্যায় কাজ দেখে আমার খুব কষ্ট হয়।

৫৮. মাদরাসায় কাজের ছাত্র পরিমাণে কম হলেও হাজারো ছাত্রের ভীড়ে অনন্য

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : বর্তমানে মাদরাসাগুলোতে ছাত্রদের অনেক ভীড় পরিলক্ষিত হয়। জানি না কোথা থেকে আসে আর কোথায় হারিয়ে যায়? হাজারের মধ্যে মাত্র এক দুইজন কাজের ছাত্র পাওয়া যায়। এরকম কাজের ছাত্র পরিমাণে অল্প হলেও ঐ বেহুদা ভীড় থেকে উত্তম।

পূর্বের যুগে ছাত্র পরিমাণে হত কম। কিন্তু তাঁরা হত কাজের। আসল কথা হল বর্তমানে দ্বীনের প্রচার-প্রসারের নিয়্যতে ইলমই হাসিল করে না। কেউ স্কুল কলেজে ভর্তি হয়ে যায়। কেউ অন্য কাজে লেগে যায়।

পরবর্তীতে এদেরকে এমন কথা পর্যন্ত বলতে শোনা গেছে যে, আরবী মাদরাসায় পড়ে আমরা আমাদের যিন্দেগী নষ্ট করেছি। সময় অপচয় করেছি!

আসল ব্যাপার হল এরা ছাত্রযমানায় মেহনত করে না। পরবর্তীতে আফসোস করে এবং মাদরাসার বদনাম করে।

৫৯. এটা উন্নতি নয় অবনতি

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : বর্তমানে সরকারী স্বীকৃতি পাওয়াটাকে কওমী মাদরাসাগুলোর জন্য বিশাল বড় অর্জন মনে করা হয়। বলা হয় যে, আমাদেরকে হাইস্কুল বা বি'এর সমমান দেওয়া হয়েছে। এর উপর গর্ব প্রকাশ করা হয়। অথচ এটাই আমাদের কওমী মাদরাসাগুলোর অধঃপতনের কারণ। ছাত্ররাও এই নিয়তে ইলমে দ্বীন অর্জন করে! অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "যে ব্যক্তি দুনিয়ার উদ্দেশ্যে ইলম শিখবে সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।" (আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৩৬৬৬)

৬০. অভ্যাস ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : সামান্য জিনিস থেকেই ধীরে ধীরে অভ্যাস খারাপ হতে থাকে। প্রথমে ছোট কিছু নেয়। পরে বড় জিনিস নেওয়া আরম্ভ করে। এক পর্যায়ে চুরি-ডাকাতি শুরু করে। ছাত্র যমানায় আমি এবং আমার এক সাথী হযরত নাযেম ছাহেবের এখানে থাকতাম। নাযেম ছাহেবের এখানে অধিকাংশ সময় আপেল ছিলে খাওয়া হত। ছিলকা বাইরে নিক্ষেপ করা হত। আর আপেল ছিলার খেদমত আমরা আঞ্জাম দিতাম।

মনের মধ্যে খেয়াল আসল যে, আরে এটা তো ছিলকা! আর এটা তো বাইরেই ফেলে দেওয়া হবে। এটা খেয়ে নিলে কী এমন সমস্যা? কিন্তু তাওবা তাওবা। আজ তো ছিলকাই। আগামীকাল ছিলকার সাথে অর্ধেক আপেলও খাবে।

প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিটি মুহূর্তে স্বীয় আত্মশুদ্ধির চিন্তা রাখা উচিত। এবং নিজ নফসের পুরো নেগরানী করা উচিত। এ জাতীয় সাধারণ ব্যাপারগুলোর প্রতিও লক্ষ্য রাখা দরকার। নতুবা এগুলোর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এরপর শুধু অধঃপতন আর অধঃপতনই হয়। উন্নতি হয় না।

পক্ষান্তরে এ জাতীয় ছোটখাটো ব্যাপারে সতর্ক থাকার ফলে মানুষ না জানি কোথা থেকে কোথায় উন্নতি লাভ করে। আমাদের যত সাথী ছিলেন সকলেরই এই অবস্থাই ছিল।

যদি সত্যিকারেই কারো থেকে ভুল হয়ে যায় তাহলে সে তাওবা করে নিবে। তাওবার দরওয়াযা সব সময় উন্মুক্ত। শয়তান ধোঁকা দিবে। নফস কুমন্ত্রণা দিবে। কিন্তু আগামীর জন্য অঙ্গীকার করবে যে, আর এই কাজ করব না ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিবেন।

৬১. ছাত্ররা আন্তরিক হলে মাদরাসায় দ্বীনী পরিবেশ হতে পারে

ইশার নামাযের পর ছাত্রদেরকে উপদেশ প্রদান করার সময় হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : যদি তোমরা চাও, তাহলে কি মাদরাসার পরিবেশ দ্বীনী হতে পারে না? যা বলা হয় এর উপর আমল করো। মাদরাসার যে ব্যবস্থাপনা আছে সেটার অনুসরণ করো। মাদরাসার পরিবেশ দ্বীনী বানাও। দ্বীনী

পরিবেশ বিনির্মাণে আমাদেরকে সহযোগিতা করো। সাহায্য ব্যতীত তো কোনো কাজ হয় না।

আম্বিয়ায়ে কেরামের আ. সহযোগিতার জন্য উপলক্ষ হিসেবে সহযোগীর প্রয়োজন হয়েছে। একজন মানুষ একা কী করতে পারে? এ জন্যই ইরশাদ হয়েছে-

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى

অর্থাৎ " তোমরা সৎকাজে ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অপরের সহযোগিতা করো।" (সূরা মায়িদা, আয়াত ২)

মাদরাসায় থেকে تَعَاوُنْ عَلَى الْبِرِّ বা সৎকাজে সহযোগিতা এটাই যে, ভালো পরিবেশ বানাও। লেখাপড়ার পরিবেশ বানাও। খেলাধুলা, আনন্দ-ভ্রমণ ও ফেতনা-ফাসাদের পরিবেশ করতে দেখলে তাকে বাধা দাও। যখন নামায পড়ার জন্য আসবে, তখন যাকেই রাস্তায় পাবে তাকেই নামাযের দাওয়াত দিবে। ঘুমন্ত মানুষদেরকে জাগিয়ে দিবে। এতে কী ক্ষতি? এখনই যদি এ সব বিষয়ে অভ্যস্ত না হও তাহলে আর কবে অভ্যাস গড়ে উঠবে?

৬২. একটি কিতাবের সমাপ্তি উপলক্ষে ছাত্রদেরকে নসীহত

একটি কিতাবের সমাপ্তি উপলক্ষে ছাত্রদেরকে নসীহত প্রদান করে হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : ইলম মানুষকে উপকার পৌঁছায়। আবার এর মাধ্যমে ক্ষতিও হয়। লাভ-ক্ষতির ভিত্তি হল নিয়্যতের উপর। আমলের উপর। এই ইলমই উপকারী হতে পারে যদি নিয়্যত ঠিক থাকে। আর যে ব্যক্তি যা কিছু পাবে একমাত্র মহান আল্লাহর অনুগ্রহেই পাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহর অনুগ্রহ না হবে, অতক্ষণ পর্যন্ত আমলের তাউফীক হতে পারে না। না লেখাপড়া করার। না লেখাপড়া করানোর। যত ভালো কাজ হয়, সব আল্লাহ পাকের তাউফীকের বদৌলতেই হয়।

৬৩. ইফতা এবং সদ্যফারেগ ছাত্রদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ নসীহত

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. সদ্য দাওরা ফারেগ এবং ইফতার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে নসীহত প্রদান করতঃ (যাঁদের মধ্যে মাদরাসার কোনো কোনো উস্তাযও শরীক ছিলেন) বলেন : এ সব জিনিস পড়া বা পড়ানোর দ্বারা উদ্দেশ্য কী? আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর অবস্থা ও আখলাক এজন্যই পড়া বা

পড়ানো হয় যাতে করে ঐ অবস্থা ও আখলাক আমাদের মধ্যেও সৃষ্টি হয়। শুধু পড়া-পড়ানো উদ্দেশ্য নয়।

আর এটাই আমাদের আসল ঐতিহ্য যে, আমরা আমাদের পূর্বসুরীদের মত ও পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকব। বর্তমানে আমরা আমাদের ঐতিহ্য বাদ দিয়ে অন্যদের ঐতিহ্য অবলম্বন করে চলছি। আমাদের ঐতিহ্য ছিল তাকওয়া ও পরহেযগারী। আল্লাহপাকের উপর ভরসা ও অমুখাপেক্ষিতা। দারিদ্র ও সরলতা। শুকনো রুটি খেয়ে জীবন যাপন করা। আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করা ও দ্বীনী খেদমতে লেগে থাকা। এসবই ছিল আমাদের ঐতিহ্য।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিন্দেগী এমনই ছিল। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হালাত ও গুণাবলী এ জন্যই পড়ানো হয়, যাতে আমাদের মধ্যেও ঐ সব হালাত ও গুণাবলী পয়দা হয়ে যায়। দুনিয়াতে আজ সব ধরনের নমূনা পাওয়া যায়। এই নমূনাও তো সামনে থাকতে হবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের রাযি. যিন্দেগীর নমূনাও আমাদের সামনে থাকা উচিত।

তাওয়াক্কুলের নমূনা, তাকওয়ার নমূনা, অনুপম চরিত্র মাধুরীর নমূনা, ধৈর্য ও অল্পে তুষ্টির নমূনা, অনাহার ও দারিদ্রের নমূনা। এগুলো সব হল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিন্দেগীর নমূনা।

মানুষ নমূনা দেখে। দোকানে বহু ধরনের সামান থাকে। চপ্পলও আছে, জুতাও আছে। কাপড়ও আছে, লুঙ্গীও আছে। বিভিন্ন জিনিসের নমূনা রাখা থাকে। মানুষেরা এসে এসে দেখে থাকে। কারো এটা পসন্দ। কারো ওটা পসন্দ। প্রত্যেকেই যার যার পসন্দ অনুসারে নমূনা অবলম্বন করে।

অনুরূপভাবে আমাদের মধ্যে আলেম সমাজ ও মুদাররিসদের মধ্যেও (যাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তরাধিকারী) ভালো গুণাবলীর নমূনা থাকা চাই।

আমাদের যিন্দেগী হল মানুষের জন্য নমূনা। এজন্য আমাদেরকে হতে হবে সর্বগুণে গুণান্বিত ব্যক্তি। নতুবা শুধু পড়ে বা পড়িয়ে কী লাভ? বর্তমানে আমাদের যিন্দেগীতে আমাদের পূর্বসুরীদের ঐতিহ্য নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের রাযি. আদর্শ নেই। আমরা অন্যান্যদের মত ও পথ অবলম্বন করে বসে আছি। লোভ-লালসা, রিয়া-লৌকিকতা ইত্যাদি মন্দ স্বভাব আমাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাযত করুন।

৬৪. এক মাদরাসার নাযেম ছাহেবের ছেলেকে নসীহত

মাদরাসার একজন তালিবে ইলম (যার আব্বা একটি মাদরাসার যিম্মাদার ও নাযেম ছিলেন)কে লক্ষ্য করে হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : তুমি যদি পরিশ্রম করে পড়ালেখা কর তাহলে সেটা কতইনা খুশীর ব্যাপার হবে। তোমাকে নিয়ে তোমার আব্বার কত আশা। কত স্বপ্ন! অথচ তোমার এই অবস্থা। তোমার আব্বা তো এটা ভাবছেন যে, আমার ছেলে বড় আলেম হয়ে পরবর্তীতে আমার মাদরাসার দায়িত্ব বুঝে নিবে। পুরো এলাকার দায়িত্ব নিবে। এজন্য তুমি ভালোভাবে মেহনতের সাথে পড়ালেখা করলে সেটা হবে আনন্দের ব্যাপার। এর মধ্যে সমস্যাটা কী? আজ থেকেই মেহনত আরম্ভ করে দাও। সব সময় কিতাব দেখবে, সব সময় যেন হাতে কাগজ কলম থাকে। যে কথা বুঝে না আসে, সঙ্গে সঙ্গে সেটা নোট করে নাও। নিশান লাগিয়ে নাও। পরবর্তী সময়ে জিজ্ঞাসা করে নিবে। ইলম কেন আসবে না? কোনো সময় যেন নষ্ট না হয়। তোমার আব্বা তো তোমার ব্যাপারে আশা করে বসে আছে যে, তুমি মাদরাসার দায়িত্ব সামাল দিবে। তবে কি মূর্খ থেকে মাদরাসা সামাল দিবে?

৬৫. নাযেম না হওয়া, খাদেম হওয়া

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. ঐ ছাত্রকে লক্ষ্য করে আরো বলেন যে, আর শোন! মাদরাসার নাযেম হবে না। খাদেম হবে। অনেক মাদরাসার নাযেম মূর্খও হয়। এতে অবশ্য তাদের কিছু আসে যায় না। ঘড়ি ছড়ি শেরোয়ানী চশমায় সুসজ্জিত থাকে। আর গদিতে বসে হুকুম জারী করে। নাযেম হওয়া বড় সহজ কাজ। কিন্তু তুমি নাযেম না হয়ে খাদেম হবে। আর কিছু করে দেখাবে। মেহনত মুজাহাদা করবে। পড়বে পড়াবে।

হযরতওয়ালা ঐ ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি পবিত্র কুরআনের হাফেয কিনা? সে বলল, না। এতে হযরত আফসোস করলেন এবং বললেন, এখনই শুরু করে দাও। অল্প অল্প করে মুখস্থ করতে থাক। ইনশাআল্লাহ পুরো হয়ে যাবে।

৬৬. নিজের ছেলেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নসীহত

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ.-এর মেঝো ছেলে মাওলানা নাযীর আহমাদ ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম (যিনি এ মুহূর্তে মাদরাসায় শিক্ষকতার পাশাপাশি অনেক গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনী কর্মকাণ্ড আঞ্জাম দিচ্ছেন। আল্লাহ পাক তাঁকে আরো

উন্নতি দান করুন এবং হেফাযত করুন আমীন) হযরতওয়ালার কামরায় তাশরীফ আনলেন। আমি অধমও (সংকলক) কামরায় উপস্থিত ছিলাম।

হযরতওয়ালা রহ. ছাহেবযাদার প্রতি সম্বোধন করে বললেন : আরে তুমিও কিছু একটা কর। পড়া-পড়ানোর ধারা অব্যাহত রাখ। সব সময় কিছু না কিছু করতেই থাকবে। আর কিছু না হোক। কয়েকটা শিশুকে নিয়ে নাযেরা পড়ানোই আরম্ভ করে দাও। হিফয বিভাগের কোনো উস্তাযের পাশে বসে পড়। কিছু ছেলের কুরআন শরীফ শোনো। নাযেরা পড়ালে কি উন্নতি হয় না?

মানুষকে দেখানো তো আর উদ্দেশ্য নয়। যা কিছু করবে একমাত্র আল্লাহর জন্যই করবে।

কায়েদায়ে বাগদাদী পড়ানোর বরকতে মিঞাজী হযরত নূর মুহাম্মাদ ঝিনঝানভী রহ. হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর পীর হয়েছেন।

নাযেরা পড়ালেও উন্নতি হতে পারে। আসল উন্নতি তো হয় ইখলাসের দ্বারা। যে কাজে ইখলাস হবে ঐ কাজে উন্নতি হবে। আর কিছু না হোক। তাহলে নিজেই মুতালাআ (অধ্যয়ন) কর। এত কিতাবের স্তূপ। যা লাগে নিয়ে যাও। দেখ কত পুস্তিকা। এগুলোর মধ্যে ভালো ভালো বিষয়বস্তু আছে। সেগুলো দেখ। কিছু বিষয়বস্তু বাছাই করে তুমিও কিছু লেখ। সব সময় লেগে থাক। আমার এত চিঠি আসে। চিঠিই দেখ। এটাও একটি কাজ। যেখানে মন চায় বসে পড়। কিতাব দেখা আরম্ভ কর। আমার কামরায় বসেই কিতাব দেখ। মসজিদের কোনো কোণায় চলে যাও। কোথাও জায়গা না পেলে মাঠে চলে যাও। কোনো গাছের নীচে বসে কাজ করা আরম্ভ কর। দৈনিক তিন চার রুকু তাজবীদের সাথে কুরআনে পাক তিলাওয়াত কর। যিকির ও নফল নামায ইশরাক ও আউয়াবীনের পাবন্দী কর। কিছু তাসবীহাতের মা'মূল বানাও। দৈনিক কমপক্ষে পাঁচ পারা তিলাওয়াত কর। কিছু তো কর। দুনিয়া তো হল প্রাসঙ্গিক বস্তু। আসল তো হল দ্বীন এবং আখেরাত। কোন্ সন্তানের পিতা এটা কামনা করে না যে, আমাদের ছেলে সুখে থাক? কিন্তু আসল জিনিস তো হল দ্বীন। এটারও ফিকির করা উচিত।

দুনিয়াবী কাজের মধ্যে তো চেষ্টার পরেও সাফল্য ও ব্যর্থতা, লাভ ও ক্ষতি উভয়টির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু দ্বীনী কাজে তো ব্যর্থতার কোনো আশংকাই নেই।

আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন,

فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ○

"আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎ কর্মশীলদের ছাওয়াবকে নষ্ট করবেন না।"
(সূরা হুদ, আয়াত ১১৫)

যার দাদা বা পরদাদা এমন যে, জীবনে তাঁদের কখনো জামাআত ছুটেনি তাকবীরে উলা ফউত হয়নি। সেই বংশের নাতির তো অবশ্যই এটা খেয়াল রাখা দরকার।

আমি অধম সংকলককে সম্বোধন করে হযরতওয়ালা বললেন যে, আমার দাদার কখনো জামাআত ছুটেনি। যে অবস্থাতেই থাকেন না কেন, জামাআতের সাথে নামায অবশ্যই পড়তেন। ক্ষেতের মধ্যে হালও চালাতেন মজদুর না পেলে একাই ক্ষেতে কর্ষণ করতেন। কিন্তু যখনই নামাযের সময় হত, সবকিছু ছেড়ে দিয়ে অনেক দূর থেকে এই মসজিদে এসে জামাআতের সাথে নামায পড়তেন।

ছাহেবযাদার প্রতি সম্বোধন করে বললেন : তোমারও উচিত এভাবে জামাআতের সাথে নামাযের পাবন্দী করা। আর আজকের থেকে মুতালাআ আরম্ভ করে দাও। যে কোনো শাস্ত্রের কিতাব মুতালা'আ কর। সীরাতের এত কিতাব রাখা আছে, সব এক দিক থেকে দেখে ফেল। ইতিহাসের এত কিতাব, সেগুলোও দেখে ফেল। ছেলেদেরকে তাকরার করাও। কিছু ছেলে বাছাই করে তাদেরকে কুরআন শরীফ পড়াও। কাজে লেগে থাক।

৬৭. ছাত্রদের কামেল হওয়ার একটি পদ্ধতি

ইশার নামাযের পর ছাত্রদেরকে উদ্দেশ্য করে হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : তাহাজ্জুদ এবং নফল নামায পড়ার অভ্যাস গড়ে তোল। ফজরের আধা ঘণ্টা পূর্বে উঠে পড়। উযু ইত্যাদি থেকে অবসর হওয়ার পর তো দশ-পনের মিনিট পাওয়াই যাবে। দু চার রাকাত নফল নামায পড়ে নাও। অতঃপর কিতাব মুতালাআয় লেগে যাও। আর যদি শেষ রাতে চোখ না খুলে, তাহলে শোয়ার পূর্বেই তাহাজ্জুদের নিয়্যতে দুই চার রাকাত নফল নামায পড়ে নাও। কিন্তু ফজরের আযান হওয়া মাত্রই মসজিদে চলে আসবে।

এতটুকু কর। এরপর দেখবে তোমরা কোথায় পৌঁছে গেছ। কীভাবে উন্নতি হয়।

৬৮. ইসলাহের উপকারী ও সহজ ব্যবস্থাপত্র। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য দুটো জরুরী মুরাকাবা

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : দু ধরনের মুরাকাবা বা ধ্যান প্রত্যেকের অবশ্যই করা উচিত। একটা হল এটা চিন্তা করবে যে, আজ সারাদিন আমি কী কী কাজ করেছি? কয়টি ভালো কাজ করেছি? আর কয়টি মন্দ কাজ করেছি? ভালো কাজের উপর আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করবে। আর মন্দ কাজের উপর লজ্জিত হবে। তাওবা ও ইসতিগফার করবে। এবং ভবিষ্যতে এ জাতীয় কাজ থেকে বিরত থাকার পাক্কা ইচ্ছা করবে।

দ্বিতীয় মুরাকাবা হল এটা চিন্তা করবে যে, আমাদের আমল ও আমাদের জীবন কি এমন যে এই অবস্থায় আমরা আল্লাহকে মুখ দেখাতে পারব? যদি এই অবস্থায় আচমকা আল্লাহর কাছে আমাদের চলে যেতে হয়, তাহলে আমাদের কী হাশর হবে? মৃত্যু তো কাউকে বলে কয়ে আসে না। হঠাৎ চলে আসে। এরকম হাজারো ঘটনা আছে। যদি কোন ব্যক্তি গুরুত্বের সাথে এ দুটি মুরাকাবা করে। বেশিক্ষণ নয় মাত্র পাঁচ মিনিটই করুক। আশা করা যায় খুব দ্রুত তার সংশোধন নসীব হবে এবং সে বেড়া পার হয়ে যাবে।

৬৯. ছাত্ররা ইশার পর কী করবে?

ছাত্রদেরকে উপদেশ প্রদান করতঃ হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : ইশার পরে হয়ত কিতাব অধ্যয়ন কর অথবা কুরআন শরীফ তিলাওয়াত কর কিংবা ঘুমিয়ে পড়। কারো সাথে একদম কথা বলবে না। এ অভ্যাস ভালো নয়। হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে,

نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمَرِ فِي اللَّيْلِ

অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা গল্পগুজব করতে নিষেধ করেছেন"। (তিরমিযী শরীফ)

ঘুমানোর সময় উযুর সাথে ঘুমাবে। যিকির করতে করতে ঘুমাবে। সূরা মুলক পড়ে ঘুমাবে। শোয়ার পূর্বে চার কুল পাঠ করে নিজের শরীরে দম করে নিবে। তাসবীহাত পাঠ করার সময় اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيٰى অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি আপনার নামেই মারা যাচ্ছি এবং আপনার নামেই জীবিত হব" পড়বে। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩১৪)

ঘুম থেকে উঠার পর প্রথমে এই দুআ পড়বে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ

অর্থাৎ "সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে জীবিত করেছেন আমাদেরকে মৃত্যু দান করার পর এবং তাঁর নিকটেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩২৪)

অতঃপর إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الخ অর্থাৎ সূরা আলে ইমরানের শেষ রুকু পড়বে। যারা ঘুমিয়ে থাকে তাদেরকে জাগিয়ে দিবে। ভালো পরিবেশ বানাও। লেখাপড়ার পরিবেশ বানাও।

মাদরাসায় থেকে تَعَاوُنْ عَلَى الْبِرِّ এর যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেটা এটাই। খেলাধুলা ঘুরাফেরা ও ফিতনা-ফাসাদের পরিবেশ বানিয়ো না। এটা تَعَاوُنْ عَلَى الْإِثْمِ যেটা নিষেধ।

বি: দ্রঃ تَعَاوُنْ عَلَى الْبِرِّ অর্থ হল মঙ্গলের কাজে এতে অপরকে সহযোগিতা করা। আর تَعَاوُنْ عَلَى الْإِثْمِ অর্থ হল গুনাহের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করা। এর মাধ্যমে হযরতওয়ালা সূরা মায়িদার দ্বিতীয় আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন :

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ

৭০. ইশার পর কথাবার্তা বলা এবং অনর্থক বিদ্যুৎ ব্যবহার করা নিষেধ

ইশার নামাযের পর ছাত্রদেরকে নসীহত করার পর হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : যাও। এখন গিয়ে আর কথাবার্তা বলবে না। তোমরা এখান থেকে গিয়ে কামরায় কথাবার্তা বলে থাক। এতে মানুষের নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটে। অনেকে আছে এমন যে, একবার তাদের চোখ খুলে গেলে নিদ্রা উধাও হয়ে যায়। এরপর আর ঘুমই আসে না। প্রচণ্ড পেরেশানী হয়। এটা কি কষ্টকর ব্যাপার নয়?

আমার তবিয়তও এমনই। একবার ঘুম নষ্ট হয়ে গেলে আর সহজে আসতে চায় না। নিশ্চয়ই আরো অনেকের তবিয়তও এমনই হবে। ইশার পর কথাবার্তা বলা এমনিতেই নিষেধ। বেশি জরুরী কথা থাকলে অনুচ্চস্বরে কথা

বলবে। কামরার বাতি বন্ধ করে ঘুমাবে। অনেক কামরায় সারা রাত বাতি জ্বলতে থাকে। এটা তো আমানতদারী ও তাকওয়ারও পরিপন্থী কাজ। মাদরাসায় থেকে যদি তাকওয়া ও দিয়ানতদারী না শিখে, তাহলে মাদরাসায় থেকে কী লাভ?

ছাত্ররা বর্তমানে এসব ব্যাপারে লক্ষ করে না। এ কারণেই বর্তমানে তাদের কথায় ও তাদের যিন্দেগীতে কোনো আছর নেই।

এমন যিন্দেগী গঠন করো যে, লোকজন তোমাদের যিন্দেগী দেখেই প্রভাবিত হয়। সাহাবায়ে কিরামের রাযি. যিন্দেগী দেখে মানুষ ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তোমাদের যিন্দেগীও সে রকম হওয়া উচিত যেন সাধারণ মানুষ এর দ্বারা প্রভাবিত হয়।

৭১. এই যিকির বিদআত নয়

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ.-এর মাদরাসার মামূল হল বাদ আসর দুআ থেকে ফারেগ হওয়ার পর সমস্ত ছাত্র ঐ অবস্থাতেই বসে বসে দুই মিনিট যিকির করে। অর্থাৎ এক তাসবীহ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ পাঠ করে। প্রত্যেক ছাত্র নিজের মতো করে এটা পাঠ করে।

একজন মেহমান যিনি বড় আলেমও ছিলেন। মাদরাসায় আগমন করলেন। তিনি বললেন যে, "আমি তো এটাকে বিদআত মনে করি।" ঐ আলেমের সাথে কারো কারো ইলমী আলোচনাও হয়েছে। যাতে তিনি খামুশও হয়ে গেছেন।

এই মেহমান অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধার সাথে হযরতের নিকট আসলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে সমালোচনা করলেন। তখন হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বললেন : এটা চিন্তা করার মতো ব্যাপার। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত মাশায়েখ এবং আউলিয়ায়ে কেরাম গত হয়েছেন। যাঁদের পুরো যিন্দেগী সুন্নাতের অনুসরণে অতিবাহিত হয়েছে। যাঁরা একটি একটি সুন্নাতের উপর আমল করনেওয়ালা ছিলেন। তাঁরাও এভাবে যিকির করেছেন। তবে কি তাঁরা সকলেই বিদআত করেছেন? আমাদেরও কি তাহলে বিদআতের আগ্রহ? আমরাও তো জানি বিদআত নাজায়েয, হারাম। এখানে তো শুধু ছাত্রদেরকে অভ্যস্ত করানোর জন্য তাদের মাধ্যমে যিকির করানো হয়। যাতে করে ছাত্রদের যিকিরের অভ্যাস গড়ে উঠে।

৭২. সমালোচনার দ্বারা নয়; অনুসরণের দ্বারা কাজ হয়

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : শাইখের উপর আপত্তি উত্থাপন করা উচিত নয়। এর দ্বারা অনেক ক্ষতি হয়। এমন ব্যক্তি সব সময় বঞ্চিত থাকে। যা কিছু অর্জন হয় সমালোচনার দ্বারা নয় বরং অনুসরণের দ্বারাই হাসিল হয়। অনুসরণের দ্বারাই কাজ হয়। এটা ছাড়া উন্নতি হয় না। অবশ্য কোনো মাসআলা তাহকীক করা এবং মনের প্রশান্তির জন্য বোঝা এটা ভিন্ন কথা। কিন্তু সমালোচনা ও আপত্তি উত্থাপন করা ক্ষতিকর।

৭৩. এক ব্যক্তির আপত্তি ও তার উত্তর

ঐ মেহমান ব্যক্তি বলছিলেন যে, এভাবে ইজতিমা ও ইহতিমামের সাথে যিকির বুঝে আসে না। কোনো ছেলে উঠে গেলে তাকে তিরস্কার করা হয়। কঠোরতার সাথে যিকির করানো হয়। কোন মুবাহ কাজে পীড়াপীড়ি করা হলে সেটা বিদআত হয়ে যায়।

আমি অধম সংকলক আরয করলাম যে, যদি মুবাহ জিনিসকে তার পর্যায় থেকে আগে বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে নিশ্চয়ই বিদআত হবে। কিন্তু যদি সেটাকে তার স্বাভাবিক অবস্থা থেকে আগে বাড়ানো না হয় বরং মুস্তাহাব মনে করে অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য, তালীম-তারবিয়্যত হিসেবে যদি কিছুটা কঠোরতাও করা হয় এবং ছাত্রদেরকে এর পাবন্দ বানানো হয়, তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই।

দেখুন হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে,

مُرُوْا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُوْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ

অর্থাৎ "তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে নামাযের নির্দেশ দাও যখন তাদের বয়স সাত বছরে পৌঁছে এবং এজন্য (প্রয়োজনে) তাদেরকে প্রহার করো, যখন তারা দশ বছর বয়সে উপনীত হয়।" (আবূ দাউদ, ১ : ৭৭)

এখানে বলাবাহুল্য যে, এ বয়সে নামায ফরয হয় না। বরং নফল ও মানদূব পর্যায়ে থাকে। কিন্তু শুধু অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য তার মাধ্যমে নামায পড়ানো হয়। কঠোরতাও করা হয়।

বোঝা গেল যে, মুবাহ জিনিসেও মুবাহ মনে করে তার নিজ পর্যায়ে রেখে অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য কঠোরতা করা জায়েয। এ উত্তর শুনে ঐ আলেম ব্যক্তি খামুশ হয়ে গেলেন এবং কোনো উত্তর দিলেন না।

৭৪. বড়দের ভুলের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব উপযুক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করা উচিত

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বালাগাত তথা আরবী অলংকারশাস্ত্রের বিখ্যাত কিতাব মুখতাসারুল মাআনীর সবক পড়াচ্ছিলেন। গ্রন্থকার একস্থানে উদাহরণ দিয়েছেন, حَفِظْتَ التَّوْرَاةَ তুমি তাউরাত মুখস্থ করেছ।

হযরতওয়ালা বলেন : বুঝলাম না, এই উদাহরণ তিনি কেন দিলেন? কতইনা ভালো হত যদি তিনি حَفِظْتَ الْقُرْآنَ "তুমি কুরআন হিফয করেছ।" অথবা حَفِظْتَ الْبُخَارِيَّ বা "তুমি সহীহ বুখারী মুখস্থ করেছ।" এই জাতীয় উদাহরণ দিতেন।

এ প্রসঙ্গেই হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : ভুল তো সবারই হয়। বড়দেরও ভুল হয়। কিন্তু বড়দের ভুলের যথাসম্ভব তাবীল বা সুন্দর ব্যাখা করে নেওয়া উচিত। حَفِظْتَ التَّوْرَاةَ কেমন যেন আশ্চর্যান্বিত হওয়ার উদাহরণ হিসেবে বলেছেন। কেননা কুরআনে পাক হিফয করা কোনো আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। ব্যাপকভাবে মানুষ মুখস্থ করে। কিন্তু সাধারণত তাউরাতের হাফেয হয় না। এটা মুখস্থ করে ফেলাটা বাস্তবেই একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার। এই তাবীল হতে পারে। মোটকথা। বড়দের কথার যথাসম্ভব ভালো ব্যাখ্যাই করা উচিত।

৭৫. বুখারী শরীফ-মিশকাত শরীফের হিফয

এ প্রসঙ্গেই হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : পূর্বের যুগের মানুষ বুখারী শরীফেরও হাফেয হত। আমার এক আত্মীয় লক্ষ্ণৌর টিলাওয়ালী মসজিদে থাকতেন। হযরতওয়ালা গাঙ্গুহী রহ.এর হাতে বাইআত ছিলেন। তাঁর পূর্ণ বুখারী শরীফ মুখস্থ ছিল। মিশকাত শরীফও মুখস্থ ছিল। আল্লাহ পাকের এমন বান্দাও গত হয়েছেন।

৭৬. হযরতওয়ালার আমলী হেকমত, দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা

মাদরাসার ছাত্রদেরকে উদ্দেশ্য করে হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : আমি তোমাদেরকে হাজার বার নিষেধ করেছি। যার ঘুরাফেরা করার ইচ্ছা মাদরাসারই সীমানায় বিশাল লম্বা চওড়া ময়দান পড়ে আছে। সেখানে খুব বিচরণ কর। খেলাধুলা কর। ঘুরাফেরা কর। কিন্তু মাদরাসার সীমানার বাইরে নালার কাছে যেওনা। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো গুঢ়তত্ত্ব আছে। যে কারণে নিষেধ করা হয়।

সব কথা বলা যায় না। তোমরা তো বুঝ না ফেতনার যুগ। বিনা কারণে খামোকা কোনো ফিতনা সৃষ্টি হোক এটা কিছুতেই কাম্য নয়। অনেক মানুষ আছে যারা সব সময় ষড়যন্ত্র করে যেন কোনো একটি ফেতনা সৃষ্টি হয়। যে কোনো মুহূর্তে মারাত্মক কিছু ঘটতে পারে। এটা ফেতনার যুগ। নিজেকে রক্ষা করা উচিত।

এখানে এত ছাত্রের ভীড়। এত বড় মাদরাসা। ঐ সব মানুষের কি এসব ভালো লাগে? মাদরাসার আলীশান ইমারত দেখে কি তারা খুশী হয়?

পর তো পরই হয়। সকলের মন মানসিকতা একই রকম। اَلْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ বুযুর্গানে দ্বীনের বিশেষ তাওয়াজ্জুহ এবং খাস দুআর বরকতে আমাদের এখানে ফেতনা নেই। নতুবা সর্বত্র কমবেশি ফেতনা বিদ্যমান।

যে কোনো মুহূর্তে ফেতনা সৃষ্টি হতে পারে। এ জন্য মাদরাসার সীমানার বাইরে যাওয়ারই প্রয়োজন নেই। শুধু যেদিকে যাওয়ার অনুমতি আছে সেদিকেই যাবে। অন্য কোথাও যাবে না।

৭৭. শুধু ইলম আর বয়ান করার ক্ষমতা যথেষ্ট নয়। আমল এবং তাকওয়াও জরুরী

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : ইলমের উদাহরণ হল চেরাগ এবং দিয়াশলাই এর মতো। আর আমলের উদাহরণ হল আলোর মত। যদি দিয়াশলাই কাছে থাকে কিন্তু সেটাকে জ্বালানো না হয় অতক্ষণ পর্যন্ত আলো হাসিল হবে না। অনুরূপভাবে শুধু ইলমের দ্বারা কিছুই হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সেটাকে ব্যবহার না করবে। অর্থাৎ ঐ ইলম অনুযায়ী আমল করা না হবে। যখন আমল করবে তখনই ঐ ইলম দ্বারা ফায়েদা হবে। কিন্তু বর্তমানে শুধু ইলমকেই কৃতিত্বের ব্যাপার মনে করা হয়। বলা হয় অমুক ব্যক্তি দারুণ যোগ্যতাসম্পন্ন। অমুক ব্যক্তি খুব ভালো বক্তা। অথচ এটা কোনো কামাল বা কৃতিত্ব নয় বরং ধোঁকা। প্রসিদ্ধি তো খুব হয়। পোষ্টারে বড় বড় অক্ষরে নাম চলে আসবে। বড় বড় উপাধিতে ডাকা হবে। ফার্স্টক্লাসের ভাড়া পাবে। হাদিয়া তোহফা মিলবে। সবকিছু হবে। কিন্তু প্রথমত সে অন্যদেরকে ধোঁকা দিল। দ্বিতীয়ত নিজেই ধোঁকা খেল। বয়ান তো খুব লম্বা চওড়া ও আকর্ষণীয়। কিন্তু সফরে গেলে দেখবে যে, নামাযই ছেড়ে দেয়!!

৭৮. উলামায়ে কেরামের পাকড়াও খুব শক্ত হবে

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : উলামায়ে কেরামের পাকড়াও খুব শক্ত হবে। যে জানার পরও আমল করল না। বাকি ব্যাপারটার মর্ম এমন নয় যে, এই যখন অবস্থা, তাহলে চলো আমরা ইলমই হাসিল করব না। যাতে করে ধরপাকড়ের শিকার না হই! কেননা উভয় অবস্থাতেই পাকড়াও হবে। প্রথম অবস্থায় ইলম শিখে আমল না করার কারণে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় দুধরনের পাকড়াও হবে। একটি হল ইলম হাসিল না করা। আর দ্বিতীয়টি হল আমল না করা। এজন্য এ পাকড়াও আরো বেশি শক্ত হবে।

ইলম হাসিল করার অর্থ এই নয় যে, পুরো মৌলভী হয়ে যাবে, মাদরাসায় ভর্তি হয়ে যাবে। বরং শরীয়তের বিধি বিধান ও দ্বীনী মাসআলা-মাসায়িল শিখে নিবে। এটাই ইলমে দ্বীন অর্জন করা। চাই কিতাব পড়ার মাধ্যমে হাসিল করুক অথবা শুনে শুনে বা জিজ্ঞেস করে করে। যদি কেউ দৈনিক মাত্র দশ মিনিটও দ্বীনের কথা শুনে, এর দ্বারাও ইলম হাসিল হবে। পড়তে না পারলে লোকদের থেকে শুনবে। কিন্তু ইলমে দ্বীন হাসিল করা সর্বাবস্থায় জরুরী। এই ওযর কখনো শোনা হবে না যে, অবসর পেতাম না।

৭৯. মাদরাসায় কাজের মানুষ কেন পাওয়া যায় না?

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : দুনিয়াতে প্রতিটি জিনিসের উন্নতি হচ্ছে। প্রতিটি জিনিস হচ্ছে, গড়ছে। কারখানা চলছে। এখানে ভালো থেকে ভালো এবং উন্নত থেকে উন্নত জিনিস তৈরি হচ্ছে। ব্যস, শুধু মাদরাসাগুলোই চলছে না। এর মধ্যে উন্নতি হচ্ছে না। এমনটি কেন? কারখানায় ভালো থেকে ভালো কাপড় তৈরি হয়। কিন্তু মাদরাসায় ভালো থেকে ভালো ছাত্র তৈরি হয় না কেন? কেননা কারখানা চালানোর মতো মানুষ বিদ্যমান আছে। যারা কারখানায় কাজ করে, তারা ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকে। পরবর্তী সময়ে এরা কাজ করে। যে কাজ সে শিখে নেয় সেটাকে কারখানায় ছেড়ে দিয়ে আসে না। বরং ঐ কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে। কারখানার স্থান কখনো শূন্য থাকে না। একজন নেই তো আরেকজন এসে যায়। কিন্তু মাদরাসায় অবস্থানকারী ছাত্রবৃন্দ মাদরাসা চালানোর যোগ্য হয় না। একটি কারণ হল, মাদরাসা চালানোর যোগ্যতাই নেই। আর দ্বিতীয় কারণ হল যারা যোগ্যতাসম্পন্ন তারা এতে লেগে থাকে না। অন্যস্থানে চলে যায়। কেউ দোকান খুলে কারখানার মালিক বনে। কেউ সৌদিআরব চলে যায়। মোটকথা যারা মেধাবী ছাত্র, তারা এদিক সেদিক চলে যায়। তাহলে মাদরাসায় কে

লাগবে? আর এই কাজ কে আঞ্জাম দিবে? এ জন্যই বর্তমানে মাদরাসা পরিচালনা করার মতো যোগ্য ব্যক্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। আর দু একজন যাও পাওয়া যায় তারা হয় অকর্মণ্য। ইল্লা মাশাআল্লাহ।

৮০. সবক পড়ানোর গুরুত্ব

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : বুঝিনা বুযুর্গানে দ্বীন এবং মাশায়িখ পড়া ও পড়ানোর শোগল কেন রাখেন না?

হযরত শাহ অসিয়্যুল্লাহ ছাহেব রহ. (বিশিষ্ট খলীফা হযরত হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত আশরাফ আলী থানভী রহ.) দরসী কিতাবসমূহ তথা মিরকাত ইত্যাদি সবকিছু পড়াতেন। এবং শেষ জীবন পর্যন্ত পড়িয়েছেন। একবার আমি উপস্থিত হলাম। তখন তিনি মিরকাতের সবক পড়াচ্ছিলেন। আমি হযরতের নিকট খুব বেশি যাতায়াত করতাম। ঐ সময় বান্ধা থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত ট্রাক প্রচুর পরিমাণে চলত। বান্ধায় ঐ সময় শস্য খুব হত। দেশের বিভিন্ন অংশে এখান থেকে শস্য যেত। এলাহাবাদেও যেত। এ জন্য এলাহাবাদে অনেক ট্রাক চলত। মুন্নু ভাই (বান্দার প্রসিদ্ধ ধনী ব্যক্তি) এর বাসও খুব চলত। এতে আমার ভাড়া লাগত না। এ জন্য এলাহাবাদে আমার প্রচুর হাযিরী হত। ট্রাকে করে গেলে ঘাটে নেমে যেতাম। পুলের উপর এক কিনারায় পড়ে শুয়ে থাকতাম। আর সকালে রিক্সায় হযরতের খেদমতে উপস্থিত হয়ে যেতাম।

একবার উপস্থিত হওয়ার পর হযরত শাহ অসিয়ুল্লাহ ছাহেব এলাহাবাদী রহ. জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি এত সকাল সকাল কিভাবে এসে গেলে? আমি অধম আরয করলাম যে, রাতেই এসে গিয়েছিলাম। ঘাটের নিকটবর্তী পুলে শুয়ে থেকেছি। হযরত এ উত্তর শুনে খুব হাসলেন। আর তিনি বললেন যে, “সিদ্দীককে দেখ রাতে এসে গেছে আর ঘাটের কাছেই শুয়ে পড়েছে।” আমাকে খুব স্নেহ করতেন। একবার বলেছিলেন যে “সিদ্দীক! তুমি বাস্তবেই সিদ্দীক।”

হযরত এলাহাবাদী রহ. এর নিকট আমি আমার শাইখ ও মুরশিদ হযরত নাযেম ছাহেব (মাওলানা আসআদুল্লাহ ছাহেব রহ.)এর নির্দেশে গিয়েছিলাম। গিয়ে আরয করেছিলাম যে, হযরত নাযেম ছাহেব এ কথা বলে পাঠিয়েছেন যে, “এলাহাবাদ কাছাকাছি আছে। সেখানে যাও। আর গিয়ে বল যে, অমুক পাঠিয়েছে।” এ কথা শুনে হযরত এলাহাবাদী রহ. খুব খুশী হয়েছিলেন।

৮১. জলসার কারণে সবক বাদ দেওয়া অনুচিত

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. মাহুবায় একটি জলসায় তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন। হযরতের বড় ছাহেবযাদাও তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন। জলসার পর হযরত হাতুরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। জলসার কারণে পুরো রাত ব্যস্ততায় কাটল। ফজরের পূর্বে মাদরাসায় পৌঁছলেন। শোয়ার সুযোগেই পাননি। হযরতওয়ালা রহ. তো নিজ পবিত্র অভ্যাস অনুযায়ী ফজরের নামাযের পর সবক পড়ানোয় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সবকের পর জিজ্ঞেস করলেন : হাবীব (হযরতের বড় ছেলে) কোথায়? নিশ্চয়ই ঘুমুচ্ছে। সে কি আর পড়াবে? আজকে তো সে সারা দিন ঘুমাবে। সারা দিন না ঘুমালে তার ঘুম পুরো হবে না। এমন মানুষের সফর করাই উচিত নয় যে, সবক বাদ দিয়ে শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীদের ক্ষতি করে।

অধম সংকলক আরয করছে যে, সারা রাত জাগ্রত থাকার পর দিনে আরাম করা হল মানুষের স্বভাবজাত চাহিদা। যা তিরস্কারযোগ্যও নয়। কিন্তু হযরতওয়ালা অদ্ভূত পন্থায় নিজ ছেলের তরবিয়ত করেছিলেন। এরই ফলে আজ ঐ ছেলে নিজ পিতার পদ্ধতিতেই কাজ করছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে আরো উন্নতি দান করুন।

৮২. সবক পড়ানোর পদ্ধতি

একটি কিতাবের দরস দেওয়ার সময় হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : আসল জিনিস এটাই যে, যে শাস্ত্রের যে কিতাব এবং শাস্ত্রীয় যে মাসআলাটি বয়ান করা হয়েছে, প্রথমে সেটা বুঝিয়ে পরে ঐ বিষয়বস্তুটি মূল পাঠের সাথে মিলিয়ে দিবে। শুধু লম্বা চওড়া তাকরীর করার দ্বারা কিছুই হয় না। এবারত হল করানো হল আসল কাজ। যামায়ের বা সর্বনামসমূহের مراجع প্রকাশ করবে। সহীহ সহীহ তরজমা করবে। লোকেরা এটা না করে লম্বা চওড়া তাকরীর করে! তোমরা খুব মুতালা'আ করো এবং এবারতের মধ্যে খুব চিন্তা করো।

৮৩. সবক পড়ানোর অপূর্ব পদ্ধতি

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. একটি কিতাবের দরস দিচ্ছিলেন। জনৈক তালিবে ইলম এবারত পাঠ করার পর বললেন যে "তুমি এবারতের তরজমা কর।" তরজমার সাথে সাথেই হযরত এবারতের ব্যাখ্যা এবং এর মর্ম বয়ান করছিলেন। اسماء موصوله এবং ضمائر এর مراجع এর ব্যাপারে বিশেষভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করছিলেন। তালিবে ইলমের তরজমার মধ্যে যে সব ভুল

হচ্ছিল। হযরত সেটারও সংশোধন করে দিচ্ছিলেন। হযরতওয়ালা বলেন : পড়ানোর এ পদ্ধতিটি ভালো। যে তালিবে ইলম নিজেই মুতালাআ করে আসবে এবং তরজমা ও মর্মের ব্যাখ্যাও তার মাধ্যমেই করানো হবে। যেখানে ভুল করবে সেখানে ঠিক করে দিবে। প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত ব্যাখ্যা পেশ করা হবে। চেষ্টা করা হবে যেন তালিবে ইলম নিজেই হল করতে পারে। সবকের তাকরীর তার মাধ্যমেই করাবে। এভাবে পড়ানোর দ্বারা বাস্তবিক পক্ষেই যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। পূর্বসুরী মনীষীদের পড়ানোর এটাই পদ্ধতি ছিল। এ জন্যই তো তাঁদের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁরা ইলমের সমুদ্র ও পাহাড় হতেন। আর বর্তমানে প্রথমত ছাত্ররা মুতালাআই করে আসে না। আর দ্বিতীয়ত শিক্ষকও শুধু লম্বা চওড়া তাকরীর করাই জানে। যিনি বেশি কথা বলতে পারেন এবং লম্বা চওড়া তাকরীর করতে পারেন। ব্যস, তাকেই সব থেকে ভালো শিক্ষক মনে করা হয়।

আমি তো পরিষ্কার বলি : লম্বা তাকরীরকারী বাস্তবিকপক্ষে মাঝে মধ্যে নিজের দোষ লুকিয়ে থাকেন। ইবারতও হল করান না। সহীহ তরজমাও করতে পারেন না। এবারত এবং এর মর্মের মধ্যে মিল দেখান না। ব্যস তাকরীর করে বের হয়ে যান। লম্বা তাকরীর করে সমস্ত কথার উপর পর্দা ঢেলে দেয়া হয়।

৮৪. পেশোয়ারের একটি মাদরাসার ব্যবস্থাপনা এবং পড়ানোর অদ্ভূত নিয়ম

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : পেশোয়ারে একটি মাদরাসা আছে সেখানে সবক পড়ানোর নিয়ম এটাই যে, ছাত্ররা নিজেরা মেহনত করে মুতালাআ করে আসে। আর ছাত্ররাই সবকের তাকরীর করে। উস্তায শুনতে থাকেন। ছাত্র কোনো ভুল করলে উস্তায বলেন হুঁ, ছাত্র বুঝে ফেললে তো ঠিক আছে, নতুবা উস্তায সহীহ তাকরীর করে দেন। এর দ্বারা ছাত্রদের যোগ্যতা ভালো সৃষ্টি হয়। ঐ মাদরাসার ব্যবস্থাপনাও অদ্ভূত। মাদরাসায় কোনো দারুল ইকামাহ (ছাত্রাবাস) নেই।

ছাত্রদের থাকা খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। মাদরাসায় ছাত্ররা শুধু পড়তে আসে। আর আশপাশের গ্রামে থাকে। সেখানের সাধারণ মানুষের মধ্যে দ্বীনের জযবা খুব বেশি। গ্রামবাসীরা নিজেরাই বলে : আমাদের গ্রামে দশ জন ছেলের ব্যবস্থা থাকবে। কোনো গ্রামে বিশজন ছেলের ব্যবস্থা। ছেলেরা সকালবেলা মাদরাসায় পড়তে চলে আসে। এক সময়েই তালীম হয়।

কেননা ছেলেরা আশাপাশ থেকে আসে। দুই সময় আসতে তাদের কষ্ট হবে। এ জন্য মাদরাসায় এক সময়েই পড়া হয়। পড়ালেখা করে ফিরে চলে যায়।

এই ব্যবস্থাপনাটা ভালো। বাবুর্চীর চিন্তাও নেই। শস্য, আটা, ডালের চিন্তাও নেই। ব্যস একটাই কাজ শুধু পড়া আর পড়ানো। পূর্বসুরী মনীষীদের মধ্যে এ পদ্ধতিই চালু ছিল।

৮৫. আমাদের অঞ্চলের দুর্ভাগ্য

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা এমন এক এলাকায় সৃষ্টি হয়েছি যেখানে লোকজন জানেই না যে, তালিবে ইলম কী জিনিস? ছাত্রদের সামান্য লোকমাকেও তারা হারাম মনে করে। শূকর কুকুর গরু গাধাকে খাওয়াবে। কিন্তু তালিবে ইলমকে খাওয়ানো এবং তাঁদের ব্যবস্থাপনার কোনো মন মানসিকতা এদের মধ্যে নেই।

৮৬. বিরোধিতা না করাও আল্লাহর বড় নেয়ামত

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : এই এলাকায় তো তারপরও গনীমত যে শাদী ইত্যাদির সময় কোন না কোন বাহানায় জিজ্ঞেস করে নেয়। কোন কোন এলাকায় তো এটাও নেই। এক স্থানে কয়েক বছর ছিলাম। তিন চারজন মুদাররিস ছিলেন। কিন্তু তিন চার বছরের এ বিশাল সময়ে একবারের জন্যও কোন মুদাররিসকে দাওয়াত দেওয়া হয়নি। অথচ একেবারে সামনেই থাকত। হ্যাঁ, আমরা তাদের দাওয়াতের জন্য মোটেও লালায়িত নই। কিন্তু এর দ্বারা সম্পর্কের্র ধরন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

যাই হোক এটাই বা কম কি যে, বিরোধিতা করেনি। নতুবা অনেক স্থানে তো মানুষ বিরোধিতা করে। আর হাত ধুয়ে পেছনে লেগে যায়। এ জন্য বিরোধিতা না হওয়াও অনেক বিশাল ব্যাপার। কেননা নির্বিঘ্নে কাজ করা যায়।

৮৭. মুতালাআ ব্যতীত পড়ানো অনুচিত

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : আমি এত বৎসর ধরে পড়াচ্ছি। কিন্তু তারপরও মুতালাআ [পাঠদানপূর্ব অধ্যয়ন] ব্যতীত কখনো পড়াইনা। চাই অল্প সময়ই মুতালাআ করি না কেন। হয়ত এক নযরই দেখি। কিন্তু মুতালাআ অবশ্যই করি। বুঝি না মানুষ মুতালাআ ছাড়া কীভাবে পড়িয়ে ফেলে? এটাও আমানত-দিয়ানতের ব্যাপার। বান্দার হক। পাঠদানকারীর উচিত নিজের পক্ষ

থেকে সর্বাত্মক পরিশ্রম করা। কোনো ত্রুটি না করা। না বুঝে এবং মুতালাআ ব্যতীত পড়ানোর অর্থ হল বান্দার হক নষ্ট করা।

আমি সফর থেকে ফিরে আসলে রাত দুইটা সময় মুতালাআ করি। ৪০ বছর পড়ানোর পরও আমার মুতালাআর প্রয়োজন হয়। বুঝিনা মানুষ কীভাবে মুতালাআ ব্যতীত ক্লাসে যায়। নতুন নতুন কিতাব নতুন নতুন বছর মুতালাআ ছাড়াই পড়ায়!! কিতাব পড়া থাকলেও কমপক্ষে একবার তো অবশ্যই দেখা উচিত।

অনেকে আছেন মনোযোগ দিয়ে মুতালাআ করেন না। উড়ন্ত দৃষ্টি বুলিয়ে ক্লাসে চলে আসে আর এদিক সেদিকে কথা হাঁকান। এটাও দিয়ানত পরিপন্থী কাজ। এতে বান্দার হক নষ্ট করার গুনাহ হবে।

৮৮. সবকে ছাত্র ব্যতীত অন্যদের অংশগ্রহণ

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : মাদরাসায় মেহমান আসেন। এদিক সেদিক বসে কথাবার্তা বলেন। যদি তাফসীর এবং হাদীসের সবকেই এসে বসে পড়েন তাহলে তো কিছু ফায়েদা হবে। আসলে অন্যান্য মাদরাসায় নিয়ম হল অনুমতি ছাড়া কেউ সবকে বসতে পারে না। প্রথমে অনুমতি নিতে হয়। এখানেও তারা সেটাই মনে করেন।

আমার এখানে তো পুরোপুরি অনুমতি আছে। যার মনে চায় এসে বসবে। শাইখুল হাদীসও যদি এসে বসে পড়ে তাহলে আমি ঐভাবেই সবক পড়াতে থাকব।

এক স্থানে আমার যাওয়া হল এবং একটি সবকে গিয়ে আমি বসে পড়লাম। সংশ্লিষ্ট শিক্ষক সবক পড়ালেন না। বরং বললেন যে, মাওলানা! আপনি এখানে থাকলে আমি সবক পড়াব না। এটা শুনে আমার খুব আফসোস হল। আমি উঠে চলে আসলাম।

এখানে এমন কী ব্যাপার আছে? যদি আমাদের কোনো মুরব্বী উপস্থিত থাকেন আর তিনি আমার সবক শুনতে থাকেন, তাহলে ভালো কথা। তিনি শুনুন, আমার যে সব ভুল-ভ্রান্তি হবে তিনি সেগুলোর সংশোধন করবেন। তাম্বীহ হবে। এতে আমারই উপকার। যেটা বুঝে আসবে না সেটা ঐ মুরব্বীর নিকট থেকে বুঝে নিব। এটা তো খুশীর ব্যাপার।

৮৯. প্রথম যুগের মেহনত সব সময় কাজে আসে

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : আমি যখন পড়ালেখার উদ্দেশ্যে সাহারানপুর যাই। সেখানে তো অনেক দিন পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষাই চলতে থাকে। ছাত্ররা এদিক সেদিক বসে কথাবার্তা বলতে থাকে। এক মজলিসে জনৈক তালিবে ইলম আসল। আর কোনো একটা কথা প্রসঙ্গে সে বলল ارے یار کیوں تجاہل عارفانہ کرتے ہو؟ অর্থাৎ আরে বন্ধু! কেন জেনে বুঝে কৃত্রিমভাবে মূর্খ সাজছ?

বাবে تفاعل এর একটি خاصہ বা বৈশিষ্ট্য হল تکلّف বা কৃত্রিমতা।

ঐ তালিবে ইলমটি যখন এ বাক্য ব্যবহার করল তখন আমি খুব প্রভাবিত হলাম এবং চিন্তা করলাম যে, এখানে তো বড় যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্র আছে দেখছি। এখানে ডাল গলবে না। (ব্যাপার সহজ হবে না) পানিপথে তো আমিই ছিলাম ক্লাসের সেরা ছাত্র। এখানে (সাহারানপুর) আসার পর চিন্তা শুরু হল। কিন্তু যখন কিতাবসমূহ আরম্ভ হয়ে গেল, সবক হতে থাকল তখন বুঝতে পারলাম যে, আরে আসলে কিছুই নয়। এবারত বা কিতাবের মূল পাঠই পড়তে পারে না। যখন তাকরার ও মুযাকারা করায় তখন এদিক সেদিক হাঁকায়। একটা বাক্য ছিল تجاهل عارفانه মনে হয় কোথা থেকে শুনেছে সেটারই বুলি আওড়াত। এতেই আমি অযথা এত প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলাম। এছাড়া আর কিছুই ছিল না। শুরুর মেহনত সব সময় কাজে আসে। এখন প্রাথমিক মেহনতের কদর বুঝে আসছে।

৯০. যোগ্যতা সৃষ্টি না হওয়ার ক্ষেত্রে ছাত্রদের দায় বেশি

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : আসল কথা হল ছাত্ররা নিজেরাই কিছু অর্জন করত চায়না। তাদের মধ্যেই আগ্রহ নেই। নতুবা এর জন্য চেষ্টা করত। কিতাব মুতালাআ করে আসত। এখনকার ছাত্রদের মধ্যে না আছে মুতালাআর গুরুত্ব আর না আছে তাকরারের চিন্তা। ব্যস সবকে এসে বসে পড়ে। উস্তাযের তাকরীর শুনে। সেটাও অমনোযোগের সাথে। এভাবে কি আর যোগ্যতা সৃষ্টি হয়?

৯১. হযরত শাহ অসিয়্যুল্লাহ ছাহেব রহ. এর বাণী : "মুতালাআ ব্যতীত পড়াকে আমি হারাম মনে করি"

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : হযরত মাওলানা শাহ অসিয়্যুল্লাহ ছাহেব রহ. বলতেন যে, "মুতালাআ বা পাঠপূর্বঅধ্যয়ন ব্যতীত পড়াকে আমি হারাম মনে করি।"

একবার আমি এলাহাবাদ গিয়েছিলাম। আমার চাক্ষুষ দেখা ঘটনা। হযরতের জামাতা মাওলানা মুবীন আহমদ ছাহেব মিরকাতের সবক পড়ছিলেন। ইবারত পড়ার ক্ষেত্রে ভুল করলেন। মাওলানা বললেন : মুতালাআ ছাড়া পড়ছ। খুব বকা দিলেন এবং বললেন : "বের হয়ে যাও। মুতালাআ ছাড়াই পড়তে এসে গেছে। মুতালাআ ছাড়া পড়াকে আমি হারাম মনে করি।"

৯২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের রহ. অবস্থা

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.এর আজীব মা'মূল ছিল। তিন মাস পড়াতেন। তিন মাস জিহাদ করতেন। তিন মাস ওয়ায নসীহত ও তাবলীগ করতেন। আর তিন মাস ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। কিন্তু তাঁর ব্যবসা সে রকম ছিল না যে রকম বর্তমানে হয়ে থাকে যে, নামায রোযা সব গায়েব। তাঁর ব্যবসা তাঁকে উদাসীন করতে পারত না।

৯৩. মাদরাসাগুলোতে পদমর্যাদা এবং কিতাব বণ্টনের ক্ষেত্রে ইনসাফপ্রিয়তা এবং হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর ঘটনা

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : হযরত থানভী রহ. কানপুরে পড়াতেন। হযরত এর খলীফা ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক রহ.। যিনি পশ্চিম বাংলার বর্ধমানের বাসিন্দা ছিলেন। হযরত থানভী রহ. কানপুর থেকে বিদায় নেওয়ার মুহূর্তে মাওলানা ইসহাক ছাহেব রহ.কে শাইখুল হাদীস বানানোর ইচ্ছা করলেন। লোকেরা কানাঘুষা আরম্ভ করল। মাওলানা ইসহাক ছাহেব রহ. যেহেতু বর্ধমানের অধিবাসী ছিলেন। এ জন্য উর্দুও খুব ভালো বলতে পারতেন না। এ কারণেও লোকজনের তাঁর ব্যাপারে আপত্তি ছিল। কিন্তু এ জাতীয় ক্ষেত্রে যোগ্যতা দেখা হয়, অঞ্চল দেখা হয় না। হযরত থানভী রহ. তাঁর যোগ্যতার ভিত্তিতেই তাঁকে বাছাই করেছিলেন। কিন্তু যখন মানুষের আপত্তি হল, তখন হযরত সকলকে একত্রিত করলেন এবং বললেন যে, "তোমরা কোন একটা হাদীস পড়ো।" মৌলভী ইসহাক তোমাদের নিকট বিভিন্ন প্রশ্ন করবেন। ফলে তারা হাদীস পড়ল। এর উপর মাওলানা বিভিন্ন প্রশ্ন করলেন। কিন্তু ঐ আপত্তি উত্থাপনকারীরা কোনো কথার উত্তর দিতে পারল না। অতঃপর হযরতওয়ালা থানভী রহ. বললেন : আচ্ছা এখন মৌলভী ইসহাক পড়বে আর তোমরা প্রশ্ন করবে। ফলে তারা বিভিন্ন রকম

প্রশ্ন করল। মাওলানা ইসহাক ছাহেব রহ. দারুণ সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করলেন। এ পর্যায়ে আপত্তিকারীরা নীরব হয়ে গেলেন। হযরতওয়ালা থানভী রহ. বললেন : কাউকে কোনো দায়িত্ব বা কোনো কিতাব তার যোগ্যতার কারণে দেওয়া উচিত। এমন নয় যে, আমাদের এলাকার বা আমাদের প্রদেশের অথবা আমাদের বংশের মানুষ। এটা বেইনসাফী পদ্ধতি।

৯৪. ফেতনা দমন করার চেষ্টা করবে

কড়া মেযাজের একজন তালিবে ইলম হযরতওয়ালা বান্দাভীর রহ. নিকট একটি ফেটে যাওয়া চাদর এবং সঙ্গে একটি বকরী ধরে আনল আর বলল যে, দেখুন এটা আমার নতুন শাল, এই বকরী এটা খেয়ে ফেলেছে। পুরো শাল ফেটে গেছে। দারুণ অসন্তোষ প্রকাশ করে রাগত ভাব নিয়ে ঐ তালিবে ইলম অভিযোগ করল।

হযরত তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং ঠাণ্ডা করার জন্য বললেন যে, "ক্ষতি যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। এখন কথা বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই। অকারণে কথা বাড়বে। বকরী তোমার ক্ষতি করেছে এটার সাওয়াব তুমি পাবে আর তোমার যে ক্ষতি হয়েছে সেটার ক্ষতিপূরণ তোমাকে আমি দিয়ে দিব"।

এটা শুনে ঐ ছাত্র খুশী খুশী ক্লাসে চলে গেল। নতুবা সে ক্লাসে প্রচণ্ড রাগের সাথে বলছিল যে, আমি এ বকরীটিকে মেরে ফেলব। যবেহ করে ফেলব। আর বাস্তবেই সে যবেহ করতে উদগ্রীব ছিল।

৯৫. দ্বীনের কাজের আগ্রহ কাম্য

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : একজন দোকানদার ব্যবসায়ী নিজ দোকানের উন্নতির ফিকির করে। সব সময় এই চেষ্টায় থাকে যে, দোকান খুব বড় হোক। দোকান একটি থাকলে আরেকটি হোক। এখানেও হোক। ওখানেও হোক। একটি কানপুরে আরেকটি লক্ষ্ণৌতে। একটি কারখানা এখানে চালু করা হয়েছে তো আরেকটি কলকাতায় চালু করা হোক। ব্যস, সব সময় এ চিন্তা ও ফিকিরই তার মধ্যে থাকে। এটা তো হল দুনিয়াদারদের অবস্থা।

যাঁরা দ্বীনদার, তাঁদেরও দ্বীনের ব্যাপারে এমনই হওয়া উচিত। সব সময় এই ফিকির রাখবে যে, দ্বীনের কাজ খুব হোক। এখানেও হোক। ওখানেও হোক। যেখানেই যাবে সেখানেই দ্বীনের কাজ করবে। যেখানে থাকবে দ্বীনের

কাজ করবে। শুধু একটি মাদরাসা খুলেই বসে থাকবে না। বরং যেখানে মাদরাসা প্রয়োজন, যেখানে সুযোগ পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করবে। মাদরাসার জাল বিছিয়ে দিবে। অল্প কাজের উপর তুষ্ট থাকবে না। দুনিয়াদারের ন্যায় দ্বীনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তির অবস্থাও এমন হওয়া চাই।

৯৬. আদবের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি কাম্য নয়

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ ছাহেব কাশ্মীরী রহ. এবং মাওলানা ইদরীস ছাহেব কান্ধলভী রহ. উভয়েই উঁচু স্তরের আলেম। মাওলানা ইদরীস ছাহেব দেশ বিভক্তির পর পাকিস্তান চলে গিয়েছিলেন। একবার আল্লামা কাশ্মীরী রহ. পাকিস্তান সফরে গেলেন। মাওলানা ইদরীস ছাহেবও উপস্থিত ছিলেন। একস্থানে উভয়েই মেহমান ছিলেন। মাওলানা ইদরীস ছাহেব রহ. হলেন আল্লাম কাশ্মীরী রহ.-এর ছাত্র। উস্তাদজীকে খুবই সম্মান করতেন। মেযবান শোয়ার যে ব্যবস্থা করেছিলেন তো শাহ ছাহেব এবং মাওলানা ইদরীস ছাহেব রহ. এর চারপায়ী বরাবর লাগানো ছিল। উভয়ের শোয়ার ব্যবস্থাপনা কাছাকাছি ছিল। মাওলানা ইদরীস ছাহেব আদবের কারণে শয়ন করছিলেন না। শাহ ছাহেব রহ. বললেন : শুয়ে পড়। কিন্তু মাওলানাা ইদরীস ছাহেব রহ. এর জন্য আদব প্রতিবন্ধক ছিল। শাহ ছাহেব রহ. পুনরায় বললেন : "মিঞা! শুয়ে পড়। অতিরিক্ত আদব মানুষকে সড়ক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।"

৯৭. দ্বীনের খাতিরে দুনিয়াদার এবং মালদারদের সাথে সাক্ষাৎ করা

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : আমার এমন কী প্রয়োজন পড়েছে যে, কালেক্টর, এসপি, থানাদার, দারোগা, ডাক্তার আর ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে সাক্ষাৎ করতে থাকব? তাদের কাছে যেতেই থাকব? একমাত্র দ্বীনের খাতিরে মাঝে মধ্যে যেতে হয়। এই বাহানায় ঐ লোকগুলো কিছুটা হলেও দ্বীনে ইসলামের কাছাকাছি হয়।

গতকাল সমস্ত কাজ বাদ দিয়ে আমি অমুক ডাক্তার ছাহেবকে দেখতে গিয়েছিলাম। অনেক ক্ষতি হচ্ছিল। কিন্তু গিয়েছি এবং সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এসেছি। এর মধ্যে আমার ব্যক্তিগত কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। স্রেফ দ্বীনের জন্য মানুষদের সাথে মেলামেশা করি। লোকদের সাথে জুড়ে থাকি। এ

জন্যই লোকদের বিবাহ-শাদীতে অংশগ্রহণের সুযোগ কোথায়? এর মধ্যে তো বাস্তবেই বিশাল ক্ষতি হয়। কিন্তু শুধু এই বাহানায় যে, এর মাধ্যমে কিছু মানুষ দ্বীনের কাছাকাছি হয়, এ জন্যই সব কিছু সহ্য করি।

৯৮. চুরির শাস্তি চোর অবশ্যই পাবে

(মাদরাসার একজন দরিদ্র ছাত্রের চপ্পল এবং সামান চুরি হয়ে গিয়েছিল। এই প্রেক্ষিতে ইশার নামাযের পর ছাত্রদের মজলিসে) হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : কোনো তালিবে ইলম নিজের মধ্যে তালিবে ইলমীর গুণাবলী সৃষ্টি করে তো দেখুক যে, কী হয়। আখের তালিবে ইলমের ব্যাপারেই তো এসেছে যে, ফেরেশতারা নিজেদের পর বিছিয়ে দেন। তাঁদের উপর আল্লাহ তাআলার রহমত নাযিল হয়। মাছেরা তাঁদের জন্য দুআ করে। কিন্তু কার জন্য? যার মধ্যে তালিবে ইলমসুলভ গুণাবলী থাকে।

অথচ বর্তমান যুগে তালিবে ইলমদের অবস্থা হল : জুতা চুরি করে। নাস্তা ও খানা চুরি করে। এমন মানুষদের উপর আল্লাহ পাকের রহমত নাযিল হতে পারে? এদের উপর তো আল্লাহ পাকের গযব ও গোস্বা নাযিল হয়।

এরা যেন এমনটি মনে না করে যে, আমার কিছুই হবে না। এ সব হল আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অবকাশ। যে মহান সত্তা কারূন, ফিরআউন ও হামানকে অবকাশ দিয়েছেন, বড় বড় কাফেরকে অবকাশ দিয়েছেন, সেই মহান সত্তা কি এদেরকে অবকাশ দিতে পারেন না?

কিন্তু পরে যখন পাকড়াও হবে। তখন প্রচণ্ড পাকড়াও হবে।

ইরশাদ হচ্ছে :

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ○

"নিশ্চয়ই আপনার প্রভুর পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন"। (সূরা বুরূজ, আয়াত ১২)

এমন পাকড়াও হবে যে, যেখানেই যাবে অপদস্থ হবে। পেরেশান হবে। তাকে এই পেরেশানী ও অপমান থেকে রক্ষা করার কেউ থাকবে না। যারা এ সব গরীব তালিবে ইলমের মাল সামানা চুরি করে। এদের পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। যে তালিবে ইলমের পায়ের নীচে নূরানী ফেরেশতারা ডানা বিছিয়ে দেন, তারা আবার চুরি করে কীভাবে?

ছাত্র যমানায় যার চুরির অভ্যাস গড়ে উঠেছে, সে যেখানেই যাবে সেখানেই চুরি করবে। সে মক্কা শরীফ মদীনা শরীফ কাবা শরীফ যেখানেই

যাবে সবখানে চুরি করবে। সে সেখানে গিয়ে কুরআন শরীফ ধরেও চুরি করতে ইচ্ছা করবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে হেফাযত করুন, আমীন।

হুকূকুল ইবাদ বা বান্দার হকের ব্যাপারটা অত্যন্ত নাযুক। বান্দা মাফ না করলে এটাকে আল্লাহও মাফ করবেন না।

৯৯. হে আল্লাহ! চোরকে আপনি ধ্বংস করুন

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : বর্তমানে চুরি অনেক বেড়ে গেছে। যেখানে দেখবে সেখানেই চুরি হবে। মেহমান আসে। তাঁদের জুতা চপ্পলও চুরি হয়ে যায়। ক্বারী ছাহেব এসেছিলেন। তার বদনা কেউ নিয়ে গেছে! মনে হয় কেউ অপেক্ষায় থাকে। আমি বিরক্ত। কিছুই বুঝে আসছে না যে, কী করব? যে মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয় সে কি পেরেশান হবে না? সে কি জাহান্নামে যাবে না? কয়েকটা পয়সার জন্য নিজের আখেরাত ধ্বংস করছ? স্বীয় জান্নাত খতম করছ? জাহান্নামের ইন্ধন হচ্ছ? যদি এ সব করতেই হয়, তাহলে অন্য কোথাও যাও। এ কাজের জন্য কি মাদরাসাই রয়ে গেছে? মাদরাসাই কি চুরি করার স্থান?

দুনিয়া হল কয়েকদিনের। এ জাতীয় মানুষকে খুব দ্রুত লাঞ্ছনা গঞ্জনার শিকার হতে হবে। আমার কথা তোমরা লিখে নাও। এমন মানুষ কিছু দিনের মধ্যেই চরম অপমানের শিকার হবে। পুলিশ না হোক অন্য কেউ তার হাত পা ভাঙ্গবে। ওর হাত পা ভেঙ্গে যাবে। সব অন্ধকার লাগছে। কিছু বুঝে আসছে না। কী করব? প্রতিদিন চুরি হচ্ছে। কারো চপ্পল কারো জুতা কারো ঘড়ি কারো বদনা। সব চুরি হয়ে যায়। সবাই মিলে এই সব চোরের জন্য আজকে বদদুআ করো যেন আল্লাহ তাআলা এমন চোরের হাতকে অবশ করে দেন। সে যেন অপারগ হয়ে যায়। এখান থেকেই অপদস্থ হয়ে বের হয়ে যায়। কালকেই অপদস্থ হয়ে যায়। সবাই দুরূদ শরীফ পড়ো। এবং সবাই মিলে বদদুআ করো। ফলশ্রুতিতে সবই মিলে দুরূদ শরীফ পড়লো।

অতঃপর হযরত বললেন যে, ঠিক আছে। আজকে থাকতে দাও। আরেক বার সুযোগ দাও।

১০০. একটি টর্চলাইট চুরির ঘটনা এবং হযরতের ইরশাদ

মাদরাসার একজন উস্তাদ ফজরের নামাযের সময় মসজিদে বসে বসে ঝিমুচ্ছিলেন। তাঁর সামনে থেকে কেউ একজন চুপে চুপে টর্চ উঠিয়ে গায়েব

করে দেয়। বা চুরি করে। খোঁজাখুঁজির পরও পাওয়া গেল না। হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. এটার ইলান করলেন, তারপরও পাওয়া গেল না। দ্বিতীয় দিন হযরতওয়ালা পুনরায় ফজরের নামাযের পর ইলান করলেন, (মসজিদেই খোয়া যাওয়া বা হারিয়ে যাওয়া কোনো জিনিসের ইলান করা জায়িয আছে) হযরতওয়ালা ছাত্রদের দিকে মুখ করে বললেন, আখের এই পড়া বা পড়ানোর দ্বারা উদ্দেশ্য কি? যদি ইলম অনুযায়ী আমল না হয় তাহলে সব বেকার।

মুসলমান তো তাকেই বলে যার যবান ও হাত থেকে অন্য মুসলমানরা নিরাপদ থাকে। অন্য কারো জিনিস নিয়ে নেওয়া বা লুকিয়ে ফেলা সব হারাম। এটা মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া। বান্দার হকের মুআমালা বড় কঠিন। দুই পয়সার পরিবর্তে সাতশত মাকবূল নামায দিয়ে দিতে হবে। এ জন্য কারো নিকট অন্যের কিছু থেকে থাকলে কোনো বাহানায় ফিরিয়ে দাও।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-এর নিকট অন্য কারো বাঁশের কলম থেকে গিয়েছিল। কায়েক মাইল পায়ে হেঁটে সেটা ফেরত দিয়ে এসেছেন।

১০১. এমন ব্যক্তি খুব দ্রুত অপদস্থ হয়

মাদরাসায় একজন মেহমান এসেছিলেন। ইশার নামাযের সময় তাঁর একটি মূল্যবান চপ্পল কেউ নিয়ে চলে গেল। হযরতওয়ালা চিন্তিত হলেন, আমি অধমকে বললেন যে, তাঁর চপ্পল তালাশ কর। অধম সমস্ত স্থান যেখানে চপ্পল খোলা হয় খুব ভালোভাবে দেখলাম। কিন্তু কোথাও পেলাম না। হযরতওয়ালা খুব বেশি পেরেশান হলেন, লজ্জিতও হলেন। ছাত্রদেরকে একত্রিত করে বললেন যে, চপ্পল কে নিয়ে গেছে? কোন তালিবে ইলম কখনো চুরি করতে পারে? এখনই যার এ অভ্যাস, ভবিষ্যতে এর অবস্থা যে কেমন হবে আল্লাহই ভালো জানেন। এরাই যখন পরবর্তীতে কোনো মাদরাসার মুদাররিস বা মুহতামিম হয়ে যায়, তখন মন ভরে খেয়ানত করে। এক দুই টাকায় যখন নিয়্যত খারাপ হয়ে যায় তখন চিন্তা করে যে, মুহতামিম বা অধ্যক্ষ হতে পারলে তো হাজার হাজার টাকা হজম করা যাবে। সেখানে আর কে জিজ্ঞেস করবে? খরচ করব দুই টাকা। কিন্তু ভাউচার দেখাব দশ টাকা! তখন সে লক্ষ টাকায় হাত মারবে। আল্লাহর ভয় তো অন্তরে নেই। দ্বীনদারীও নেই। দিয়ানতদারীও নেই। এরপর আর ভয় কিসের? যা মনে চায় তাই করে। যত মন চায় ততই খরচ করে। কে আর জিজ্ঞেস করে? মনে হয় যেন আল্লাহকে মুখ দেখাতে হবে না।

কিন্তু মনে রাখবে এ জাতীয় ব্যক্তি খুব দ্রুত অপমানিত হয়। সে তো মনে করে আমাকে কে দেখছে? আমার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তো কেউ জানে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে অপমান করেই ছাড়েন। আর যার অভ্যাস খারাপ হয়ে যায়, পরবর্তীতে তার সংশোধন খুব মুশকিল হয়ে যায়। সে বড় হয়ে যাবে। পড়ালেখা করে ফারেগ হয়ে যাবে। কোনো মাদরাসার মুদাররিস বা মুহতামিম, নাযিম অথবা শাইখুল হাদীস পর্যন্ত হয়ে যাবে। কিন্তু তারপরও তার বদঅভ্যাস দূর হবে না।

১০২. চুরির অভ্যাস হয় কিভাবে? একজন চোর মৌলভী ছাহেবের ঘটনা

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : সাহারানপুরে এক ব্যক্তির অভ্যাস এমনই খারাপ হয়ে গিয়েছিল, যার সামান মনে চাইত জিজ্ঞেস করা ছাড়াই উঠিয়ে নিত। সামান্য জিনিস মনে করে উঠিয়ে নিত। ধীরে ধীরে তার অভ্যাস খারাপ হয়ে গেল। চুরি করতে থাকল, বড় হওয়া এবং মুদাররিস হওয়ার পরও তার এ বদঅভ্যাস ছুটেনি। মাদরাসায় পড়াত কিন্তু চুরি করত। শেষ পর্যন্ত কয়দিন আর পর্দা পড়ে থাকে? একবার কোন এক সফরে গিয়েছিল। জনৈক ব্যক্তির এটাচীতে হাত মারল। অনুসন্ধানের পর যখন জানা গেল, তখন তাকে পাকড়াও করা হল। নির্মমভাবে জুতা মারা হল। অতঃপর থানায় নিয়ে যাওয়া হল। সেখানেও তার খবর নেওয়া হল। ভীষণ বদনাম হল। এমন লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়েছে যে, মুখ দেখানোর যোগ্য থাকেনি। পরিশেষে যেখানে থাকত এবং পড়াত, সেখানে আর ফিরে যায়নি যে, কোন্ মুখ নিয়ে যাবে? সেখান থেকেই পাকিস্তান পলায়ন করেছে।

এ জাতীয় মানুষদের এ অবস্থাই হয়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এমন জঘন্য অভ্যাস ও চরম অপমান থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

১০৩. এক চোরের কারণে পুরো জামাআতের বদনাম হয়

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : মাদরাসায় চুরি করে একজন মানুষ। কিন্তু বদনাম হয় পুরো মাদরাসার। এমনকি এমন এমন মানুষেরও বদনাম হয় যাঁদের সামনে স্বর্ণ-রৌপ্য পড়ে থাকলেও নজর উঠিয়ে দেখবে না। তো যার কারণে পুরো জামাআত বা মাদরাসার বদনাম হল এমন ব্যক্তি কি অপদস্থ ও অপমানিত হবে না? অবশ্যই হবে। এরা তো মাদরাসায় থেকেও খেয়ানতই করে। কেননা মাদরাসায় যে পয়সা আসে সেটা হল পড়ুয়া

ছাত্রদের জন্য। পক্ষান্তরে এ তো হল চোর। এর জন্য মাদরাসার খানা খাওয়া, মাদরাসার কিতাব নেয়া, মাদরাসার কামরায় থাকা, মাদরাসার জিনিস ব্যবহার করা সব হারাম।

তো এমন ব্যক্তি যে এত বড় গুনাহে লিপ্ত হল। আল্লাহ পাক কি তাকে অপদস্থ করবেন না? অবশ্যই করবেন।

যদি কেউ ভুলে কারো চপ্পল উঠিয়ে নেয়, তাহলে তার উচিত ঠিক সেই স্থানেই চপ্পল রেখে দেওয়া।

ভুল মানুষের হতেই পারে । নফসের প্ররোচনা বা শয়তানের ধোঁকায় কোনো গুনাহ হয়ে গেলে অনতিবিলম্বে তাওবা করবে। আর চপ্পল এনে চুপে চুপে রেখে দিবে। নতুবা কত বড় বদনামের কথা যে, মাত্র দশ টাকার জন্য পুরো জামাআতের বদনাম করল।

এরজন্য সবাই বদদু'আ করো। যদি সে চপ্পল এনে না রাখে, তাহলে আল্লাহ তাআলা যেন তাকে শাস্তি দেন। যে হাতের দ্বারা সে চপ্পল উঠিয়েছিল সেটা যেন অবশ হয়ে যায়। তার যেন কুষ্ঠ রোগ হয়। এই মাদরাসাতেই হয়। এরা এমন এমন কাজ করে যদ্দরুন সীমাহীন বদনাম ও মারাত্মক পেরেশানী উঠাতে হয়। সবাই যার যার কামরায় গিয়ে এ কথাগুলো বলে দিবে।

১০৪. চুরি করার দুঃসাহস ঐ ব্যক্তিই করতে পারে যার অন্তরে আল্লাহর ভয় এবং বিশ্বাস নেই

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : ইলমের দ্বারা উদ্দেশ্য হল আমল। ইলম হল মাধ্যম। আসল জিনিস তো হল আমলই। ইলম তো আমরা এ জন্য শিখি যাতে শয়তান আমাদেরকে ভুল পথে নিয়ে না যায়। কুরআন ও হাদীস যেহেতু আরবী ভাষায়। এগুলো বোঝার জন্য এইসব শাস্ত্র তথা নাহু-সরফ পড়া হয়। নতুবা সব কিছুর উদ্দেশ্য হল আমল আর আমল। যদি এটা না থাকে, তাহলে কিছুই নেই। এমন ইলমের দ্বারা কী লাভ যার উপরে আমল করা হয় না? অথচ তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ তালিবে ইলমের আকৃতি ধারণ করে চুরি করে। চুরি করার দুঃসাহস তো ঐ ব্যক্তিই করতে পারে যার মহান আল্লাহর উপর ভরসা নেই। আল্লাহ পাককে মুখ দেখানোর বিশ্বাস নেই। যদি আল্লাহর ভয় মনের মধ্যে বদ্ধমূল থাকে, তাহলে তার দ্বারা তো গুনাহ হতেই পারে না।

পুলিশ বা সৈনিকের সামনে কেউ অপরাধ করে? আমি তোমাদের সামনে বসা আছি। তোমরা কি আমার সামনে উল্টো পাল্টা করবে? ঠিক তদ্রূপ যার মধ্যে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁকে মুখ দেখানো এবং উত্তর দেওয়ার বিশ্বাস নেই, যার ঈমান পরিপূর্ণ নয়, এমন ব্যক্তিই চুরি করতে পারে। কেমন যেন সে আল্লাহ পাকের এ সিফাত বা গুণাবলী সম্পর্কে জানেই না। নতুবা যদি তার মধ্যে এই আকীদা ও অনুভূতি থাকত যে, আল্লাহ পাক আমাকে দেখছেন, তাহলে সে কখনো এমন কর্ম করত না।

এজন্যই হাদীস শরীফে এসেছে :

لَا يَزْنِي الزَّانِيْ حِيْنَ يَزْنِيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

অর্থাৎ "ব্যভিচারকারী ব্যক্তি ব্যভিচারের সময় ঈমানদার থাকে না। আর চোর চুরি করার সময় ঈমানদার থাকে না।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

অনুরূপভাবে মদ্যপানকারী মদ্যপানের সময় ঈমানদার থাকে না।

এসব কথা হাদীস শরীফে এসেছে। এখানে তো হাতে গোনা কয়েকটা গুনাহের কথা বলা হল মাত্র। নতুবা প্রতিটি গুনাহেরই একই অবস্থা। কেননা গুনাহের অর্থই হল আল্লাহর অবাধ্যতা। আর আল্লাহর অবাধ্যতা প্রত্যেক গুনাহের মধ্যেই আছে। যদি মহান আল্লাহর بصير তথা সবকিছু দর্শনকারী এই গুণের কথাটি কারো মনের মধ্যে থাকে, তাহলে তাঁর নাফরমানী হতেই পারে না।

এ কারণেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে : অনেক ঈমানদার ব্যক্তি এমন আছে যারা শেষ বয়সে এমন কাজ করে ফেলে যদ্দরুন তার খাতামা (সমাপ্তি) ঈমানের উপর হয় না বরং কুফরের উপর হয়। সামান্য পয়সার লোভে তারা ঈমানকে খুঁইয়ে বসে। ঈমানের কি এতটুকু মূল্যও নেই? আর যত দামী জিনিসই হোক না কেন, আর সারা দুনিয়া থেকে মূল্যবান হোক না কেন, যদি সেটার জন্য ঈমান হারাতে হয়, তাহলে সেটা নিয়ে আমরা কী করব?

মানুষ এসব ব্যাপারকে সাধারণ মনে করে, অথচ এগুলো ক্ষেত্রবিশেষে মানুষের ঈমানকে পর্যন্ত নষ্ট করে ফেলে।

১০৫. মাওলানা মুযাফফার হুসাইন ছাহেব রহ.-এর ঘটনা

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : হযরত মাওলানা মুযাফফার হুসাইন কান্ধলভী রহ. ফজরের পূর্বে সফর করতেন। সাথে কাপড় ইত্যাদি রাখার

জন্য একটি গাট্টিও থাকত। আর একটা লাঠিও থাকত। ঐ সময় ব্যাগের প্রচলন ছিল না। খুব সাদাসিধে জীবন ছিল। এখন তো ব্যাগ বরং এটাচী পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। পূর্বের যুগে এ সব জিনিস ছিল না। সিন্দুকের মধ্যেই মাল সামানা সবকিছু থাকত।

হযরত মাওলানা মুযাফফার হুসাইন ছাহেব রহ. একবার নিজ অভ্যাস অনুযায়ী ফজরের পূর্বে রওয়ানা হলেন। গাট্টিও সাথে ছিল। কান্ধলা থেকে নানূতা পর্যন্ত পদব্রজে সফর করতেন। রাস্তায় এক গ্রামের পাশ দিয়ে গেলেন। ঘটনাক্রমে ঐ গ্রামে রাত্রিবেলা চুরি হয়েছিল। লোকজন চোরের সন্ধানে এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করছিল। লোকজন দেখল যে, একজন হুযূর গাট্টি নিয়ে যাচ্ছে, তাকেই পাকড়াও করল। মাওলানা বললেন : আমি চোর নই। আমি তো মুসাফির মানুষ। কান্ধলা থেকে নানূতা যাচ্ছি। লোকেরা মানলা না, বরং তাঁকে টেনে হেঁচড়ে পার্শ্ববর্তী থানা ঝিনঝানায় নিয়ে গেল। থানাদার হযরতকে চিনতেন এবং হযরতের ভক্ত ছিলেন। তিনি দূর থেকে দেখে ঘাবড়ে গেলেন আর ভাবতে থাকলেন যে, হচ্ছেটা কি? সেখানে পৌঁছার পর থানাদার এই সব লোককে গ্রেফতার এর নির্দেশ দিয়ে দিল যে, হযরত মাওলানার সঙ্গে এত বড় গোস্তাখী! থানাদার হযরতকে ভালোভাবেই চিনতেন। আর অন্য মানুষেরা নামে জানত যে, কান্ধলায় মুযাফফার হুসাইন নামে একজন বুযুর্গ থাকেন। কিন্তু হযরতের আকৃতি সম্পর্কে তাদের জানা ছিল না। এ জন্য তারা এ আচরণ করেছে। আর হযরত মাওলানাও বলেননি যে, আমি অমুক। বরং নিজেকে লুকিয়েছেন।

থানাদার সাহেব যখন গ্রেফতারীর নির্দেশ দিয়েছেন, তখন তাঁকে লক্ষ্য করে হযরত বললেন, শুনুন, থানাদার সাহেব! আমার ও আপনার মধ্যে বন্ধুত্ব ঐ সময় পর্যন্তই বহাল থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এদেরকে কিছু না বলবেন এবং এদের সবাইকে ছেড়ে না দিবেন। নতুবা আজ থেকে বন্ধুত্ব শেষ।

থানাদার বললেন : "যখন হযরতই নিষেধ করছেন তখন আমি আর কী বলব? নতুবা একেকজনকে ধরে আমি বেত লাগাতাম"।

১০৬. মাদরাসা থেকে জনৈক ছাত্রকে বহিষ্কার

মাদরাসার এক ছাত্র খুব দুষ্ট ছিল। গ্রামের দুষ্ট ছেলেদের সাথে তার খারাপ সম্পর্ক ছিল। ছেলেটির নামে অনেক অনেক অভিযোগ এসেছিল।

তাকে অনেক বোঝানো হয়েছে। সংশোধনের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সে স্বীয় কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করেনি। আজেবাজে ছেলেদের সাথে রাত্রে ঘোরাফেরা করত। আশংকা ছিল হয়ত রাত্রে ঐ সব বাজে ছেলের সাথে পালিয়ে যাবে। এ জন্য হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. তাকে একটি কামরায় পৃথকভাবে বন্দী করে রাখলেন। বাইরে তালা দিয়ে দিলেন। আর দুজন নির্ভরযোগ্য ছাত্র পাহারাদারের মত নির্ধারণ করে দিলেন। সময়মতো একে খানা দেওয়া হত। পেশাব-পায়খানা থেকে ফারেগ হওয়ার ব্যাপারে নেগরানী করা হত। সকালে নাস্তা করিয়ে মাদরাসার একজন মুদাররিসের সাথে তাকে বাসায় রওয়ানা করিয়ে দেয়া হল। আর ছেলেটির আব্বা-আম্মার নিকট তার বহিষ্কারের কারণ সম্বলিত একটি চিরকুট লিখে দিলেন।

১০৭. কুকুরের উপর যুলুমের অপরাধে ছাত্রদেরকে বহিষ্কারের হুমকী

হাতুরা মাদরাসাটি গ্রামে অবস্থিত একটি মাদরাসা। কখনো কখনো মাদরাসার বেষ্টনীর মধ্যে কুকুরও চলে আসে। একবার কয়েকটা দুষ্ট ছেলে দুষ্টুমী করে একটি কুকুরকে বন্দী করে খুব মারধর করে। মারতে মারতে ওর পা ভেঙ্গে দিয়েছে। হযরত এ সংবাদ জানতে পেরে ফজরের নামাযের পর সকল ছাত্রদেরকে একত্রিত করে তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন : তোমাদের কি একটু লজ্জা লাগে না? আল্লাহ পাকের মাখলূককে কষ্ট দাও! তাদেরকে প্রহার কর আর পেরেশান কর। তোমরা কুকুরটির পা পর্যন্ত ভেঙ্গে দিয়েছ। এটা জুলুম নয় তো কি? যদি কেউ তোমাদের হাত পা ভেঙ্গে দেয় তাহলে তোমাদের অবস্থা কেমন হবে? মাদরাসায় কি তোমরা এ জন্যই এসেছ? আর এটাই কি তোমাদের কাজ? যে সব ছাত্র এ জঘন্য কাজ করেছে, তাদের তালিকা আমার কাছে এসে যাওয়া উচিত। এদের খানা বন্ধ করা হল। এবং এদেরকে বহিষ্কার করে দেওয়া হবে।

১০৮. স্বীয় মেহনত ও প্রচেষ্টা ব্যতীত কিছুই হাসিল হয় না

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজে চেষ্টা না করে, কোনো কাজে তার উন্নতি হয় না। উদাহরণস্বরূপ : একজন মানুষ ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত। কেউ যদি তাকে সাহায্য করতে চায়, তাকে খানা খাওয়াতে চায়, তাহলে কীভাবে তাকে সহযোগিতা করতে পারে? অথবা মনে করুন একজন বস্ত্রহীন মানুষ, তার নিকট পরিধান করার মতো কাপড় নেই।

কেউ তাকে কাপড় পরিধান করাতে চায়, তাহলে তাকে সহযোগিতার সূরত কী হতে পারে? সাহায্যকারী তো শুধু এটাই করতে পারে যে, খানা এনে তার সামনে রেখে দিবে? কাপড় তাকে দিয়ে দিবে। ব্যস এতটুকুই তো করতে পারে। এরপর তো খানা তাকেই খেতে হবে। কিছু কাজ তো তাকেও করতে হবে, তবেই তার পেট ভরতে পারে। অথবা মনে করুন ডাক্তার রোগীর চিকিৎসা করতে চায়। তো ডাক্তার এ ক্ষেত্রে এতটুকুই করতে পারে যে, ব্যবস্থাপত্র লিখে দিয়ে দিবে অথবা ঔষধ বের করে দিবে। আরো বেশি কল্যাণকামী হলে নিজের ফি এবং ঔষধের মূল্য নিবে না। ব্যস এতটুকুই তো করতে পারে। নাকি ঔষধও নিজ হাতে রোগীকে খাইয়ে দিবে? কিংবা কেউ রাস্তা ভুলে গেছে। অন্য কেউ তাকে তো শুধু রাস্তাই দেখিয়ে দিতে পারে। সামনে অগ্রসর হওয়ার কাজ তো তাকেই করতে হবে। নাকি তার পরিবর্তে সে নিজেই চলবে? অন্য কেউ খানা খাওয়ার দ্বারা আপনার পেট ভরবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজে না খায়। অন্য ব্যক্তি চলার দ্বারা সে মানযিলে মাকসূদ বা অভীষ্ট লক্ষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজে না চলবে।

যেমনিভাবে দুনিয়ার ব্যাপারে ফিকির করা হয়, অনুরূপভাবে দ্বীন এবং আখেরাতের ব্যাপারেও তো চিন্তা করা উচিত। আখেরাতের যে সব ব্যাপার আছে সেগুলো অবলম্বনের দ্বারাই আখেরাত বনবে। জান্নাতে যাওয়ার যত আসবাব আছে ঐ আসবাব যদি অবলম্বন করা হয়, তবেই তো জান্নাত মিলবে। শুধু অন্য করার দ্বারা কিছু হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত নিজে কিছু না করবে।

১০৯. মুজাহাদা ও রিয়াযত ব্যতীত ভালো কাজের যোগ্যতা সৃষ্টি হয় না

বুখারী শরীফের দরস প্রদানের সময় হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুরু যুগে ওয়াহী আসার পূর্বে নির্জনতায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। ঐ সময় নির্জনতা তাঁর খুব প্রিয় ছিল। হেরা গুহায় গিয়ে তিনি ইবাদত-রিয়াযত ও মুজাহাদা করতেন।

এর দ্বারা বোঝা গেল যে, গুণ অর্জনের জন্য প্রথমে নিজের মধ্যে যোগ্যতা সৃষ্টি করতে হয়। যখন যোগ্যতা সৃষ্টি হবে, তখনই গুণ অর্জিত হবে। সুফীয়ায়ে কেরামও এ জন্যই মুজাহাদা করান। দেখুন ওয়াহীর অবতরণ তো হয়েছে পরে। নির্জনতা অবলম্বনের মাধ্যমে মুজাহাদা হয়েছে পূর্বে।

এর দ্বারা বোঝা গেল যে, ওয়াহীয়ে ইলাহী এবং কুরআনে পাকের নূর ও বরকতসমূহ ঐ সময়েই হাসিল হবে যখন নির্জনতায় ইবাদত ও রিয়াযতের মাধ্যমে প্রথমে নিজের মধ্যে যোগ্যতা সৃষ্টি হবে। ঐ সময়েই তার আনওয়ার ও বারাকাতের আছর হবে। নতুবা মূর্খই থাকবে। শুধু পড়ালেখার দ্বারা কিছু হয় না। বর্তমানে এ সব জিনিসের ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া হয় না।

১১০. এমন ইবাদত ইবাদতই নয় যার মধ্যে ঘরওয়ালাদের হক নষ্ট হয়

এ ব্যাপারেই হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা গুহায় পাথেয় নিয়ে যেতেন। অনেক সময় একটানা কয়েক দিন হেরা গুহায় অবস্থান করতেন। পাথেয় শেষ হয়ে গেলে পুনরায় ঘরে তাশরীফ আনতেন। এবং পাথেয় নিয়ে হযরত খাদীজা রাযি.-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করতেন। অতঃপর হেরা গুহায় ফিরে যেতেন। অনুমতি ছাড়া যেতেন না। এর দ্বারা বোঝা গেল যে, ঘরের মানুষের হক হল তাদের কাছে থাকা হবে। রাতে স্ত্রীর কাছে থাকা তার হক। তার হক নষ্ট করে ইবাদত করা জায়েয নেই। এমন ইবাদত ইবাদত নয়, যার মধ্যে স্ত্রীর হক নষ্ট করা হয়। এ জন্য যেখানে স্ত্রীর হক আছে। সেখানে তার থেকে অনুমতি নেয়া জরুরী।

১১১. মুজাহাদার মর্ম

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : মুজাহাদার মর্ম এটা নয় যে, মানুষ পানাহার এবং নিজ নফসের আকর্ষণীয় বিষয়গুলো ছেড়ে দিবে। নিজেকে মুসীবত এবং নফসকে কষ্টের মধ্যে ফেলবে। এ জিনিসগুলো শরীয়তের দৃষ্টিকোণেও পসন্দনীয় নয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরাগুহায় যেতেন। কিন্তু সঙ্গে পাথেয় অর্থাৎ খানা পিনাও নিয়ে যেতেন।

এর দ্বারা বোঝা গেল যে, পানাহার করা এবং এর ইন্তিযাম রাখা তাওয়াক্কুল ও মুজাহাদার বিপরীত কোনো জিনিস নয়।

অবশ্যই রিয়াযত ও মুজাহাদায় বিলাসিতাকে ছেড়ে দেয়া হয়।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

إِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ فَإِنَّ عِبَادَ اللهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ

অর্থাৎ “তোমরা বিলাসিতা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা আল্লাহর প্রকৃত বান্দারা বিলাসী হয় না।” (আল আরবাউন ফিত তাসাওউফ, পৃষ্ঠা : ১৩)

বিলাসিতার অর্থ হল সব সময় ভালো পানাহারের ফিকিরে থাকা। এটা ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা নেই। আল্লাহ পাকের ব্যাপারেও গাফেল হয়ে যাওয়া। এটা অবশ্যই মুজাহাদা পরিপন্থী। হাদীসে পাকে এ ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে।

১১২. প্রথমে যে মুজাহাদা করে সে মুজাহাদা করায়

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : প্রথমে মানুষ নিজেকে পেষণ করে। অতঃপর অন্যদেরকে পেষণ করে। অর্থাৎ প্রথমে নিজে মুজাহাদা করে। অতঃপর অন্যদের মাধ্যমে মুজাহাদা করায়। এর মাধ্যমে বাতিল চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। দ্বীনের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু বর্তমানে কেউ নিজেকে পিষে ফেলতে রাযী নয়। কেন? কারণ অন্তর অহংকারে পরিপূর্ণ। সামান্য মুজাহাদাও সহ্য হয় না। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠে : আমাকে অপমান করা হয়েছে। অপদস্থ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি মেহনত-মুজাহাদা করতেই রাযী নয় তার উন্নতি হবে কীভাবে?

১১৩. নিজেকে লুকিয়ে রাখার জীবনই ভালো

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : মেহমানদের আধিক্যের দরুন কোনো কাজ করতে পারি না। যখনই লিখতে বসি কেউ না কেউ এসে যায়। যখন থেকে এ বাস চলা আরম্ভ হয়েছে পেরেশানী আরো বেড়ে গেছে। যে যুগে বাস চলত না তখন মানুষ অনেক কম আসত। হযরত মুফতী মাহমূদ ছাহেব রহ. নয় মাইল (একটি স্থানের নাম) থেকে হাতুরা পর্যন্ত কয়েকবার পদব্রজে তাশরীফ এনেছেন। হযরতের নিকট বারবার আরয করতাম যে, "হযরত! দুআ করুন যেন পাকা সড়ক হয়ে যায় এবং হাতুরা পর্যন্ত বাস আসতে পারে"। মুফতী ছাহেব রহ. বলতেন, "আমি কখনো দুআ করব না। বাস চলবে তো ভীড় বাড়বে। তখন পেরেশান হয়ে যাবে।" তখন তো বুঝে আসেনি। কিন্তু এখন বুঝে আসছে যে, যখন থেকে বাস চলা আরম্ভ হয়েছে। তখন থেকে আমি 'বে বাস' তথা অসহায় হয়ে পড়েছি। কোনো কাজই করতে পারি না। প্রথমে মানুষ হত অল্প। অল্প সময়ের মধ্যে সবার কাজ করে দিয়েছি। এরপর নিজের কাজে লেগে গিয়েছি। আর এখন তো শুধু ভীড় আর ভীড়। মানুষ যখন নিজেকে লুকিয়ে রাখে তখনই আসল কাজ হয়। প্রসিদ্ধির পর খুব একটা কাজ হয় না।

১১৪. হযরতের পীর ও মুরশিদ হযরত নাযেম ছাহেব রহ. -এর অবস্থা

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : আমার শাইখ ও মুরশিদ হযরত নাযেম ছাহেব অর্থাৎ হযরত মাওলানা আসআদুল্লাহ ছাহেব রহ. এর স্বভাব ছিল এই যে, প্রত্যেক আগন্তুকের সাথে তার অবস্থা ও অভিরুচি অনুযায়ী কথাবার্তা বলতেন। কৃষক আসলে ক্ষেত ও কৃষি বিষয়ক কথাবার্তা বলতেন। কবি আসলে কাব্যচর্চা বিষয়ক আলাপচারিতায় লিপ্ত হতেন। ইংরেজী শিক্ষিত কেউ আসলে তার সাথে ইংরেজীতে কথাবার্তা বলতেন। এমন মনে হত যে, বি, এ অথা এম, এ তে পারদর্শী কোনো ব্যক্তি কথাবার্তা বলছে। অত্যন্ত প্রাঞ্জল ইংরেজী অনর্গল বলতে পারতেন। কিন্তু কখনো লিখতেন না। ইংরেজীকে তিনি ঘৃণা করতেন। কথা বলতে সক্ষম ছিলেন। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে সেটা ব্যবহার করতেন না।

১১৫. শাহ আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ.-এর অবস্থা

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : মাওলানা হাবীবুর রহমান ছাহেব কান্ধলভী রহ. হযরত শাহ আব্দুল কাদের ছাহেব রায়পুরী রহ. এর মুরীদ ছিলেন। খুব বেশি হযরতের খেদমতে উপস্থিত হতেন। কাঁচা ঘরে থাকতেন। অনেক চেষ্টার পর পাকা ঘর বানিয়েছেন। এবং হযরত শাহ আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ.কে সংবাদ দিয়েছেন যে, বাড়ী হয়ে গেছে। হযরত রায়পুরী রহ. বললেন : "বাড়ী পাকা হয়েছে। বড় খুশীর কথা, শান্তির স্থান, আল্লাহ পাকের বড় নেয়ামত। কিন্তু আমার তো এটাই পসন্দ যে, ঘর কাঁচা হত, বৃষ্টি হত তো কখনো চৌকী এদিকে হেলত কখনো ঐ দিকে হেলত।" (এ অবস্থার উপর মহান আল্লাহর দয়া আসত। এটা হযরত রায়পুরী রহ. এর প্রকৃতিগত মেযাজ ছিল।)

১১৬. দিল থেকে যিকির জারী হওয়ার অর্থ

হযরতওয়ালা বান্ধাভী রহ. বলেন : পাবন্দীর সাথে যিকির করতে করতে কখনো এই অবস্থা হয়ে যায় যে, তার কলব থেকে যিকির জারী হয়ে যায়। তার কলব সর্বদা আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ থাকে। কখনো আল্লাহ থেকে গাফেল থাকে না। দিলে দিলে সে সব সময় আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে। সে যখন কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হাত পা চোখ কান

যবান নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু দিলের তাওয়াজ্জুহ মহান আল্লাহর দিকেই থাকে। বেশি বেশি যিকিরের বরকতে আল্লাহ্ পাক এই মাকাম নসীব করেন।

১১৭. এক বুযুর্গের ঘটনা

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : কিতাবের মধ্যে একজন বুযুর্গের ঘটনা লিখেছে যে, তিনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। কয়েকজন মুরীদ এবং খাদেমও তাঁর সাথে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ করে এক দোকানের পাশে গিয়ে থেমে গেলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দোকানদারকে দেখতে লাগলেন। দোকানদার নিজ কাজে ব্যস্ত ছিল। ঐ বুযুর্গ দোকানদারের সাথে কোনো লেনদেন করেননি। কথাবার্তাও বলেননি। কিছুক্ষণ বিলম্ব করে সামনে চলে গেলেন। কোনো কোনো খাদেম এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। প্রতিউত্তরে ঐ বুযুর্গ বললেন : আমি এই দোকানদারকে দেখে হতবাক হয়ে গেছি যে, এ মানুষটা এত ব্যস্ত। তার হাত চলছে, পা চলছে, যবান চলছে। কিন্তু একদসত্ত্বেও তাঁর কলব একটা মুহূর্তের জন্যও মহান আল্লাহ থেকে গাফেল হয়নি। প্রতিটি মুহূর্ত ও প্রতিটা ক্ষণ আল্লাহ পাকের দিকেই মুতাওয়াজ্জিহ ছিল। মহান আল্লাহর মর্জির বিপরীত কোনো কাজ করেনি। আল্লাহ পাকের এমন বান্দাও গত হয়েছেন।

১১৮. নামাযের মধ্যে এখতিয়ার বহির্ভূত খেয়াল আসা খুশুখুযূর বিপরীত নয়। ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণার চিকিৎসা

একজন বৃদ্ধ মানুষ হযরতের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল যে, হযরত! নামাযের মধ্যে খারাপ চিন্তা ও কুমন্ত্রণা খুব বেশি আসে। এ কারণে খুব পেরেশানীতে থাকি। নামাযে মন লাগে না। হযরত তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন : এর থেকে কেউ পরিত্রাণ পায়নি। নামাযের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের খেয়াল সবারই আসে। আর এটা খুশুর বিপরীত কোনো জিনিস নয়। কলবের উদাহরণ তো হল সড়কের ন্যায়। এর মধ্যে গাধাও চলে। মানুষও চলে। কুকুর বিড়াল গরু তথা সমস্ত প্রাণী চলে। এখন যদি কেউ ঐ প্রাণীদের সাথে একথা বলে তর্কে জড়ায় যে, তোমরা এখান দিয়ে যাচ্ছ কেন? তাহলে সেটা কি শোভনীয় হবে? কষ্মিনকালেও নয়। আরে সে তো নিজ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। তুমি তোমার রাস্তায় যাও। ওদের সঙ্গে বিবাদে জড়াচ্ছ কেন?

ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণার অবস্থাও অনুরূপ। এর মধ্যে নানা ধরনের খেয়াল আসবে। আসতে দাও। তুমি তোমার কাজে ব্যস্ত থাক। এ সব

কুমন্ত্রণার পেছনে পড় না। যতই ওগুলোর পেছনে পড়বে। ততই পেরেশান হবে।

১১৯. নামাযের মধ্যে খুশুর হাকীকত এবং সেটা অর্জন করার পদ্ধতি

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : নামাযের মধ্যে আপনা আপনি যে খেয়াল চলে আসে সেটার পেছনে পড়ার দরকার নেই। সেটা প্রতিহত করার জন্য চেষ্টা চালানোরও দরকার নেই। যত প্রতিহত করবে তত বাড়বে। বরং নামাযের মধ্যে যা কিছু পড়া হচ্ছে, সেগুলোর শব্দ, অর্থ ও মর্মের ব্যাপারে চিন্তা করবে। অন্যদিক থেকে মনোসংযোগ আপনাআপনিই হটে যাবে। এরই নাম হল "খুশু"। খুশুর অর্থ এই নয় যে, নামাযের মধ্যে কোনো কিছুর খেয়ালই আসবে না। নামাযের মধ্যে 'ইসতেগরাকী কাইফিয়ত" বা আত্মহারা অবস্থা হওয়ার নাম "খুশু" নয় যে, দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে কোনো কিছুরই খবর থাকবে না। যদিও আল্লাহর কোনো কোনো বান্দা এ পর্যায়েও পৌঁছে থাকেন। কিন্তু এটা ঐ খুশু নয় যা কাম্য। খুশুর জন্য তো এতটুকুই যথেষ্ট যে, নামাযের মধ্যে যা কিছু পড়া হচ্ছে, তার শব্দ ও অর্থের দিকে ধ্যান জমিয়ে রাখবে। কখনো মনোযোগ হটে গেলে পুনরায় শব্দ ও অর্থে চিন্তা করতে থাকবে। মাঝখানে অমনোযোগ ও গাফলত এর যে বিরতি হবে তাতে কোনো সমস্যা নেই। এটা তো ইখতিয়ার বহির্ভূত জিনিস। দুই মনোযোগের মাঝে যে গাফলত হবে সেটাও মনোযোগের মধ্যেই গণ্য হবে। ব্যস, শর্ত এটাই যে, নিজের পক্ষ থেকে এদিক সেদিকের কোনো কল্পনা করবে না। বরং কুরআনে কারীমের শব্দ ও অর্থের ব্যাপারে চিন্তা করবে। কখনো মন সরে গেলে পুনরায় মনকে নামাযের মধ্যে উপস্থিত করবে। ব্যস এটার নামই খুশু। বেশি পেরেশান হওয়ার প্রয়োজন নেই। নতুবা খেয়ালাত তো সকলেরই আসে। এর থেকে কেউ মুক্ত নয়।

১২০. অহংকার হল সর্বরোগের মূল এবং এর চিকিৎসা

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : অহংকার এমনই একটি মারাত্মক ব্যাধি যে, প্রত্যেক ব্যাধির চিকিৎসা আছে। কিন্তু অহংকারীর চিকিৎসা নেই। এর অর্থ এই নয় যে, অহংকারের চিকিৎসা নেই। চিকিৎসা তো অবশ্যই আছে। কিন্তু অহংকারী ব্যক্তি নিজের চিকিৎসা করে না। কেননা চিকিৎসা তো সেই করে যে নিজেকে রোগী মনে করে। পক্ষান্তরে অহংকারী ব্যক্তি তো

নিজেকে রোগীই মনে করে না। সে তো নিজেকে ভালো এবং সুস্থ মনে করে। তাহলে আর চিকিৎসা করাবে কেন? কিন্তু যদি বাস্তবেই কেউ স্বীয় সংশোধন কামনা করে, তাহলে আজো তার দুয়ার উন্মুক্ত। সেটার পদ্ধতি অবলম্বন করা হোক। কোনো আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের সাথে ইসলাহী সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। শাইখ বা মুরশিদ যা কিছু বলবেন সেটাকে নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করবে। নফস এত সহজে নিয়ন্ত্রণে আসে না। যখন নফসের বিপরীত কোনো কাজ হবে। তাকে অপদস্থ করা হবে, তখনই নফস চিন্ চিন্ করতে থাকবে। প্রথম দিকে কয়েক দিন মুজাহাদা করতে হয়। কিন্তু আস্তে আস্তে যখন নফসকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে, তখন অভ্যাস হয়ে যাবে। কিন্তু তারপরও খুব সতর্ক থাকতে হবে। সুযোগ পেলেই সে ছোবল মারবে। শয়তানী কর্মকান্ড করবে। খাজা আযীযুল হাসান মাজযূব রহ. এর কবিতা

دل نفس کا اژدہا ابھی مرا نہیں + ادہر غافل ہوا نہیں ادہر اسنے ڈسا نہیں

অর্থাৎ, হে দিল! নফসের অজগর এখনো মরেনি। যখনই তুমি গাফেল হবে, তখনই সে দংশন করবে।

১২১. কৃতিত্ব তো এটাই যে, গোস্বা আসার পরও ধৈর্যধারণ করবে ও চুপ থাকবে

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কেউ কেউ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এই বলে আপত্তি উত্থাপন করেছিল যে, গনীমতের যে মাল বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে যা বণ্টন করা হয়েছে, এতে ইনসাফ বা ন্যায় বিচার করা হয়নি!! এ কথা শুনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব কষ্ট পেলেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আল্লাহ তাআলা মূসা আ.-এর উপর রহম করুন। তাঁকে তো তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে এর চেয়েও বেশি কষ্ট দেয়া হয়েছে।

আপত্তি থেকে কেউ বাঁচতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। অথচ তাঁর উপরও আপত্তি তোলা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের কোনো সদস্যের উপর যদি আপত্তি তোলা হয় অথবা শক্ত কথা বলা হয়, তাহলে তাঁকেও সেটাই করতে হবে যেটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মূসা আ.-এর ঘটনা উল্লেখ করে আমাদেরকে এই সবকই শিখিয়েছেন যে, যখন তোমাদের উপর এমন হালত আসবে তখন তোমাদেরও করণীয় এটাই। ঐ সব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। তাঁরা কীভাবে ধৈর্য ধারণ করেছেন। তোমরাও সেভাবে ধৈর্যধারণ করো। প্রতিশোধ নিও না। নিজ জযবাকে উস্কে দিও না।

স্বাভাবিকভাবেই গোস্বা অবশ্যই আসবে। কষ্টও হবে। তখনই ধৈর্য ধরতে হবে। এর উপরই তো পুরস্কারের ওয়াদা করা হয়েছে। এর দ্বারাই তো উন্নতি হয়। নতুবা কিসের উপর সওয়াব দেওয়া হবে? যদি গোস্বাই না আসে তাহলে কোন্ সে কৃতিত্ব? কৃতিত্ব তো এটাই যে, গোস্বা আসবে কিন্তু ধৈর্য ধরবে। যদি কোনো নপুংসক বলে যে, আমি কুদৃষ্টি করিনা, ব্যভিচার করি না। তাহলে এর মধ্যে কী কৃতিত্ব? কৃতিত্ব তো তখনই হবে, যখন শক্তি ও চাহিদা থাকা সত্ত্বেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে।

ছোটদের কাজ হল আপত্তি করা। আর বড়দের কাজ হল করে দেখানো। অর্থাৎ ধৈর্য ধারণ করা এবং প্রতিশোধ না নেওয়া।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাওফীক নসীব করুন। আমীন।

১২২. নিসবত, ইজাযত ও খেলাফতের হাকীকত

ইলমে মানতিক তথা যুক্তিবিদ্যার প্রসিদ্ধ কিতাব "কুতবী"র সবক পড়ানোর সময় হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : "هُوَ" শব্দটি موضوع এবং محمول এর মাঝে যোগসূত্র স্থাপনকারী অর্থাৎ موضوع এবং محمول এর মাঝে ربط বা সংযোগ هُوَ শব্দের মাধ্যমেই হয়। এ কারণেই এ শব্দটাকেই এখন 'রাবেতা' (সংযোগ স্থাপনকারী-যোগাযোগ রক্ষাকারী) বলা হয়। এটাই হল تَسْمِيَةُ الدَّالِّ بِاِسْمِ الْمَدْلُوْلِ এর মর্ম। এই হল نسبت "নিসবত"-এর হাকীকত। যে ব্যক্তি কারো সঙ্গে থাকে, তার ঐ ব্যক্তির সাথে নিসবত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তার সাথে রাবেতা হয়ে যায়। তাঁর আখলাক ও অভ্যাসসমূহ এর মধ্যে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। যা কিছু শাইখের মধ্যে পাওয়া যেত, তা এখন মুরীদের মধ্যে পাওয়া যায়। এটাকেই নিসবত বলে যে, অমুকের অমুকের সাথে নিসবত আছে। বিশেষ সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ যে কাজ অমুক করতেন ঐ কাজই ইনিও করেন। আর এটার নামই خلافت "খেলাফত" অর্থাৎ যেই চরিত্র ও অভ্যাস শাইখের মধ্যে পাওয়া যেত, সেটা এখন এর মধ্যেও পাওয়া যাচ্ছে। তো এখন সে শাইখ হয়ে গেল। কিন্তু এই বাস্তবতা বর্তমানে কে দেখে? এখন তো বাজার গরম।

১২৩. নিজ ছোটদের সামনেও নিজ বড়দের খেদমত ও তাঁদের সম্মান করা চাই

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : হযরত শাহ ছাহেব রহ. উঁচু স্তরের বুযুর্গ ও শাইখ ছিলেন। তাঁর ভক্তবৃন্দের বিশাল হল্কা ছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও হযরত ক্বারী আব্দুর রহমান ছাহেব পানিপথী রহ. এর খেদমতে উপস্থিত হতেন এবং তাঁর মজলিসে গিয়ে বসতেন। তাঁর থেকে উপকৃত হতেন। স্বীয় ভক্তবৃন্দ ও শিষ্যদের সাথে থাকতে সামান্য সংকোচও অনুভব করতেন না। তাঁদের সামনে ছোট হয়ে থাকলে আমার শানের পরিপন্থী হবে। এর কোন খেয়ালও ছিল না।

সংকলকের বক্তব্য

অধম সংকলক আরয করছে যে, ছাহেবে মালফূযাত হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. এরও একই অবস্থা ছিল। বড়দের খেদমতে উপস্থিত হতেন। তাঁদের থেকে উপকৃত হতেন। নিজের ছোটরা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও নিজ বড়দের খেদমত করতেন। এতে সামান্য কোন লজ্জাও অনুভব করতেন না।

একবার নিজ উস্তায হযরত আকদাস মুফতী মাহমূদ হাসান ছাহেব গাঙ্গুহীর রহ. খেদমতে সাহারানপুর তাশরীফ নিয়ে গেলেন। আমি অধম ঐ সময় মাযাহেরুল উলূমের শিক্ষার্থী ছিলাম। হযরত আকদাস মুফতী মাহমূদ ছাহেব শুয়ে ছিলেন। আমি হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ.কে দেখলাম যে, ছাত্রদের সামনেই হযরত মুফতী ছাহেব রহ.-এর পা দাবিয়ে দিচ্ছেন।

এমনিভাবে তিনি হারদূঈ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব রহ. এর খেদমতে প্রায় সময় তাশরীফ নিয়ে যেতেন। এবং নিজ মুরীদ ও ছাত্রদের সামনেই হযরত আকদাস মাওলানা আবরারুল হক ছাহেব রহ.-এর পা দাবিয়ে দিতেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও আমাদের বড়দের আদব করার তাওফীক নসীব করুন। আমীন।

১২৪. জীবনী লেখার ব্যাপারে হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. -এর চিন্তাধারা

জীবনী লেখা বিষয়ক আলোচনা চলছিল। হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : জীবনী তো এ জন্য লেখা হয় যাতে পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ ঐ সব হালত ও ঘটনা পড়ে প্রভাবিত হয়। এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করে। আমিও

জীবনী লিখেছি। কিন্তু এর মধ্যে কিছু না কিছু বাড়াবাড়ি হয়েই যায়। এ জন্য সব ছেড়ে দিয়েছি। যার আমলের দ্বারা আল্লাহ তাআলা মানুষকে উপকার পৌছাবেন, সেটাকে আল্লাহ তাআলা কোন না কোনভাবে প্রকাশ করেই দিবেন। ইসলাহ বা সংশোধনের জন্য বুযুর্গানে দ্বীনের যে সব বাহ্যিক আমল ও হালত থাকে সেটাও কম নয়। বরং সেটাই যথেষ্ট। অভ্যন্তরীণ অবস্থা তো কারোটাই জানা যায় না।

১২৫. একটি দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা; আল্লাহ তাআলা যাকে ধ্বংস করতে চান তাকে নেক বান্দাদের পিছনে লাগিয়ে দেন

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : আল্লাহ তাআলা যাকে ধ্বংস করতে চান, তাকে নেক বান্দাদের পিছনে লাগিয়ে দেন। সে বুযুর্গানে দ্বীনের বিরোধিতা করে তাঁদেরকে পেরেশান করে। ফলশ্রুতিতে সে ধ্বংস হয়ে যায়।

বলা হয়ে থাকে, পিপীলিকার পাখা গজায় মরিবার তরে।

কিতাবের মধ্যে দারুণ দৃষ্টান্তমূলক একটি ঘটনা লিখা আছে। জনৈক বুযুর্গ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। ঐ রাস্তায় একজন প্রেমিক নিজ প্রেমিকাকে সাথে নিয়ে যাচ্ছিল। বর্ষা মৌসুম ছিল। কর্দমাক্ত রাস্তা ছিল। বুযুর্গ হাঁটছিলেন। হঠাৎ কাদার সামান্য ছিঁটা ঐ প্রেমিকার কাপড়ে লাগল। এ ব্যক্তি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বুযুর্গকে ধমক দেওয়া আরম্ভ করল। বুযুর্গ ওযরখাহী করে বললেন : আমি ইচ্ছাকৃতভাবে এমনটি করিনি, অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়ে গেছে। কিন্তু সেই তথাকথিত প্রেমিক এটা মানল না। বরং বুযুর্গকে একটি থাপ্পড় মারল এবং চলে গেল। বুযুর্গও চলে গেলেন। এ দুরাচার এখনো নিজ বাসায় পৌছতেও পারেনি। প্রেমিকাকে যে উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল ঐ উদ্দেশ্যও পূরণ করতে পারেনি। পৌছার পূর্বেই যে হাতের দ্বারা বুযুর্গকে মেরেছিল, ঐ হাতে প্রচণ্ড ব্যথা আরম্ভ হল। ব্যথার যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল। সোজা ডাক্তারের নিকট গেল। ডাক্তার হাত দেখে বললেন যে, ব্যথার কারণ আমার বুঝে আসছে না। ঔষধ দিলেন। কিন্তু উপকার হল না। ব্যথা বাড়তেই থাকল। অনেক ডাক্তার দেখাল। কিন্তু আরাম হল না। ডাক্তাররা বললেন : যদি এর হাত কাটা না হয় তাহলে পঁচে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। ফলশ্রুতিতে ডাক্তারদের পরামর্শে হাত কেটে দেয়া হল। কিন্তু এরপরও ব্যথা গেল না। হাতের আরো সামনের অংশও পঁচা আরম্ভ হল। ডাক্তারদের পরামর্শে আরো কিছু অংশ কেটে দেওয়া হল। আরো কয়েকজন নেককার ডাক্তারকে দেখাল।

তখন তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন যে, আচ্ছা তুমি এটা বল তো তোমার ব্যথার শুরু হল কীভাবে? তখন সে ঐ বুযুর্গের সাথে যা ঘটেছিল সেটার পুরো বৃত্তান্ত শুনাল। ডাক্তাররা বললেন : তুমি আগে কেন এটা বলনি? ঔষধের মধ্যে এর চিকিৎসা নেই। প্রথমেই বললে হাত কাটা যেত না। এর চিকিৎসা হল : ঐ বুযুর্গের নিকট গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা। তাঁর মাধ্যমে দুআ করানো। ফলে এই লোকটি ঐ বুযুর্গের খেদমতে উপস্থিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল। ঐ বুযুর্গ বললেন : "এখন তো ব্যাপারটা আমার হাত থেকে বের হয়ে গেছে। আমি কী করব? এটা তো বন্ধুদের ব্যাপার। তুমি তোমার বান্ধবীর সাহায্য করেছ। এজন্য আমাকে মেরেছ। আর আমার বন্ধু (আল্লাহ পাক) আমাকে সাহায্য করেছেন এবং তোমাকে তোমার অন্যায়ের শাস্তি দিয়েছেন। তোমার বন্ধু থাকলে আমারও বন্ধু আছে। আমি এ ক্ষেত্রে কিছুই করতে পারব না"।

এ লোকটি বিদায় নেওয়ার পর বুযুর্গ দুআ করলেন : 'ইয়া আল্লাহ! আমি তাকে মাফ করে দিলাম। আপনিও তাকে মাফ করে দিন।'

ফলশ্রুতিতে কিতাবে লেখেছে যে, তার হাত ভাল হয়ে গেছে।

দারুণ শিক্ষণীয় ঘটনা। এর থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। বর্তমানেও অনেকে আলেমদের সাথে বেআদবী করে। অথচ তাদের অনুভূতিও নেই! মাফ তো চায়ই না উল্টো সীনাজুরী করে।

এমন মানুষদের থেকে আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেফাজত করুন। আমীন।

১২৬. স্বপ্ন যার-তার কাছে বলা উচিত নয়

এক ব্যক্তি অনেক দূর থেকে তাবীয নেওয়ার জন্য হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. এর নিকট আগমন করে। লম্বা কথাবার্তা এবং তাবীয নেওয়ার পর বলতে লাগল যে, হযরত! আমি দারুণ আশ্চর্যজনক একটি স্বপ্ন দেখেছি। সেটা শুনুন।

সেই প্রেক্ষিতে হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বললেন : স্বপ্নের বৃত্তান্ত যার তার কাছে বলা উচিত নয়। যে মানুষ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানে, তার নিকটেই বলা উচিত। হযরতওয়ালা নিষেধ করলেন এবং বললেন যে, আমাকে বলবেন না। আমি স্বপ্নের তাবীর জানি না। যিনি স্বপ্নের তাবীর জানেন, তার কাছেই বলা উচিত। অতঃপর হযরত মাওলানা মুফতী মাহমূদুল হাসান গাঙ্গুহী রহ.এর ঠিকানা বলে দেয়া হল।

১২৭. স্বপ্নে আল্লাহ পাকের যিয়ারত

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : আমি আল্লাহ তাআলাকে একবার স্বপ্নে দেখেছি। ব্যস একটি বিদ্যুৎ ও তীব্র আলোর মত ছিল। চমকালো এবং অদৃশ্য হয়ে গেল।

এছাড়াও আরেকবার দেখেছিলাম।

১২৮. মিসওয়াক বিহীন উযু এবং জামাআত বিহীন নামায

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : মিসওয়াক হল উযুর অন্যতম প্রধান একটি সুন্নাত। মিসওয়াক ছাড়া উযু হয়ে যায় বটে। কিন্তু এটা সুন্নাতপরিপন্থী উযু।

আমি মিসওয়াক ছাড়া উযু করলে অদ্ভূত লাগে। আমার মনই ভরে না। এমন মনে হয় যে, আমি উযুই করিনি। হাদীস শরীফে মিসওয়াকের অনেক ফযীলতের কথা এসেছে। কিন্তু মিসওয়াককে কেন্দ্র করেই আমার উপর মুসীবত আসে। প্রত্যেক সফরে কোন না কোন মিসওয়াক অবশ্যই খোয়া যায়। এ জন্য আমিও কয়েকটি মিসওয়াক রাখি। পকেটে একটি। ব্যাগে একটি। ছোট মিসওয়াক পৃথক স্থানে। বড় মিসওয়াক ভিন্ন জায়গায়। কত আর খোয়া যাবে? খোয়া যাওয়ার কারণ হল লোকেরা খুইয়ে দেয়। খেদমতের জযবায় কেউ বদনায় পানি রাখছে। কেউ মিসওয়াক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ জুতা সোজা করছে। ব্যস, এর মধ্যেই খোয়া যায়।

আমার খেদমত গ্রহণের মন-মানসিকতা নেই। ভদ্রতার কারণে সাহায্য করা উচিত। খেদমত করবে না। বরং সাহায্য করবে। যেমনিভাবে মিসওয়াক ছাড়া উযু করলে মনে হয় যে উযুই করিনি। অনুরূপভাবে জামাআত ছাড়া নামায পড়লে মনে হয় যে, নামাযই পড়িনি।

১২৯. জমিনের উপর নামায পড়া

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. কুদূরী কিতাবের সবক পড়াচ্ছিলেন। সবকের মাঝে বললেন যে, জায়নামাযের পরিবর্তে ফরাশের উপর নামায পড়া বেশি ভাল। আর ফরাশও যদি কাঁচা হয়। অর্থাৎ জমিনের উপর নামায পড়া বেশি ভাল। হযরত মাওলানা কাসেম নানূতভীও রহ. জমিনের উপরই নামায আদায় করতেন।

ফায়েদা : এটা হযরত বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন : কেননা এর মধ্যে বিনয় ও আব্দিয়্যাত এবং শান বেশি প্রকাশ পায়। এটাও ঐ সময়

যখন কাঁচা ফরাশ সম্পূর্ণ পাক সাফ হবে। কাপড়ের মাটির সাথে মিশ্রিত হওয়ার আশঙ্কা না থাকবে। নতুবা অন্য কিছু দৃষ্টিকোণে মুসল্লা এবং জায়নামাযে নামায পড়াই উত্তম। (সংকলক)

১৩০. তাকওয়ার গুরুত্ব

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : তাকওয়া অনেক বড় জিনিস। আকাবির ও বুযুর্গানে দ্বীনের মধ্যে তাকওয়ার গুণই পাওয়া যেত। বর্তমানে লোকেরা পড়ালেখা করে সত্য। কিন্তু আমল, ইখলাস ও তাকওয়া থেকে একদম শূন্য। অথচ আসল জিনিস হল তাকওয়া। আর তাকওয়া ঐ সময়ই হাসিল হবে যখন ছাত্রযমানা থেকে এর অভ্যাস গড়ে তোলা হবে।

১৩১. হযরত শাহ অসিয়্যুল্লাহ ছাহেব রহ.এর ঘটনা

হযরত শাহ অসিয়্যুল্লাহ ছাহেব রহ.এর আলোচনা প্রসঙ্গে হযরতওয়ালা বান্ধাভী রহ. বলেন : এই সব হযরত সুন্নাতের খুব ইহতিমাম করতেন।

একবার হযরত শাহ ছাহেব রহ. এর মিসওয়াকের প্রয়োজন হল। কিন্তু মিসওয়াক ছিল না। একটা নিম গাছ ছিল। সেখান থেকে নিতে পারতেন। কিন্তু ঐ গাছটি নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন ছিল না। বরং কয়েকজন মানুষের যৌথ সম্পদ ছিল। তো যত মানুষ ঐ গাছের মালিকানায় শরীক ছিল। তাদের সকলের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছেন। এরপর মিসওয়াক করেছেন।

এ তাকওয়া তাঁর কীভাবে নসীব হয়েছে? যখন ছাত্রযমানা থেকেই এর অভ্যাস গড়ে তুলেছেন। দেখুন আল্লাহ পাক তাঁর দ্বারা দ্বীনের কত কাজ নিয়েছেন। কত মানুষের মধ্যে তাকওয়ার গুণ অর্জনের মাধ্যম হয়েছেন তিনি। যার নিজের মধ্যে তাকওয়া থাকে, তাঁর কথায় ক্রিয়া হয়। তাঁর তারবিয়্যাতে বরকত হয়। তাঁর মধ্যে তাকওয়া ছিল। এর বরকতে মানুষের মধ্যে তাকওয়া পয়দা হয়েছে। পক্ষান্তরে যার নিজের মধ্যেই তাকওয়া নেই, সে অন্যকে কী দিবে?

১৩২. আমাদের বড়দের তাকওয়া

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : হযরত শাইখুল হাদীস যাকারিয়্যা রহ. "আপবীতী" যা তাঁর আত্মজৈবনিক স্মৃতি গ্রন্থে লিখেন : "মাযাহেরে উলূম সাহারানপুরের বার্ষিক জলসায় শিক্ষক বা কর্মচারীদের কেউ কখনো জলসার

খানা খেতেন না। পানি পান করতেন না। এমন কি চা-পান পর্যন্ত খেতেন না। সবাই নিজ নিজ খানা খেতেন"।

১৩৩. মাওলানা ইনায়েত ইলাহী ছাহেবের তাকওয়া

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : মাযাহেরে উলূম সাহারানপুর মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা ইনায়েত আলী ছাহেব রহ. জলসার সময় দুই দিন ও রাত মাদরাসার ভিতরেই থাকতেন। যুহরের সময় বা রাত বারোটা বাজে নিজ দফতরের কোণায় বসে ঘরের ঠাণ্ডা এবং সাধারণ খানা খেয়ে নিতেন।

১৩৪. হযরত মাওলানা যহুরুল হক ছাহেব রহ. এর তাকওয়া

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : আমার একজন উস্তায ছিলেন সাহারানপুরে। মাওলানা যহুরুল হক ছাহেব রহ.। তাঁর তাকওয়ার অবস্থা ছিল এই যে, মাদরাসার খানাও চেখে দেখতেন না। কখনো প্রয়োজন সামনে আসলে অন্য কাউকে বলতেন যে, একটু লবণ চেখে দেখ তো।

স্বয়ং আমাকেই কয়েকবার বলেছেন : সিদ্দীক, সিদ্দীক (খুব দ্রুত বলতেন) যবানে কিছুটা জড়তা ছিল। এর লবণটা একটু চাখো তো।

মাদরাসার জিনিসের ব্যাপারে খুব খেয়াল রাখতেন। নিজে ব্যবহার করতেন না। আর বর্তমানে তো মাদরাসার জিনিসকে গনীমতের মাল মনে করা হয়।

মাওলানা যহুরুল হক ছাহেব রহ. জলসার সময় মাতবাখ (রান্নাঘর) এর ব্যবস্থাপক হয়েছিলেন। চব্বিশ ঘণ্টা মাতবাখের মধ্যেই থাকতেন। কিন্তু তরকারী চাল ইত্যাদির লবণ কোন তালিবে ইলমের মাধ্যমে চাখাতেন। নিজে চাখতেন না, সময় পেলে বাসায় গিয়ে খানা খেতেন।

১৩৫. মাওলানা মুহাম্মাদ মাযহার নানূতভী রহ.এর তাকওয়া

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : মাওলানা মুহাম্মাদ মাযহার নানূতভী রহ. এর অভ্যাস ছিল এই যে, মাদরাসার সময়ে যদি কোন স্নেহাস্পদ ব্যক্তিগত সাক্ষাতের জন্য আসতেন, তাহলে তার সাথে কথা বলা শুরু করার সময় ঘড়ি দেখে নিতেন। অতঃপর ঐ স্নেহাস্পদ বা আত্মীয় ফিরে যাওয়ার সময় ঐ সময়টুকু টুকে রাখতেন। মাস শেষে সেগুলো একত্রিত করে যদি

অর্ধেক দিনের কম হত তাহলে অর্ধদিনের ছুটি আর অর্ধদিনের চেয়ে বেশি হলে পুরো দিনের ছুটি লেখাতেন।

১৩৬. হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহ. -এর তাকওয়া

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ ছাহেব মুহাদ্দিসে সাহারানপুরী রহ. কখনো মাদরাসার কোন জিনিস ব্যবহার করতেন না। একবার তাঁর কোন এক আত্মীয় সাক্ষাতের জন্য আসলেন। সবক চলাকালীন হযরত তার সঙ্গে কোন কথা বলেননি। সবক শেষ হওয়ার পর হযরত তার নিকট গমন করেন। তিনি পীড়াপীড়ি করছিলেন যে, হযরত নিজ স্থানেই অবস্থান করুন। হযরত সাহারানপুরী রহ. বললেন : মাদরাসা তো এই বিছানা সবক পড়ানোর জন্য দিয়েছে। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য নয়। বর্তমানে মাদরাসাগুলোতে সবক চলাকালীন প্রতিটি সবকে অতিরিক্ত কথাবার্তা হয়। ছাত্রদের উপর যেটার বিরাট প্রতিক্রিয়া হয়। এই ছাত্ররা শিক্ষক হওয়ার পর এমনটিই করবে।

হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ ছাহেব রহ. এর বিশেষ মেহমানদের সাথে বসতে হত। কিন্তু বাসা থেকে দশ বারোজন মানুষের খানা আসত, যা বিভিন্ন মেহমানদের সামনে রাখা হত। সেখান থেকেই হযরতও খানা খেতেন।

১৩৭. হযরত মাওলানা মুযাফ্‌ফার হুসাইন কান্ধলভী রহ. -এর তাকওয়া

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : হযরত মাওলানা মুযাফফার হুসাইন কান্ধলভী রহ. অনেক উঁচু স্তরের বুযুর্গ, মুত্তাকী ও পরহেযগার ছিলেন। হযরত আকদাস থানভী রহ. এবং হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. তাঁদের থেকেও বড় ছিলেন।

তাঁর তাকওয়ার অবস্থা ছিল এই যে, ছাত্র যমানায় যখন দিল্লীতে পড়ালেখা করতেন তখন তরকারী ছাড়া রুটি খেতেন। শুধু এ কারণে যে, দিল্লীতে ঐ সময় হোটেলে যে তরকারী পাওয়া যেত সাধারণত তার মধ্যে কাঁচা আম দেওয়া হত। আর আমের বাগানসমূহ বেচাকেনার যে প্রথা ঐ সময় ছিল, সেরা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়িয ছিল। কেননা গাছে ফল আসার পূর্বেই সেটা বিক্রি করে দেয়া হত। যা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়িয।

তাঁর তাকওয়ার অবস্থা ছিল এই যে, হারাম মাল এবং হারাম খাদ্যকে তাঁর পাকস্থলী কবূল করত না। যদি কখনো এ জাতীয় খানা পেটে চলেও যেত, সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়ে যেত।

এ জন্য তাঁকে দাওয়াত করতে লোকজন ভয় পেত। তাঁকে দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে কেউ তাড়াহুড়া করত না। সবাই ভয় পেত যে, না জানি খানার পরে আবার বমি হয়ে যায় কিনা? যদ্দরুন আমাদের সম্পদ হারাম হওয়া প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং আমাদের অসম্মান হবে।

১৩৮. হযরত মাওলানা আহমাদ আলী সাহারানপুরী রহ. -এর তাকওয়া

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : একবার হযরত মাওলানা আহমাদ আলী মুহাদ্দিসে সাহারানপুরী রহ. মাযাহেরে উলূমের পুরানো ইমারতের জন্য চাঁদা তোলার উদ্দেশ্যে কলিকাতা গমন করেন। সেখানে একজন বন্ধুর সাথে মাদরাসার কাজে সাক্ষাতের জন্য গেলেন। রিক্সায় গেলেন। কিন্তু রিক্সার ভাড়া নিজেই আদায় করলেন। মাদরাসার টাকায় দেননি। এই হল তাঁর তাকওয়া ও সতর্কতার অবস্থা।

সফর থেকে ফেরার পর মাদরাসায় বিস্তারিত হিসাব দাখিল করলেন। তো এর মধ্যে লিখেছিলেন যে, "কলিকাতায় আমি অমুক স্থানে আমার এক বন্ধুর সাথে সাক্ষাতের জন্য গিয়েছিলাম। যদিও সেখানে প্রচুর চাঁদা পাওয়া গেছে। কিন্তু আমার সফরের উদ্দেশ্য ছিল বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করা। চাঁদা করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। এজন্য সেখানে যাতায়াতের এ পরিমাণ ভাড়া আমার হিসাব থেকে কর্তন করা হোক।"

বর্তমানে তো লোকেরা মাদরাসাকে অর্থ উপার্জনের মাধ্যম বানিয়ে রেখেছে। যাকেই দেখবে, ছোট একটা মাদরাসা বানিয়ে নিয়েছে। দৃষ্টিনন্দন রসিদ ছাপিয়ে নিয়েছে। লম্বা লম্বা ইশতিহার ছাপিয়ে নিয়েছে। আর চাঁদা করা শুরু করে দিয়েছে। ভাল আমদানী হচ্ছে।

মাদরাসায় থাকা ও নাযেম বা মুহতামিম হওয়া অনেক বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ। সহজ কাজ নয়। হয়ত সোজা জান্নাতে যাবে অথবা সোজা জাহান্নামে। আল্লাহ তাআলাই হেফাযতকারী।

১৩৯. যে তাকওয়া অবলম্বন করতে চায় আল্লাহ পাক তাকে সাহায্য করেন

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : গুনাহ থেকে বাঁচার হাজারো পথ আছে। কিন্তু বেঁচে থাকার ইচ্ছা তো থাকতে হবে। যে বাঁচতে চায় আল্লাহ তাআলা তাকে বাঁচার সূরত করে দেন।

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۝

অর্থাৎ "আর যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য নিস্কৃতির পথ করে দেন।" (সূরা তালাক, আয়াত ২)

এ আয়াতে কারীমের ব্যাখ্যা এটাই। আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে এমন এমন পন্থা ঢেলে দেন, যদ্দরুন সে গুনাহ থেকে বেঁচে যায়। এবং আল্লাহ তাআলা তাঁকে সাহায্য করেন। কিন্তু এই সব তার জন্যই যে বাঁচতে চায়।

১৪০. হযরত ইউসুফ আ. এর ঘটনা

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : হযরত ইউসুফ আ.-এর ঘটনা প্রসিদ্ধ। যুলাইখা যিনি মিসরের আযীযের স্ত্রী ছিলেন। হযরত ইউসুফের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। এবং তিনি নিজ জালে ফাঁসানোর জন্য সমস্ত কৌশল অবলম্বন করেন। কিন্তু হযরত ইউসুফ আ. প্রস্তুত হননি। বাস্তবিকপক্ষেই এটা ছিল ভীষণ কঠিন পরীক্ষা। যদি কোন বাজারী মহিলা, বেশ্যা বা দাসী হত, তাহলে তো বাঁচা সহজ ছিল। কিন্তু বাদশাহর স্ত্রী অতুলনীয় সৌন্দর্যের অধিকারীনী। তার প্রলোভন থেকে নিজেকে বাঁচানো সাধারণ ব্যাপার নয়। তাও আবার এক দুই ঘণ্টার ব্যাপার হলেও কথা ছিল। সেখানে তো দিন রাত থাকতে হত। সত্যিই দারুণ মুশকিল পর্যায় ছিল।

হযরত ইউসুফ আ. এর পবিত্রতার অনুমান এটার দ্বারাও করা যায় যে, যখন অন্য মহিলারা যুলাইখাকে তিরস্কার করল, তখন যুলাইখা ঐ সব মহিলাকে দাওয়াত করলেন আর হযরত ইউসুফ আ.কে কোন বাহানায় সামনে আসার নির্দেশ দিলেন। ঐ সব মহিলা হযরত ইউসুফ আ.কে দেখা মাত্রই ফল কাটার পরিবর্তে নিজ নিজ হাত কেটে ফেলেছে। এই সামান্য সময়েই তাদের এই অবস্থা হয়েছিল। অথচ যুলাইখা তো সারাদিনই ঐ বাসায় থাকত। তারপরও এত ধৈর্য।

যখন ঐ মহিলারা নিজ নিজ হাত কেটে ফেলল, তখন হযরত ইউসুফ আ. এর সৌন্দর্য অবলোকন করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠল: এতো মানুষ নয়

ফেরেশতা! ঐ মহিলারাও হযরত ইউসুফ আ.কে বুঝাল যে, যুলাইখার কথা মেনে নাও। কিন্তু হযরত ইউসুফ আ. তাদের কথা মানেননি।

১৪১. অনেক সময় বড়দের দ্বারাও ভুল করানো হয়

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : যখন হযরত ইউসুফ আ. এই পরিবেশ দেখলেন যে, এখানে বেঁচে থাকা খুব কঠিন। এই সব মহিলাও আমার পিছনে উঠে পড়ে লেগেছে। তখন হযরত ইউসুফ আ. আল্লাহ পাকের নিকট দুআ করলেন : ইয়া আল্লাহ! এই বিপদ থেকে তো জেলখানাই আমার জন্য উত্তম। আল্লাহ তাআলা বললেন : আচ্ছা, ঠিক আছ। তুমি যখন নিজের জন্য জেলখানাই ঠিক করেছ, তখন আমি তোমাকে জেলখানাতেই পাঠাচ্ছি। বড়দের পাকড়াও জলদী হয়। সামান্য কথায় পাকড়াও হয়ে যায়। হযরত ইউসুফ আ. এর ইজতিহাদী ভুল হয়ে গিয়েছিল। তাঁর মাধ্যমে বিশেষ হেকমতে ভুল করানো হয়েছে। তাঁর মুখ দিয়ে এ কথাগুলো বের করানো হয়েছে। হযরত ইউসুফ আ.কে জেলখানায় প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা অসংখ্য মানুষকে হেদায়েত দিয়েছেন।

১৪২. যতটুকু সামর্থ আছে ততটুকু করো, আল্লাহ সাহায্য করবেন

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : একবার যুলাইখা হযরত ইউসুফ আ.কে বিভ্রান্ত করার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করল। খুব সেজে গুজে সামনে আসল। ঘরের সবগুলো দরওয়াজায় তালা মেরে দিল। অতঃপর হযরত ইউসুফ আ.কে নিজ বাসনা পূরণের জন্য ডাকল। ইউসুফ আ. অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। বাইরে বের হওয়ার চেষ্টা করলেন। তখন দেখলেন যে, দরওয়াযা বাহির থেকে তালা মারা। কিন্তু যতটুকু তাঁর সামর্থে ছিল ততটুকু তিনি করেছেন। দরওয়াযা পর্যন্ত দৌড়ে এসেছেন। আল্লাহ তাআলা তালা খুলে দিয়েছেন। ইউসুফ আ. যতই সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন। ততই তালাগুলো একটার পর একটা খুলে পড়ে যাচ্ছিল।

এজন্য মানুষ যখন তার সামর্থ অনুযায়ী মেহনত করে, তখন আল্লাহ পাক গায়েব থেকে তার হেফাযতের ব্যবস্থা করেন :

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۝

"আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য গুনাহ থেকে বাঁচার ব্যবস্থা করে দেন।" (সূরা তালাক, আয়াত ২)

১৪৩. যে হারাম থেকে বেঁচে থাকে আল্লাহ তাআলা তার জন্য হালাল তরীকায় ব্যবস্থা করেন

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : কোন কোন ইসরাঈলী বর্ণনায় এসেছে যে, পরবর্তীতে হযরত ইউসুফ আ. এবং যুলাইখার মধ্যে বিবাহ হয়েছিল। উভয়ে স্বামী স্ত্রী হিসেবে থাকতেন। যে ব্যক্তি হারাম থেকে বাঁচে, আল্লাহ তাআলা হালাল তরীকায় ঐ জিনিস তাকে নসীব করেন। প্রথমে যুলাইখা হযরত ইউসুফ আ. এর জন্য হারাম ছিল। হযরত ইউসুফ আ. যখন পবিত্রতা অবলম্বন করেছেন, তখন আল্লাহ তাআলা যুলাইখাকে হালাল করে তাঁর সামনে পেশ করেছেন।

১৪৪. শাহ আব্দুল আযীয ছাহেব রহ. এর একজন শিষ্যের অদ্ভূত ঘটনা

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : দিল্লীতে একজন তালিবে ইলম হযরত শাহ আব্দুল আযীয ছাহেব মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. এর খেদমতে দৈনিক হাদীস পড়ার জন্য যেতেন। একই রাস্তা দিয়ে দৈনিক ঐ তালিবে ইলম যেতেন। একদিন একটি বাড়ীর দরওয়াযায় দাঁড়ানো একজন মহিলা ঐ তালিবে ইলমকে ডেকে বলল : ভাই! আমার একটি চিঠি পড়ে দাও। ঐ তালিবে ইলম ছিল সহজ সরল প্রকৃতির। সে মনে করল যে, হয়ত বাস্তবেই কোন চিঠি হবে। মহিলাটি হয়ত পড়তে জানে না, আমি পড়ে দিব। দরওয়াযায় পৌঁছার পর ঐ মহিলা বলল যে, এখানে দরওয়াযায় দাঁড়িয়ে চিঠি পড়াটা সমীচীন মনে হচ্ছে না। ভিতরে এসে বস, দুই মিনিটের ব্যাপার। মাত্র কয়েক লাইনের চিঠি। পড়ে দাও। ভিতরে প্রবেশের পর মহিলাটি দ্রুত তালা বন্ধ করে দিল এবং বলল যে, আমার চিঠি পড়ে দিতে হবে না। আমি তো তোমাকে এ কাজের জন্য ডেকেছি। অতঃপর স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করল। আমি কয়েক মাস যাবত তোমার প্রতি আসক্ত। দৈনিক তোমাকে বের হতে দেখি। আজ আমার সুযোগ হয়েছে। আমার কথা মেনে নাও।

ঐ তালিবে ইলম বলল : হায়! এ আমি কোন্ জালে ফাঁসলাম। সে তার অসন্তুষ্টির কথা প্রকাশ করল এবং কোনভাবেই প্রস্তুত হল না। মহিলাটি বলল যে, "যদি আমার কথা না মান তাহলে আমি এখনই চিৎকার দিয়ে বলব যে, এই বদমাশ ছেলেটি আমার ঘরে ঢুকে আমাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করেছে। তোমার পালানোর কোন পথ নেই"।

তালিবে ইলম খুব পেরেশান হল। তালিবে ইলমের অন্তরে আল্লাহ পাক একটা কথা ঢেলে দিলেন। তালিবে ইলমটি মহিলাকে বলল যে, আচ্ছা আমি বাইতুল খালা (বাথরুম) গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে আসছি। তালিবে ইলম বাইতুল খালায় গেল। ঐ যুগের বাইতুল খালায় বর্তমান কালের মতো ফ্লাশার এর ব্যবস্থা ছিল না। বাইতুল খালায় যত পায়খানা ও দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস ছিল কাপড় খুলে সব নিজের শরীরে মেখে নিল। ঐ অবস্থাতেই বাইরে আসল। মহিলাটি তাকে এ অবস্থায় দেখে বলল যে, দূর হ পাগল কোথাকার। পাগল মনে করে ঘর থেকে বের করে দিল।

তালিবে ইলম দ্রুত বের হয়ে একটি নদীতে পৌঁছে তাড়াতাড়ি কাপড় ধৌত করল এবং গোসল করল। এবং সঙ্গে সঙ্গে হযরত শাহ ছাহেব রহ. এর খেদমতে পৌঁছলেন। কাপড় এখনো শুকায়নি। ভিজা কাপড়েই পিছনে বসে সবকে শরীক হলেন। সবকে যথেষ্ট বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরই হযরত শাহ আব্দুল আযীয ছাহেব রহ. বললেন : এই সুঘ্রাণ কোথা থেকে আসছে? এ কথাটি কয়েক বার বললেন, এমন সুঘ্রাণ তো আমি কখনো শুঁকিনি।

এই তালিবে ইলম লজ্জার কারণে মাথা নীচু করে বসেছিল। আর মনে মনে ভাবছিল যে, আমার শরীরে যে ময়লা লেগেছিল মনে হয় সেই দুর্গন্ধই হবে। সেটাকেই শাহ ছাহেব এভাবে বলছেন। সম্ভ্রান্ত মানুষ কখনো এভাবে বলে না যে, দুর্গন্ধ আসছে। সহ্য করে। অতঃপর ইশারা ইঙ্গিতে বলে।

সবক শেষ হওয়ার পর ঐ তালিবে ইলম হযরত শাহ ছাহেবের খেদমতে উপস্থিত হয়ে ওযরখাহী করলেন এবং নির্জনে আরয করলেন যে, হযরত! এমন ঘটনা সামনে চলে এসেছিল। আমি তাড়াহুড়া করে কাপড় ধোয়ার কারণে হয়ত দুর্গন্ধ থেকে গেছে। আমার কারণে হয়ত হযরতের কষ্ট হয়েছে। তাই আমাকে মাফ করে দিন।

শাহ ছাহেব রহ. বললেন : আল্লাহর কসম! বাস্তবেই আমার নাকে সুঘ্রাণ আসছিল। এমন সুঘ্রাণ এর পূর্বে আমি আর কখনো শুঁকিনি। তুমি গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা এবং আল্লাহ তাআলাকে রাযী-খুশী করার জন্য স্বীয় শরীরকে দুর্গন্ধযুক্ত করেছিল। এর পরিবর্তে আল্লাহ পাক সব সময়ের জন্য তোমার শরীরকে সুবাসিত ও সুঘ্রাণযুক্ত বানিয়ে দিয়েছেন। তাই তো কিতাবে লিখেছে যে, ঐ তালিবে ইলমের শরীর থেকে সব সময় সুঘ্রাণ আসত।

১৪৫. যে ব্যক্তি হারাম থেকে বাঁচে আল্লাহ তাআলা তার জন্য হালালের দরওয়াযাসমূহ খুলে দেন

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : কেউ হারাম কাজ থেকে আত্মরক্ষা করেই দেখুক না। আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য কিভাবে হালালের দরওয়াযা উন্মুক্ত করে দেন। আল্লাহ তাআলা তো মানুষের মনের অবস্থা সম্পর্কে জানেন। এমন একজন তালিবে ইলম যার কাছে সাবান নেই, সে সাবান ছাড়াই তার কাপড় ধৌত করে। তারপরও অন্য কারো সাবান সে স্পর্শ করে না।

এক ব্যক্তি খালি পায়ে চলাফেরা করে। খালি পায়ে ইস্তিঞ্জা করে। কিন্তু তবুও সে কাপড় চুরি করে না। জুতো চুরি করে না। ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির। তবুও অন্যের খানা অনুমতি ছাড়া চুরি করে খায় না।

এমন ব্যক্তির প্রতি মানুষের দয়া আসবে কি আসবে না? এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ পাক রিযকের দরওয়াযা খুলবেন কি খুলবেন না? অবশ্যই খুলবেন। কিন্তু আমরা তো প্রথম থেকেই নিয়্যত খারাপ করি। এজন্যই বরকত হয় না। এবং কল্যাণ উঠে যায়।

১৪৬. হযরত শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়্যা ছাহেব রহ. এর তাওয়াক্কুল

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : হযরত শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়্যা ছাহেব রহ. এর উপর তাঁর আব্বাজানের ইন্তিকালের পর খুব কষ্টের সময় আসল। কেউ কেউ ব্যবসা করার পরামর্শ দিলেন যে, মীরাঠে ব্যবসার ভাল ক্ষেত্র আছে। সেখানে অভিজ্ঞ মুরব্বীদের অভিভাবকত্বও হাসিল হবে। যার দ্বারা ব্যবসায় উন্নতি হবে। কিন্তু হযরত দরস বাদ দেওয়াকে একদম পসন্দ করেননি। এবং সারা জীবন মাযাহেরুল উলূম সাহারানপুর মাদরাসায় বিনা বেতনে দরস দিয়েছেন।

একবার হায়দারাবাদ থেকে একটি লম্বা চিঠি আসল। যার মধ্যে প্রস্তাব দেয়া হল যে, সব ধরনের আরামের পাশাপাশি ইলমী ব্যস্ততা থাকবে যা হযরতের প্রিয় ব্যস্ততা। অথচ বেতন দেওয়া হবে মোটা অংকের অর্থাৎ ঐ সময়ের আটশত রূপী। কিন্তু হযরত কোনভাবেই মাযাহেরে উলূমকে পরিত্যাগ করা পসন্দ করেননি।

তিনি লিখলেন :

مجھ کو جینا ہی نہیں بندۂ احسان ہو کر

অর্থাৎ "কারো অনুগ্রহের দাস হয়ে আমি বেঁচে থাকতেই চাই না।"

ভারত ভাগের দুই তিন বছর পূর্বে ঢাকা থেকে চিঠি আসল যে, স্রেফ বুখারী শরীফ ও তিরমিযী শরীফ আপনার দরসে থাকবে। কিন্তু বেতন হবে বারোশত রূপী। এর উপর বারবার পীড়াপীড়ি করা হল। এবং একাধিক চিঠি ও তারও হযরতের খেদমতে পাঠানো হল। প্রতিউত্তরে হযরত লিখলেন : "যে সব বন্ধু আপনার নিকট আমার নাম নিয়েছে, তারা শুধুমাত্র সুধারণার ভিত্তিতে ভুল বর্ণনা পৌঁছিয়েছে। এ অধম সেটার মোটেও যোগ্য নয়।" (আপবীতী)

এই হল আমাদের আকাবিরের যিন্দেগী। যাঁদেরকে নমূনা বানানো হয়। অথচ বর্তমানে অবস্থা হল এই যে, দ্বীনী মাদরাসাগুলোতে বিশ বিশ বছর দরস দেওয়ার পরও সামান্য অর্থের লোভে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে অন্য দেশে গিয়ে কামাই রোজগারে লেগে পড়ে। যে কারণে নামাযের পাবন্দী পর্যন্ত করতে পারে না।

১৪৭. বিনা প্রয়োজনে খেদমত নেয়া অনুচিত

একবার হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বুখারী শরীফের দরস দেওয়া থেকে ফারেগ হওয়ার পর একজন তালিবে ইলম হযরতের কিতাব নিজের হাতে নিয়ে নিলেন। হযরত বললেন : আমার কিতাব কোথায়? দাও, আমি নিজে বহন করব। আমি তো আর মাযূর মানুষ নই। খেদমতের এমন অভ্যাস ঠিক নয় যে, খাদেম কিতাব বহন করবে আর মাখদূম খালী হাতে চলবে।

আমি অধম সংকলক আদব ও বিনয়ের সাথে হযরতের নিকট আরয করলাম যে, অনেক সময় তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জরুরত সারার জন্য যখন যেতেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বদনা, লাঠি ইত্যাদি সাথে নিয়ে যেতেন। সাহাবায়ে কেরাম বহন করতেন। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিশেষ কোন অপারগতা ছিল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও নিয়ে যেতে পারতেন।

এই প্রেক্ষিতে হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বললেন : আমি তো আর এটাকে নাজায়েয বলিনি। আমার উদ্দেশ্য হল এমন অভ্যাস হওয়া অনুচিত। অবশ্য খাদেমের মন মানসিকতা এমনই হওয়া উচিত।

(রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবনে উভয় ধরনের নমূনা আছে।)

১৪৮. নামায না পড়লে পেরেশানী দূর হবে না

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. এর নিকট জনৈক ব্যক্তি পেরেশানী থেকে মুক্তির জন্য তাবীয কামনা করল। হযরতওয়ালা বললেন : তুমি নামায পড়? বলল যে, না। হযরত বললেন : তুমি নামায না পড়লে তোমার পেরেশানী কিভাবে দূর হবে? যতক্ষণ পর্যন্ত গুরুত্বের সাথে নামায আদায় না করবে, তোমার পেরেশানী দূর হবে না।

১৪৯. নামায না পড়লে ভূত ও শয়তান তোমাদের উপর সওয়ার থাকবে

জনৈক ব্যক্তি তাবীয নেওয়ার জন্য হযরতের খেদমতে উপস্থিত হল। এবং আরয করল যে, "আমার অবস্থা বড় অদ্ভুত। অন্তরে নানা ধরনের আজেবাজে খেয়াল ও কুমন্ত্রণা আসতে থাকে। এমন মনে হয় যে, আমি কিছুই না। অনেক সময় আত্মহত্যা করতে মনে চায়। কোন কাজে মন বসে না। আমি মানসিক হীমন্যতার শিকার। মনে হয় সব সময় শয়তান চেপে আছে"।

হযরত তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি নামায পড়? কয় ওয়াক্ত পড়? সে বলল : পড়ি না। হযরত বললেন : যেটা আসল চিকিৎসা সেটা তো কর না। এদিক সেদিক ছুটাছুটি কর। পয়সা খরচ কর। হাজার হাজার টাকা নষ্ট করছ।

আমি যদি এখন বলি যে, অমুক স্থানে ভাল ডাক্তার আছে। তার মাধ্যমে চিকিৎসা করাও। উপকার হবে। তাহলে দেখা যাবে যে, হাজার হাজার টাকা খরচ করে ফেলবে। কিন্তু আসল চিকিৎসা যেটার কথা বলছি সেটা করে না। সেটা করতে গিয়ে প্রাণ বের হয়ে যায়।

তুমি নামায না পড়লে তোমার উপর শয়তান সওয়ার হবে না তো কী হবে? আর যখন শয়তান সব সময় সওয়ার থাকবে, তখন খারাপ খারাপ খেয়াল আসবেই।

আমি সত্য বলছি, যদি তুমি আজ থেকেই নামাযের পাবন্দী আরম্ভ কর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ইহতিমাম কর, পাঁচ ওয়াক্ত উযু কর এবং উযু করে إِنَّا أَنزَلْنَا সূরা পড়। আর উযুর বেঁচে যাওয়া পানি আসমানের দিকে মুখ করে পান কর, তাহলে দেখবে অবশ্যই উপকার হবে ইনশাআল্লাহ।

এগুলোই হল আসল চিকিৎসা। অর্থাৎ আল্লাহ অভিমুখী হওয়া। তাওবা করা, ইসতিগফার করা, দুআ করা, নামাযের পাবন্দী ইত্যাদি। এগুলোর দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি আসে। এগুলো করে না। শুধু তাবীয দ্বারা কাজ চালাতে চায়।

কিতাবে লিখেছে, বেনামাযী ব্যক্তির জন্য যদি গাউছ-কুতুবও দুআ করে, তাহলেও এদের ক্ষেত্রে তাঁদের দুআ কবূল হয় না। তাবীয বেচারা কী করবে?

১৫০. নামায না পড়লে তাবীযের দ্বারা ফায়েদা হবে না

জনৈক ব্যক্তি হযরতের খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং বিভিন্ন পেরেশানীর আলোচনার পর ঐ পেরেশানী থেকে মুক্তি এবং খাইর ও বরকতের জন্য তাবীয কামনা করলেন। হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বললেন : তুমি কি নামায পড়? এর প্রেক্ষিতে আগন্তুক নীরব থাকলেন। কোন উত্তর দিলেন না। হযরত বললেন : তুমি হাজারো তাবীয বাঁধো না কেন। গলায় নয় অন্তরেও যদি ঝুলাও তবুও কোন উপকার হবে না।

যে ব্যক্তি নামাযের পাবন্দী করবে না, তার সম্পদে খায়ের ও বরকত হতে পারে না। এমন ব্যক্তি সব সময় পেরেশান থাকে। কুরআন-হাদীস ভুল হতেই পারে না।

১৫১. তাবীয আলেমদের জন্য নয় বরং মূর্খদের জন্য হয়

জনৈক আলেম বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তাবীয কামনা করলেন। হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বললেন : তাবীয-গন্ডা আলেমদের জন্য নয় বরং মূর্খদের জন্য। যারা পড়ালেখা জানে না। আলেমরা তো নিজেরা পড়তে জানে। অতঃপর ঐ আলেমকে আর তাবীয দেননি।

১৫২. তাবীযের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : বর্তমানে লোকেরা তাবীযের ক্ষেত্রে খুব বাড়াবাড়ি করে। এমন মনে করে যে, নাউযুবিল্লাহ আল্লাহ তাআলা যখন আমার কাজ করে দিচ্ছেন না, তাহলে চলো অমুকের থেকে তাবীয লিখিয়ে নাও। কেমন যেন তাবীয ঐ ব্যক্তির নির্দেশ! তার ফরমান! এখন তো আল্লাহ তাআলাকে এ কাজ অবশ্যই করতে হবে নাউযুবিল্লাহ! মনে করে তাবীযই সবকিছু করে দিবে।

১৫৩. বাচ্চাদের জিদের কারণে পেরেশান হওয়া ঠিক নয়

জনৈক ব্যক্তি হযরতের নিকট বাচ্চার সংশোধনের জন্য তাবীয কামনা করলেন। আরয করলেন। হযরত! বাচ্চা খুব জিদ করে। এমন একটা তাবীয দিন যাতে বাচ্চা জিদ না করে।

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বললেন : বাচ্চা জিদ করবে না তো বুড়োরা জিদ করবে? বাচ্চারাই তো জিদ করে।

হযরত জিজ্ঞেস কররেন : বাচ্চার বয়স কত? বললেন, তিন চার বছর। হযরত বললেন : তিন চার বছর বয়সের বাচ্চা জিদ করবে না তো আর কী করবে? বাচ্চারা জিদ করেই থাকে। প্রত্যেক কাজের তাবীয হয় না। তোমরা তো অল্পতেই পেরেশান হয়ে যাও। বাচ্চাদেরকে এত বেশি ভদ্র বানানোর চেষ্টা করো না যে, তারা জিদই করবে না, বেশি পিছনে পড়ো না। যারা শুরু থেকেই তাদেরকে বেশি সভ্য ভদ্র বানানোর চেষ্টা করে। পরবর্তীতে এদের বাচ্চাগুলো আরো বেশি নষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য এটার চেষ্টা করা উচিত যেন অভ্যাস খারাপ হয়ে না যায়।

এটার কোন ফিকির করে না। বাচ্চাদের জিদের কারণে পেরেশান হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে বললেন যে, এক স্থানে জনৈক ব্যক্তি কারো সাথে সাক্ষাতের জন্য গেলেন। দরজায় মৃদু আঘাতের পর ভিতর থেকে বাচ্চা বের হল। আগন্তুক তাকে জিজ্ঞেস করল যে, আব্বা বাসায় আছে? বাচ্চা ভিতরে গেল এবং ফিরে এসে উত্তর দিল যে, আব্বা বলেছেন : বলে দাও যে, আব্বা বাসায় নেই।

এটা এ এলাকারই ঘটনা। এ জাতীয় ঘটনার প্রতিক্রিয়া শিশুদের উপর খুব খারাপ হয়। তাদের অভ্যাসও খারাপ হয়ে যায়। এবং তারাও শুরু থেকেই মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এ জাতীয় কর্মকান্ড থেকে বাচ্চাদেরকে বাঁচাতে হবে।

১৫৪. তাবীযওয়ালাদের কারণে পেরেশানী এবং দ্বীনী ক্ষতি

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : বর্তমানে তো তাবীযওয়ালাদের এত ভীড় হয়ে গেছে যে, আমি খুব পেরেশান হয়ে পড়েছি। এ কারণে কিছু লিখতেও পারছি না। তিন দিন যাবত লেখানো ব্যাহত হচ্ছে। প্রথমে তাকরীর লিখি। সেটাই আবার লেখাই। কিন্তু তাবীযওয়ালাদের কারণে লেখার সুযোগই পাচ্ছি না। একশ দেড়শ মানুষ আসে। এমনটি আমি পূর্বে কখনো

দেখিনি। আমি খুব পেরেশানীতে আছি। তাবীয তো যাক তাবীযই। যারা এখানে আসে তাদের নাস্তা বাবদও প্রচুর ব্যয় হয়। যাই হোক, খানা বড় কথা নয়। যে খায় সে তার রিযকই খায়। কিন্তু আমার এত সময় কোথায় যে, প্রত্যেকের কথা বিস্তারিত শুনব?

১৫৫. শিক্ষিত ও দ্বীনদার মানুষের মধ্যেও যাদুটোনা ও দুষ্ট আত্মার আশঙ্কা

জনৈক ব্যক্তি হযরতের নিকট তাবীয নেওয়ার জন্য আসে এবং আরয করে যে, হযরত! মনে হয় কেউ আমার পিছনে লেগেছে। কেউ কিছু করিয়েছে।

হযরত বললেন : আশ্চর্য কথা, বর্তমানে যাকেই দেখবে, প্রত্যেকেই এ কথাই বলে যে, যাদু ও দুষ্ট আত্মার প্রভাব, সামান্য কোন পেরেশানী বা অসুখ বিসুখ হলেই মুখে এটাই আসে যে, কেউ মনে হয় কিছু করিয়েছে।

এই রোগে ভাল ভাল পড়ালেখা জানা মানুষ বরং বড় বড় আলেমরা পর্যন্ত লিপ্ত। সবাই এটাই বলে : নিশ্চয়ই এটা যাদুর প্রতিক্রিয়া। ঐ আত্মীয় নিশ্চয়ই আমাকে বান মেরেছে। এটাকে এমন নিশ্চিত ব্যাপার মনে করে যেমন আসমানের অহী!

আরে যা কিছু হয় আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকেই হয়। যা করেন আল্লাহই করেন। যদি যাদুও হয় এবং সেটার প্রতিক্রিয়াও হয়, তবুও মনে করতে হবে, মহান আল্লাহর করার দ্বারাই হয়েছে। আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না। যখন আল্লাহই সবকিছু করনেওয়ালা, তখন আল্লাহর দিকে কেন তোমরা মনোযোগী হও না? তাঁর নিকট দু'আ কেন কর না? নাকি নাউযুবিল্লাহ শয়তান বা দুষ্ট জিন আল্লাহ পাকের রাজত্বের মধ্যে এমন অনুপ্রবেশকারী হয়ে গেছে যে, আল্লাহর উপর প্রবল হয়ে গেছে। নাউযুবিল্লাহ। তাদের সামনে আল্লাহ কিছুই করতে পারেন না। জিনেরা যদি কিছু করেই থাকে, তাহলে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাতেই করে।

এরপরও আল্লাহর সামনে কেন নত হও না? তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লাহ, দুআ, আল্লাহঅভিমুখী হওয়া এগুলো হল আসল চিকিৎসা। এগুলো কেউ করে না। তাবীয তাবীয বলে চিৎকার করে।

আমার বাসাতেও জ্বিন থাকে। কয়েকবার এর চিহ্নও দৃশ্যমান হয়েছে। কিন্তু কখনো দুষ্টুমি করেনি। আরে জ্বিনেরা নিজেরা কী করবে? যা করবে সেটা তো মহান আল্লাহর হুকুম ও তাঁর ইচ্ছাতেই করবে।

আমার বাসাতেও অনেক রোগী থাকে। সব সময় কেউ না কেউ পড়ে থাকে। চারপায়ী কখনো শূন্য থাকে না। কেউ না কেউ রোগী থাকেই। তাহলে আমিও বলব যে, কেউ কিছু করে দিয়েছে। কেউ যাদু করেছে। কেউ পিছনে পড়েছে। আমি তো কখানো বলি না। অসুস্থতা ও সুস্থতা সব আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হয়। কেউ করার দ্বারা কিছু হয় না। একজন মুসলমানের আল্লাহ পাকের উপর ভরসা রাখা উচিত। আমার উপরও যাদু করা হয়েছে। এবং সেটার প্রভাবও আছে। কিন্তু মানুষের উচিত একমাত্র আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করা। তাঁর সাথেই সম্পর্ক স্থাপন করা। যা বলার একমাত্র তাঁকেই বলা। তাঁর ইচ্ছার বিপরীত কোন কাজ না করা।

১৫৬. হিংসুকদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পাওয়ার আমল

জনৈক ব্যক্তি আরয করল যে, হযরত! হিংসুকদের কারণে আমি খুব পেরেশান। আমার অনেক শত্রু ও হিংসুক আছে। সব সময় আতংকে থাকি কেউ আবার ক্ষতি করে ফেলে কি না?

এই প্রেক্ষিতে হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বললেন : প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা সূরা ফাতিহা, সূরা ফালাক ও সূরা নাস তিন তিন বার পড়ে দম করবে।

১৫৭. দৃষ্টি শক্তিশালী হওয়ার একটি আমল

জনৈক ব্যক্তি দৃষ্টির দুর্বলতার অভিযোগ করলেন। হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. এই প্রেক্ষিতে বললেন যে, নামায পড়ার পর দুরূদ শরীফ পাঠ করে আঙুলে দম করে চোখে ফিরিয়ে দিবে। ইনশাআল্লাহ শেফা নসীব হবে এবং দৃষ্টি শক্তিশালী হবে।

১৫৮. তাবীযের দ্বারা উপকার হয়নি তো ব্যস আল্লাহর নিকট দুআ করো

জনৈক ব্যক্তি হযরতের নিকট থেকে তাবীয নিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার এসে আরয করলেন যে, হযরত! তাবীযের দ্বারা উপকার হয়নি। হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বললেন : তাবীযের দ্বারা যখন উপকার হয়নি, তো ব্যস আল্লাহ পাকের নিকট দুআ করো, আসল জিনিস তো হল দু'আ।

يَا لَطِيْفُ যা আল্লাহ তাআলার গুণবাচক একটি নাম। যার অর্থ হল "হে লুতফ ও মেহেরবানীকারী"। এটা পড়ে আল্লাহ পাকের নিকট দু'আ করবে। ইনশাআল্লাহ দু'আ কবূল হবে।

১৫৯. অসুস্থতা নাকি সন্দেহ

একবার হযরতওয়ালা মারাত্মকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন। যদ্দরুন মানুষের আশা খতম হয়ে গেল। হযরত কানপুরে চিকিৎসাধীন ছিলেন। কানপুর শহরের সমস্ত ডাক্তার হযরতের চিকিৎসার ব্যাপারে মনোযোগী ছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ। হযরতের সুস্থতা নসীব হয়। এর আনন্দে মেযবান ছাহেব কানপুরের সমস্ত বড় বড় ডাক্তার ও সম্মানিত ব্যক্তিগণকে দাওয়াত করলেন। হযরতও এখানে তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন। এই দাওয়াতে হযরতের একান্ত ভক্ত অনেক ডাক্তারও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তারদের মাঝখানে দস্তরখানে হযরত আকদাস সমাসীন ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা চলছিল।

একজন ডাক্তার সাহেব আরয করলেন : এমন অনেক রোগী আসে, যাদের আসলে কোন অসুখ নেই। অযথা পেরেশান হয়। অজস্র টাকা-পয়সা নষ্ট করে। অপারগ হয়ে এদের মানসিক চিকিৎসা করতে হয়। এর দ্বারাই এরা সুস্থ হয়।

জনৈক ব্যক্তির অসুস্থতার ব্যাপারে আলোচনা চলছিল। বড় বড় ডাক্তাররা বোর্ড বসিয়েও তার রোগ নিরূপন করতে পারছিলেন না। পরে জানা গেল যে, তার কিছুই না শুধু ম্যালেরিয়া জ্বর হয়েছে।

একজন ডাক্তার সাহেব আরয করলেন যে, এটাও মহান আল্লাহর শান যে, এত সাধারণ অসুখ ম্যালেরিয়া। কিন্তু বড় বড় ডাক্তার সবাই পেরেশান ছিলেন। রোগ ধরতে পারছিলেন না।

দ্বীনী রুচিসম্পন্ন একজন ডাক্তার সাহেব বলছিলেন যে, বান্ধা, আতরাফ ও মধুয়া এলাকার যে সব রোগী আসে, এদের আকীদা বা বিশ্বাস অধিকাংশ ক্ষেত্রে খারাপ হয়। ঐ সব অঞ্চলে খুব মেহনত করা দরকার। তাদের আকীদা বড় অদ্ভূত। শুনে আশ্চর্য লাগে।

এই প্রেক্ষিতে হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. একটি ঘটনা বলেন।

১৬০. একটি ঘটনা

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : নাজীব (হযরতওয়ালার মেঝো ছেলে) এর শশুরের শশুর বড় দ্বীনদার ছিলেন। নামায ও রোযার পাবন্দ ছিলেন। কোন সন্তানাদি ছিল না। অনেক আশার পরে একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করে। বিশ-পঁচিশ বছর বয়সে তার ইন্তিকালও হয়ে যায়। এখন তার অবস্থা

খুব খারাপ। নামায রোযা সব ছেড়ে দিল। এমনকি বলতে লাগল (নাউযুবিল্লাহ) আমার একমাত্র ছেলেকেও আল্লাহ মেরে ফেললেন। এতদিন যাবত আমি নামায পড়ি। অথচ আমার সন্তানকে ছিনিয়ে নেওয়া হল! অদ্ভূত সব কুফরী কথা মুখ দিয়ে বের হচ্ছিল। নাস্তিক হয়ে গিয়েছিলেন। নামায রোযা সব কিছু ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমরা বুঝালে উল্টো ফলাফল হত। এভাবে অনেক দিন পার হল। দীর্ঘদিন পর একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সেও একদিন ঘটনাক্রমে কুঁয়ায় পড়ে গেল। ব্যস সঙ্গে সঙ্গে তিনি আল্লাহর দরবারে সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন। আর বলতে লাগলেন যে, আমার আল্লাহ তাকে বাঁচালেই সে বাঁচতে পারবে। মেয়েটি বেঁচে গেল। সামান্য অংশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় কুঁয়া থেকে বের করা হল।

পরবর্তীতে তিনি বলতেন : আমার আল্লাহ আমার মেয়েকে বাঁচিয়েছেন। আল্লাহ পাকের অনেক শোকর আদায় করতেন। পূর্বে যে সব কুফরী বাক্য বলেছিলেন, সেগুলোর উপর খুব লজ্জিত ছিলেন। অনেক তাওবা-ইসতিগফার করেছেন। সব সময় আল্লাহ পাকের যিকির করতে থাকতেন। সর্বদা হাতে তাসবীহ থাকত। এ অবস্থাতেই আল্লাহ আল্লাহ করতে করতে তাঁর ইন্তিকাল হয়ে যায়। ইন্তিকালের মুহূর্তে তাসবীহ তাঁর সীনার উপর ছিল।

১৬১. বান্দার মুন্নু ভাইয়ের ঘটনা : স্ত্রী নেককার হলে স্বামীকেও নেককার বানিয়ে দেয়

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. এ প্রসঙ্গেই বান্দা শহরের মুন্নু ভাইয়ের কথা আলোচনা করলেন। তাঁর অবস্থাও বড় অদ্ভূত ছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেছিলেন। শুরু থেকেই তিনি আমাকে খুব মান্য করেন। আমার দিকে খেয়াল রাখতেন। তাঁর মধ্যে আল্লাহ তাআলা এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রেখেছেন, যা সম্ভবত বান্দা শহরের আর কারো মধ্যে নেই। বান্দার জামে মসজিদের পুরো ব্যবস্থাপনা তাঁর মাধ্যমেই হত। বান্দায় যে ঈদগাহ তৈরি হয়েছে সেটাও তাঁর চেষ্টা ও কুরবানীর ফলাফল। ব্যস তাঁর মধ্যে কমতি শুধু এটাই ছিল যে, মদ্যপান করতেন। আর জুয়া খেলতেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর হালত ও অবস্থার মধ্যে এমন বিপ্লব সাধিত হয়েছে যে, পাক্কা দ্বীনদার হয়ে গেছেন। হাতে তাসবীহ এসে গিয়েছিল। পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতের সাথে পাবন্দীসহ পড়তেন। নিজ হাতে মসজিদ ঝাড়ু দিতেন। সমস্ত গুনাহ থেকে তাওবা করেছেন। হজ্ব করেছেন। তাঁর অবস্থা অনেক ভালো হয়ে গিয়েছিল।

আর এই সব ছিল তাঁর স্ত্রীর বরকত। তাঁর স্ত্রী খুব দ্বীনদার মহিলা ছিলেন। তাঁর স্ত্রী আমাকে প্রায়ই ডাকতেন এবং আমার মাধ্যমে স্বামীকে নসীহত করাতেন। আমার উপরও তাঁদের অনেক ঋণ আছে। তাঁদের কাছে যাওয়ার কারণে আমাকে অনেক কথাও শুনতে হয়েছে। লোকেরা বলাবলি করত : মালদার, পয়সাওয়ালা! এজন্য নাকি আমি বারবার সেখানে যাই!

আমি চিন্তা করতাম, তারা যা বলার বলুক। আল্লাহ পাকই ভালো জানেন আমি কেন যাই?

দ্বীনের কারণেই তাঁরা আমাকে ডাকত এবং শুধুমাত্র দ্বীনের খাতিরেই আমি তাঁদের নিকট যেতাম। আলহামদুলিল্লাহ। এর ভালো প্রভাব পড়েছে।

১৬২. বান্দা শহরে হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মাদ তায়্যিব ছাহেব রহ. এর আগমন। বিরোধীপক্ষের ফেতনা সৃষ্টির অপচেষ্টা এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্যের অত্যাশ্চর্য ঘটনা

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : প্রথম দিকে আমরা একবার হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মাদ তায়্যিব ছাহেব রহ.কে বান্দায় আগমনের দাওয়াত দিয়েছিলাম। পবিত্র রামাযান মাস ছিল। আমি হাতুরায় ইতিকাফরত ছিলাম। ঐ সময় সংবাদ আসল যে, হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মাদ তায়্যিব ছাহেব রহ. দাওয়াত কবূল করেছেন। এবং শাওয়াল মাসের প্রথম দিকে তাশরীফ আনয়ন করবেন। আমি ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম যে, এত দ্রুত কিভাবে ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হবে? বান্দার মুন্নু ভাই এবং শামীম মুহসিন ছাহেবের আব্বা আমাদের অনেক বড় শুভাকাঙ্খী। তাঁরা যখন জানতে পারলেন তখন আমার নিকট সংবাদ পাঠালেন যে, মাওলানা! আপনি একেবারেই পেরেশান হবেন না। সমস্ত ইন্তিযাম আমরা করে নিব। আপনি কোন ধরনের দুঃশ্চিন্তা করবেন না। ফলে সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হল। যখন ক্বারী ছাহেবের আগমনের সময় নিকটবর্তী হয়ে গেল, তো মুন্নু ভাই যেহেতু অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন, নিজ প্রচেষ্টায় অনেক মানুষকে ক্বারী ছাহেব রহ.কে অভ্যর্থনা দেওয়ার জন্য একত্রিত করলেন। এবং বিশাল মজমাসহ ক্বারী ছাহেবকে আনার জন্য স্টেশন পৌঁছলেন। পুরো ষ্টেশন এবং প্লাটফর্ম কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। দারুণ শানদার অভ্যর্থনা হল। কাউকে অভ্যর্থনা দেওয়ার জন্য এত বড় মজমা বান্দায় কখানো হয়নি। বড় কোন পদমর্যাদাবান কেউ আসলেও এত বড় মজমা হতনা। বান্দার অধিবাসীরা কারো অভ্যর্থনা

উপলক্ষে এত বড় মজমা এই প্রথম দেখেছিল। উপচে পড়া ভীড়ের মধ্য দিয়ে ক্বারী ছাহেব রহ. আগমন করলেন। ফেরেশতা চরিত্রের এই নূরানী মানুষটিকে সবাই দেখছিলেন।

১৬৩. বিদআতী সম্প্রদায়ের বিশৃংখলা সৃষ্টি এবং ব্যর্থ প্রচেষ্টা

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : বান্দার বিদআতীরা যখন জানতে পারল যে, ক্বারী মুহাম্মাদ তায়্যিব ছাহেব দেওবন্দী এখানে আগমন করছেন, তখন তারা খুব শোরগোল পাকাল যে, ওয়াহাবীদের ইমাম আসছে। যে কোনভাবেই হযরতের আগমন ঠেকানোর জন্য তারা আদানুন খেয়ে নামল। থানায় গিয়ে সংবাদ দিল যে, উনি আসলে ফিতনার আশঙ্কা আছে। অন্যান্য অফিসাররা এদের সাথে তাল মিলিয়ে পাবন্দী লাগাতে চেয়েছিল। কিন্তু শামীম মুহসিন সাহেবের আব্বা নিজেই ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। বড় অফিসারদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এজন্য বিরোধীপক্ষ কিছুই করতে পারেনি। বিদআতীরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। খুব শোরগোল করেছে। বড় বড় মানুষের নিকট গিয়ে ধর্না দিয়েছে যে, তার কিছুতেই আসা উচিত নয়। পুলিশ দারোগা সবার সাথে সাক্ষাৎ করেছে। যখন তারা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ করল তখন শামীম মুহসিন সাহেব এর আব্বা এই কৌশল অবলম্বন করলেন যে, সকলকে খানার দাওয়াত দিয়ে দিলেন। দারুণ বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে খুব দিয়েছিলেন। ফলে তিনি বান্দার গণ্যমান্য প্রায় সকলকে দাওয়াত দিয়ে দিলেন। এভাবে তিনি সকলের মুখ বন্ধ করে দিলেন।

এই বিরুদ্ধবাদীরা সবদিক দিয়ে ব্যর্থ হওয়ার পর আরেকটা জঘন্য অপকৌশল অবলম্বন করল। সেটা হল এই যে, গ্রামে গিয়ে গিয়ে প্রোপাগাণ্ডা করল যে, একজন ওহাবী কাফের আসছে! তার সাথে সাক্ষাৎ করতে কেউ যাবে না। তার বক্তব্য কেউ শুনবে না। পুরো এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল। তারা খুব চেষ্টা করল যেন একজন মানুষও জলসায় শরীক হতে না পারে। মুন্নু ভাই যখন এটা জানতে পারলেন তখন নিজের সবগুলো গাড়ি একদম ফ্রি করে দিলেন। ঐ সময় সড়কে তাঁর বারোটি গাড়ি চলত। চতুর্দিকে বাস ছড়িয়ে দিলেন। যে আসতে চায় আসবে। এক টাকাও ভাড়া দিতে হবে না।

এরপরে আর কী? গাড়ি ভরে ভরে মানুষ আসতে লাগল। প্রচুর মানুষ মফস্বল ও গ্রাম থেকে আসল।

এই হতভাগা লোকগুলা আরেকটা ন্যাক্কারজনক কাজ করেছিল এই যে, আসল মুহূর্তে যখন প্রচুর লোক সমাগমও হয়ে গেছে। জামে মসজিদের সমস্ত

পানি যা টাংকীতে ভরা ছিল গোপনে সব পানি প্রবাহিত করে দেয়। এখন পান করার পানি নেই। প্রচণ্ড পেরেশানী হল। এখন কী করা যায়? সঙ্গে সঙ্গে কিছু সংখ্যক মানুষ শহরের ঘর ঘর থেকে দড়ি ও বালতি চেয়ে আনলেন এবং কুঁয়া থেকে পানি উঠানো আরম্ভ করে দিলেন। গ্রাম্য মানুষ ছিলেন। তাই অল্প সময়ের মধ্যেই দেখা গেল যে, পুরো টাংকী ও শূন্য ড্রাম সব ভরে গেছে। এভাবে পানির ব্যবস্থা হয়ে গেল। অতঃপর হযরত ক্বারী তায়্যিব ছাহেব রহ. যে বয়ান করলেন, সেটা বাস্তবেই ছিল অসাধারণ একটি বয়ান। আর ক্বারী তায়্যিব ছাহেব রহ. এর তো প্রতিটি বয়ানই আজীব ও দুর্লভ হত।

১৬৪. হজ্ববাজি

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : শামীম মুহসিন সাহেবের আব্বা দারুণ চৌকষ মানুষ ছিলেন। অত্যন্ত দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। হালাল রিযকের খুব গুরুত্ব ছিল। ভূষির ব্যবসা করতেন, ভূষি বিক্রি করে হজ্ব করতে যেতেন। বলতেন : একেক মানুষের একেক জিনিস এর সখ থাকে। সে এর মধ্যে বাজি লাগায়। এ সখ পুরো করে। কারো কবুতরবাজি, তীরবাজি, ঘুড়িবাজির সখ থাকে এবং সে এর মধ্যে বাজি লাগায়। আমার হল হজ্বের সখ। আমি হজ্বের বাজি লাগাই।

ফলশ্রুতিতে তিনি প্রতি বৎসর হজ্বে যেতেন। শুধু নিজের উপার্জন ভূষি বিক্রি করে।

وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ۝

“আর এ জন্যই প্রতিযোগিতাকারীদের পরস্পর প্রতিযোগিতা করা উচিত।” (সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত ২৬)

এ সমস্ত কথাবার্তা হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বড় বড় ডাক্তারদের মজলিসে নাস্তার দাওয়াতের সময় বলছিলেন। দস্তরখানে বিভিন্ন প্রকারের নেয়ামত সাজানো ছিল। অনুমান করুন কানপুরের বড় বড় ডাক্তার সাহেবদের দাওয়াতে কোন ধরনের ব্যবস্থাপনা হবে। হযরত ছিলেন মজলিস এর মধ্যমনি। সমস্ত মানুষ হযরতের দিকে মুখ করে বসেছিলেন।

১৬৫. বাসযোগে হজ্বের সফর

জনৈক যুবক হযরতের খেদমতে আসল এবং আরয করল যে, আমরা একটি পার্টি বানিয়েছি। বাস বা কারযোগে আমরা হজ্ব করতে যাব।

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বললেন যে, এমনটি করা তো কোন জরুরী বিষয় নয়। কেন অযথা পেরেশানী খরীদ করা হচ্ছে?

প্রতিউত্তরে ঐ যুবক বলল : আমরা আইনগতভাবে যা যা সম্পন্ন করা দরকার ছিল তা করেছি। সরকার হেফাযত করবে।

হযরতওয়ালা রহ. এই প্রেক্ষাপটে বললেন যে, ঠিক আছে। কিন্তু রাস্তায় তো অন্য দেশও পড়বে। কোন প্রশান্তিদায়ক অবস্থা নেই। যে কোন ধরনের দূর্ঘটনার আশঙ্কা বিদ্যমান।

মোদ্দাকথা হল, হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. এই যুবকের ঐ প্রস্তাবটি পসন্দ করেননি। বরং বললেন যে, আচ্ছা এখন চলে যান, পরবর্তীতে কথা বলে নিয়েন।

পরবর্তীতে ঐ ব্যক্তি আমি অধম এর উপস্থিতিতে আর আসেননি।

১৬৬. সুদখোরের ঘটনা

কোন একটি প্রোগ্রামে হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. জামিউল উলূম পটকাপুর কানপুর গমন করেন। শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউনুস ছাহেবও উপস্থিত ছিলেন। হযরত বললেন : আমাদের এলাকার একটি ঘটনা। জনৈক সুদখোর ব্যক্তি খুব বেশি সুদের লেনদেন করত। যখন তার ইন্তিকাল হয়ে গেল। পুরো কবর খনন করার পরও দাফন করার পূর্ব মুহূর্তে জমি নিজে নিজে মিলে যেত। যদ্দরুন মায়্যিতকে আর দাফন করা সম্ভব হচ্ছিল না। পুনরায় কবর খনন করা হলে একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি হত। প্রত্যেকবার এমন হচ্ছিল। কেমন যেন জমিন তাকে কবূল করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে।

সবাই খুব পেরেশান হয়ে পড়ল। ঐ এলাকার বড় আলেম ছিলেন মাওলানা যহূরুল হাসান ছাহেব রহ.। তাঁকে ডাকা হল। তিনি দৃশ্য দেখলেন এবং আল্লাহ পাকের নিকট দু'আ করলেন : হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে যে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, সেটা আমাদেরকে করতে দিন। আপনারই বান্দা। সুতরাং আপনার যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।

এরপর যখন কবর খনন করা হল, এবার কবর খোলাই থাকল এবং এর মধ্যেই একে দাফন করা হল। উপর থেকে মাটি দেওয়া হয়েছে। মাটি দেয়া শেষ হওয়া মাত্রই দেখা গেল যে, তার কবর থেকে হঠাৎ করে ধূঁয়া বের হল। সমস্ত মানুষ এ দৃশ্য দেখেছে। এটা আমাদের অঞ্চলের ঘটনা। এই হল সুদখোরের শাস্তি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে রক্ষা করেন।

১৬৭. সূরা ফাতিহার সংক্ষিপ্ত তাফসীর

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. সূরা ফাতিহার দরস দানের সময় বলেন : বাস্তবিকপক্ষে সূরা ফাতিহা হল একটি দুআ এবং মহান আল্লাহর নিকট দরখাস্ত করা।

আল্লাহ তাআলা এই সূরায় নিজ বান্দাদেরকে দু'আ ও প্রার্থনার পদ্ধতি বলেছেন। যখন কেউ কারো নিকট কিছু চায়, তখন প্রথমে তার প্রশংসা করে।

তাই তো প্রথম আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করা হয়েছে। তাঁর "রাহমান" ও "রাহীম" গুণদ্বয় উল্লেখ করা হয়েছে। বিচার দিবস অর্থাৎ কিয়ামত এর দিন মহান আল্লাহর মালিক ও বিচারক হওয়ার আলোচনা করা হয়েছে।

এ সব হল মহান আল্লাহর প্রশংসা। এরপর বান্দা নিজ সম্পর্ক বয়ান করেছে। অর্থাৎ আপনার সাথে আমাদের সম্পর্কটা কেমন? আপনি আমাদের প্রভু। আমরা আপনারই ইবাদত করি। এবং আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি। আপনি ব্যতীত অন্য কারো নিকট আমরা কোন প্রার্থনা করি না।

আর আপনার নিকট আমরা কী চাই? সরল পথ। আমাদেরকে সরল পথ দেখিয়ে দিন। কোন সরল পথ? আরে ঐ সরল পথই যার উপর চলে মানুষ সফলকাম হয়। আর যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন, তাঁদের সেই পথ আমাদেরকেও দেখিয়ে দিন। আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে কেমন যেন উত্তর হল : আচ্ছা ঐ পথ কামনা করছ? নাও এই কিতাব অর্থাৎ কুরআন শরীফ যা হেদায়েতনামা।

তাই তো ইরশাদ হচ্ছে :

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

"এই গ্রন্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েতস্বরূপ।" (সূরা বাকারাহ, আয়াত ২)

এটাই সরল পথ। এটাকে পড়। এ অনুযায়ী আমল কর। সফলকাম হয়ে যাবে। এই হল সূরা ফাতিহার আয়াতসমূহের মধ্যে পরস্পর যোগসূত্র।

إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ অর্থাৎ আমরা আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি। এখানে نَسْتَعِيْنُ শব্দের مَفْعُوْل এবং متعلّق উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ কোন্ জিনিসের ক্ষেত্রে আমরা সাহায্য চাই? যাতে করে প্রত্যেকটা জিনিসকে ব্যাপক রাখা

যায়। অর্থাৎ আমরা আপনার নিকট প্রতিটি কাজেই সহযোগিতা চাই। ছোট কাজ হোক বা বড়।

আল্লাহ পাকের নিকট দুআ না করা। তাঁর কাছে না চাওয়া বরং এদিক সেদিক মাযারে গিয়ে টক্কর মারা মহান আল্লাহর সাথে বেআদবী ও তাঁকে অসম্মান করা। এটা তো এমনই যে, গোলামী করব আপনার, ইবাদত করব আপনার, কিন্তু প্রার্থনা করব অন্য কারো নিকট!! হাত পাতব অন্যের কাছে!

এর মধ্যে মালিকের প্রকৃতপক্ষেই অসম্মান করা হয়। এর মানে তো এটাই হল যে, আমাদের মনিব এমন যিনি আমাদের কোন কিছু খেয়াল করেন না। এর জন্য অন্যের নিকট হাত প্রসারিত করছে। যাঁর খাযানায় সবকিছু আছে, যিনি আসমান জমিন তথা সবকিছুর বাদশাহ ও মালিক। তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যের দুয়ারে ধর্না দিচ্ছে। বলছে হে বড়পীর! হে গাউছে আযম! আমাকে সাহায্য করুন!! আমরা আপনার সাহায্যের মুখাপেক্ষী। আমাদেরকে ছেলে সন্তান দান করুন। নাউযুবিল্লাহ।

মনে হয় যেন মহান আল্লাহর ভাণ্ডার শূন্য হয়ে গেছে! তাঁর কুদরত খতম হয়ে গেছে। এখন যা কিছু পাওয়া যাবে গাইরুল্লাহ থেকেই পাওয়া যাবে! এজন্যই তো মাজারে যায়। সেখানে চাদর চড়ায়। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা।

ইসলাহে মু'আশারাহ বা সমাজ সংশোধন

১৬৮. বিবাহ একটি ইবাদত, এটাকে ইবাদত মনে করে মসজিদে করা উচিত

বাদ মাগরিব মসজিদে একটি বিবাহ হয়। যার মধ্যে হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. সংক্ষিপ্তভাবে কিছু কথা ইরশাদ করেন।

হযরত বলেন : বিবাহ একটি ইবাদত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

اَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوْا فِي الْمَسَاجِدِ

অর্থাৎ "তোমরা বিবাহের ঘোষণা দাও এবং মসজিদে বিবাহ করো।" (তিরমিযী শরীফ)

এর কারণ এটাই যে, বিবাহ যখন মসজিদে হবে, তখন মসজিদের বাইরে যে সব উল্টোপাল্টা কাজ হয়, সেগুলো মসজিদের মধ্যে হবে না। মসজিদে আড়ম্বরহীনভাবে বিবাহ হয়ে যাবে। যা সাওয়াব-কল্যাণ ও বরকতের উপলক্ষ হবে। বর্তমানে তে লক্ষ লক্ষ টাকা শুধু সাজসজ্জার পিছনেই ব্যয় করে। স্টেজ বানানোর পিছনে খরচ করে মোটা অংকের অর্থ, আলোকসজ্জার ব্যয়। পক্ষান্তরে মসজিদে যদি কোন বিবাহ হয় তাহলে এই সবকিছু থেকে হেফাযত হয়। এছাড়াও অন্যান্য বেহুদা খরচ থেকে বেঁচে থাকা যায়।

কেননা বিবাহ একটি ইবাদত। আর যখন বিবাহকে ইবাদত মনে করে করবে তখন সেটা ইসলামী রীতি-নীতি অনুযায়ী হবে। নানা বা দাদার রীতি অনুযায়ী হবে না যে, তারা এমনটি করতেন। আমাদের বংশে এমন নিয়ম।

বিবাহ যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীতি অনুযায়ী সুন্নাতী পদ্ধতিতে হবে, তখনই সেটা ইবাদত হবে। ইবাদত বলাই হয় ঐ জিনিসকে, যা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরীকা অনুযায়ী হয়।

চৌদ্দশ' বছর পূর্বে যুহরের নামায যত রাকাত পড়া হত, বর্তমানে অত রাকাতই পড়া হয়। এর মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে না। প্রত্যেক মুসলমানের প্রত্যেকটি কাজই ইবাদত হিসেবে গণ্য হয় যদি সেটা সুন্নাত অনুযায়ী হয়।

বিবাহও একটি ইবাদত। এটাকে ইবাদত মনে করে ইবাদতের পদ্ধতিতে মসজিদে করা উচিত। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

১৬৯. আত্মীয়তার সম্পর্ক করার পূর্বে ছেলের মেযাজও দেখা উচিত

জনৈক ব্যক্তি হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. এর নিকট আরয করলেন যে, আমার মেয়েকে তার স্বামী-শাশুড়ী প্রমুখ খুব পেরেশান করে। স্বামীর রাগ খুব বেশি, কথায় কথায় রাগ করে। এমনিতে মেয়ের কোন কষ্ট নেই। আরামে আছে, কষ্ট এটাই যে, স্বামীর রাগ বেশি।

হযরত জিজ্ঞেস করলেন : তাহলে আরাম আর কী? বিল্ডিংয়ে থাকা আর এয়ার কন্ডিশন বাসায় থাকা এটাই কি আরাম? ভালো পানাহার করা এটাই আরাম? আরাম আসলে কিসের নাম? স্বামী বদমেযাজী হলে আরাম আর থাকল কোথায়?

আমি বলতে চাই: এর দ্বারা মেয়েটি শান্তি পাবে না।

আপনারা বিবাহের পূর্বে শুধু একটি জিনিস লক্ষ্য করে থাকেন যে, পানাহারের ব্যবস্থা উন্নত কিনা? বিল্ডিং ভালো কিনা? ব্যবসা বড় কিনা? এসি বাড়ি-গাড়ি আছে কিনা? ব্যস বাহ্যিক টিপটপ দেখে বিবাহ দিয়ে দেয়। ছেলের মন মেযাজ, তার চরিত্র ও আখলাক, মুআমালাত বা লেনদেন চাই যেমনই হোক না কেন, সেটার তাহকীক করেন না। সে ব্যাপারে খোঁজ খবর নেন না। আরে আমি তো বলি : চাই চাটনী রুটি খাওয়াক কিন্তু ব্যবহারটা যেন ভালো করে। স্ত্রীকে কষ্ট না দেয়।

এটা হল তার প্রকৃত আরাম। ভালো খানায় স্ত্রী আরাম পায় না। ভালো ব্যবহারে তারা শান্তি পায়। কিন্তু এসব বিষয় তো আপনারা প্রথমে খেয়াল করেন না। আপনারা দেখেন শুধু অন্ন, বস্ত্র আর বাসস্থান। পরবর্তীতে তাবীয প্রার্থনা করে বেড়ান।

১৭০. নেককার মহিলাদের অবস্থা ও তাঁদের গুণাবলী

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : কোন কোন মহিলার অভ্যাস হল দিনভর টরটর করতে থাকবে অর্থাৎ খুব বকওয়াস করতে থাকবে। কিন্তু যখনই স্বামী আসবে তার সামনে অসুস্থ হয়ে পড়বে। শুয়ে পড়বে। উহ্ উহ্ করতে থাকবে।

হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে, উত্তম নারী হল :

إِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ

অর্থাৎ "স্বামী তার দিকে তাকালে সে স্বামীকে আনন্দিত করে"। (সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস নং ১৬৬৪) অর্থাৎ স্বামীর দিকে এমন সুন্দরভাবে তাকায় যে, স্বামীর অন্তর আনন্দে ভরে যায়। অসুস্থতা এবং বিষণ্ণতার অবস্থাতেও এটাই হওয়া উচিত। অর্থাৎ স্ত্রী অসুস্থ হলেও স্বামীর দিকে এমনভাবে তাকাবে যেন স্বামীর অন্তর আনন্দে ভরে যায়।

হযরত আবু তালহা আনসারী রাযি.-এর ঘটনা প্রসিদ্ধ। তাঁর ছেলে অসুস্থ ছিল। ঐ অসুখেই ইন্তিকাল হয়ে যায়। এই বেচারা মেহনত মজদুরী করতেন। সন্ধ্যায় বাসায় ফেরার পর জিজ্ঞেস করলেন : ছেলে কেমন আছে? স্ত্রী বললেন : অন্য দিনের চেয়ে বেশি আরামে আছে। আরামে ঘুমুচ্ছে। স্বামী নিশ্চিন্ত হলেন। স্বামীকে তিনি তখন জানাননি যে, ছেলের ইন্তিকাল হয়ে গেছে। কারণ হয়ত তিনি পেরেশান হয়ে পড়বেন। কিতাবে তো এ পর্যন্ত লিখেছে যে, ঐ রাত্রে তাদের স্বামী-স্ত্রী সুলভ মিলনও হয়েছে।

আল্লাহর এই বাঁদী কেমন মহিলা ছিলেন? কী ছিল তাঁর অন্তর ও তাঁর ধৈর্য? সকালবেলা স্বামীকে জানালেন। বড় অদ্ভূত ভঙ্গিতে জানালেন। স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আচ্ছা যদি কারো নিকট অন্যের আমানত রাখা থাকে, আর তিনি সেই আমানত ফেরত নিতে চান, তাহলে তার আমনত ফেরত দেয়া উচিত কি উচিত নয়?

হাদীস শরীফে হযরত আবূ তালহার পূরো ঘটনা বর্ণিত আছে। এভাবে বুঝিয়ে পুত্রের ইন্তিকালের সংবাদ দিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ঘটনা জানার পর অনেক দু'আ দিলেন।

কিতাবে লিখেছে যে, ঐ রাতের সহবাসে যে বীর্য স্থির হয়েছে, ঐ বংশে অধঃস্তন সাত পুরুষ পর্যন্ত আল্লাহর ওলী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে।

এ ঘটনার দ্বারা অনেক কিছু জানা গেল। প্রথমত: ধৈর্যের ফলাফল এই পাওয়া গেল যে, তাঁর বংশে আল্লাহর ওলী জন্মগ্রহণ করেছে।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহর বাঁদীর ধৈর্য জানা গেল। এমন দুঃখ-কষ্টের মুহূর্তে কিভাবে নিজ স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। রাত্রে জানালে পুরো রাতের নিদ্রা নষ্ট হত। নেককার নারীদের এই অবস্থায়ই হয়।

হাদীস শরীফে নেককার নারীর বিবরণ দেয়া হয়েছে এভাবে যে, যখন তার স্বামী বাইরে থাকে, তখন তার মাল ও স্বীয় নফসের ব্যাপারে খেয়ানত করে না। এমন নয় যে, স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে কারো সাথে পরকীয়া করল। আবার এমনও যেন না হয় যে, স্বামী বেচারা টাকা উপার্জনের জন্য বাইরে, আর এদিকে স্ত্রী বিভিন্ন নষ্টামীতে লিপ্ত। আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত। ফেরিওয়ালার নিকট থেকে কাপড় কেনায় বিভোর কিংবা মাদুরওয়ালার কাছ থেকে মাদুর ক্রয়ে মাশগুল। ওদিকে বেচারা স্বামী ঋণের মধ্যে ডুবে আছে। আর স্ত্রী নিজের জন্য অলংকারের পর অলংকার বানাচ্ছে। সে সৎ স্ত্রী নয়।

১৭১. নারী বদদ্বীন হলে পুরো ঘর বদদ্বীন হয়ে যাবে

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : জনৈক তাহসীলদার সাহেব খুব দ্বীনদার ছিলেন। ঘুষ একেবারেই নিতেন না। ঘটনাক্রমে তার চাপরাসীর এখানে বিবাহ অনুষ্ঠান ছিল। সে তাহসীলদার সাহেবের পিছনে লাগল যে, আপনার বেগম সাহেবাকে আমার এখানে বিবাহে পাঠিয়ে দিবেন। এটা আমার জন্য অনেক বড় সম্মানের ব্যাপার হবে।

এদিকে ঐ তাহসীলদার সাহেব নিজ স্ত্রীকে কারো বাসায় পাঠাতেন না। খুব সাদাসিধা জীবন যাপন করতেন। কাপড়ও খুব সাধারণ পরিধান করতেন।

চাপরাসীর অত্যাধিক পীড়াপীড়ির কারণে সেখানে স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিলেন। বেগম সাহেবা সেখানে পৌঁছে দেখলেন যে, মহিলারা একজনের থেকে আরেকজন উন্নত বস্ত্র ও অলংকারে সুসজ্জিত। অথচ এই তাহসীলদার সাহেবের স্ত্রীর কাপড় ছিল একেবারেই অনাড়ম্বর। তিনি খুব লজ্জিত হলেন। ঘরে ফিরে এসে নিজ স্বামীর উপর খুব ক্রুদ্ধ হলেন এবং বললেন যে, আপনি আমাকে অপদস্থ করলেন। লাঞ্ছিত করলেন। সেখানে দেখলাম একজন সামান্য চাপরাসী যে আপনার অধীনে চাকুরী করে, তার স্ত্রীর কাপড় চোপড় ও অলংকারসমূহ কত উন্নত! তাহসীলদার সাহেব বুঝালেন যে, যতটুকু বেতন

পাই সেটা দিয়েই সংসার চালাই। বেগম সাহেবা বললেন যে, তার বেতন তো আপনার থেকেও কম। তিনি বললেন : আরে সে তো ঘুষ গ্রহণ করে। হারাম খায়। তখন স্ত্রী বলল। তবে কি আপনার জন্য এর দরওয়াযা বন্ধ? আপনি কেন নেন না? তাহসীলদার সাহেব অত বড় দ্বীনদার তো আর ছিলেন না। এই স্ত্রী এমনভাবে তার পিছনে লাগল যে, শেষ পর্যন্ত ঐ তাহসীলদার সাহেবও ঘুষ নেয়া আরম্ভ করলেন!!

হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে : মহিলারা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী মানুষের আকলের উপরও প্রবল হয়ে যায়।

অতঃপর হযরতওয়ালা বলেন : মহিলাদের কথা মানা, তাদের আব্দার পূর্ণ করা নাজায়েয নয়। তাদের বৈধ আব্দার পূর্ণ করা উচিত। তাদের সুখ-শান্তির প্রতিও লক্ষ্য রাখা চাই।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيْ

অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে নিজ স্ত্রীর নিকট উত্তম আর আমি আমার স্ত্রীদের নিকট সর্বোত্তম স্বামী"। (তিরমিযী শরীফ)

মোটকথা, আল্লাহ পাক সামর্থ দান করলে তাদের আরামের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। ব্যস শুধু এতটুকু দেখবে যে, এর মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের নাফরমানী তো হচ্ছে না? শরীয়তের বিপরীত তো হচ্ছে না? যদি শরীয়তপরিপন্থী হয়, তাহলে এ জাতীয় আব্দার কখনো পুরো করবে না। এমন মুহূর্তেই বান্দার পরীক্ষা হয় যে, স্ত্রী নাজায়েয জিনিসের আব্দার করলে তখন স্বামী কোন্‌টাকে প্রাধান্য দেয়? যদি আল্লাহ পাকের হুকুমকে প্রাধান্য দেয় তাহলে সফল নতুবা ব্যর্থ।

১৭২. লেনদেনের শুদ্ধতা এবং ব্যবস্থাপনাগত ব্যাপারে আম্বিয়ায়ে কেরামের আ. শিক্ষা

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ:) শুধু মাসআলা-মাসায়িল বয়ান করেন এমন নন বরং তাঁরা মানুষের লেনদেনও শুদ্ধ করেন। এমন কৌশল বাতলে দেন যা দ্বারা অন্যের কষ্ট না হয়।

একবার হযরত মূসা আ. লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন। যদ্দরুন বারোটি ঝর্ণা উৎলে বের হল। যেহেতু বনী ইসরাঈলের বারোটি গোত্র ছিল। এ জন্য

বারোটি ঘাট হয়েছে। যাতে করে প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ ঘাটে পানি পান করতে পারে। প্রত্যেক গোত্রের ব্যবস্থাপনা ভিন্ন ভিন্ন ছিল। যাতে করে পরস্পর ঝগড়া বিবাদ না হয়।

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, ব্যবস্থাপনাগত ব্যাপারে যথাসম্ভব প্রতিটি বস্তু পৃথক পৃথক হওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ ভাই কয়েকজন হলে সবাইকে এক বাসায় রাখবে না। সম্ভব হলে সবার ঘর আলাদা আলাদা করে দিবে।

আর শুধু এতটুকু যথেষ্ট নয় যে, সবার কামরা পৃথক করে দেওয়া হবে। আর ঘরের রাস্তা, বাইতুল খালা, গোসলখানা সব যৌথ। কেননা এগুলোর মধ্যেই ঝগড়া বেশি হয়। সম্ভব হলে প্রত্যেকের দরওয়াযাই পৃথক হবে। কোন অপারগতা থাকলে সেটা ভিন্ন কথা। পিতার উচিত এটার ফিকির করা।

এমনিভাবে মাদরাসার মুহতামিম ও ব্যবস্থাপকের উচিত ছাত্রদের জন্য এমন ব্যবস্থাপনা রাখা, যদ্দরুন পরস্পর মতভেদ না হয়। উদাহরণস্বরূপ কিতাব বণ্টন করার সময় সম্ভব হলে প্রত্যেক ছেলেকে পৃথক পৃথক কিতাব দিবে। এমন নয় যে এক কিতাবে পাঁচজন শরীক হল। এতে পেরেশানী হয়।

অপারগতা থাকলে সেটা ভিন্ন কথা। আম্বিয়ায়ে কেরাম আ. মানুষের মুআমালাতও সংশোধন করতেন। যার মধ্যে এইসব সূরতও অন্তর্ভুক্ত।

১৭৩. মায়ের পর খালার গুরুত্ব

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : মায়ের পর সন্তানদের সাথে যে সম্পর্ক খালার হয় সেটা আর কারো হয় না। খালা নিজ ভাগিনাকে অনেক মহব্বত করে। আমার দুজন খালা ছিলেন। আপন কোন খালা ছিলেন না। তাঁরা আমার আম্মার আপন চাচাতো বোন ছিলেন। যাঁরা আমাকে খুব মহব্বত করতেন। অনেক দূর থেকে সফর করে শুধু আমাকে দেখা ও স্বাস্থ্যের খবর নেয়ার জন্য আসতেন। দু চার দিন থেকে চলে যেতেন। তখন আমি একদম শিশু ছিলাম, আমার আম্মাও আমাকে অত আদর করেননি। যতটুকু আমার খালা করেছেন, কোলে নিয়ে হাতে পায়ে চুমু খেতেন।

একবার আমি তাঁকে স্বপ্নেও দেখেছি। দেখলাম যে, কিয়ামত অত্যাসন্ন। হাশরের ময়দান কায়িম হয়ে গেছে। আমার খালাও সেখানে আছেন। আমি তাঁকে বললাম যে, কিয়ামত এসে গেছে। বললেন যে, আচ্ছা কিয়ামত এসে গেছে? আমাকেও সাথে নিয়ে চল। আমি বললাম, আসুন চলুন আমার সাথে।

১৭৪. আত্মীয় স্বজনের হক

একবার হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. মারাত্মক অসুস্থ ছিলেন। বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। গ্রামে এক বৃদ্ধা মহিলার ইন্তিকাল হয়ে গেল। যিনি দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়াও ছিলেন। হযরত সেখানে যেতে চাচ্ছিলেন। হযরতের ছেলেরা হযরতের অসুস্থতা এবং দুর্বলতা দেখে পরামর্শ দিলেন যে, আপনি যাবেন না। আমাদের মধ্যে কেউ চলে যাবে। আপনার যাওয়া কোন জরুরী বিষয় তো আর নয়।

হযরত এ কথায় খুব অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন যে, তোমাদের আম্মার থেকেও বেশি নিকটবর্তী তার আর কেউ ছিল কি? কত গভীর সম্পর্ক ছিল! তোমরা এ সব ব্যাপারে কিছুই খেয়াল করো না। আমার পরও তোমরা এমনিই করবে। সমস্ত সম্পর্ক খতম করে দিবে। তোমাদের থেকে এটাই আশা।

১৭৫. গরীব আত্মীয় স্বজনের গুরুত্ব

বারুলী থানায় হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. এর একজন আত্মীয়র ইন্তিকাল হয়ে গেল। যিনি পরিচয়বিমুখ ও গরীব মানুষ ছিলেন। তাঁর ইন্তিকালের সংবাদ হযরত বিলম্বে পেয়েছিলেন। হযরত তখন সফরে ছিলেন। ফেরার পর নিজ ছেলেদেরকে বললেন যে, তোমরা আমাকে জানাওনি কেন? আমি না হয় ছিলাম না। তোমরা তো ছিলে। তাঁর জানাযায় শরীক হতে পারতে। তোমরা কেন যাওনি? যাই হোক আজকে আমি সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে যাব। কিন্তু ঐ দিন যাওয়ার ব্যাপারটা হত অন্য রকম। জানাযাতেও শরীক হতে পারতাম। তোমাদের কাছ থেকে এটাই আশা। মুখ দেখে আচরণ কর। বেচারা গরীব মানুষ ছিল, তাই যাওনি। কোন সম্পদশালী ব্যক্তি হলে দৌড়ে যেতে।

সংকলকের কথা : হযরতওয়ালা রহ. নিজ সন্তানদের তারবিয়্যাত তথা উত্তম শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে এমনটি বলেছেন। নতুবা হযরতের ছেলেদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, মাশাআল্লাহ এ সব ব্যাপারে তাঁরা খুব লক্ষ রাখেন। বরং প্রয়োজন অনুসারে উপযুক্ত ব্যক্তিদের আর্থিক সহযোগিতাও করেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে আরো উন্নতি দান করুন। আমীন!

১৭৬. দ্বীনদার ও গরীব মানুষের মূল্যায়ন এবং তাঁদের জানাযায় অংশগ্রহণের চিন্তা

বারূলীর বাসিন্দা হযরতের মহব্বতের একজনের ইন্তিকাল হয়ে গেল। তাঁর ইন্তিকালের সংবাদ হযরত দেরীতে পেয়েছিলেন। হযরত বললেন : গতকাল আমাকে কেন সংবাদ দাওনি? তাহলে আমি গতকালই বারূলী হয়ে আসতাম। গতকাল যাওয়ার ব্যাপারটাই হত অন্য রকম। এত ভালো একজন মানুষের জানাযাতেও আমি শরীক হতে পারলাম না, মাহরূমীর কথা। গ্রাম থেকেও কেউ যায়নি। শুধু দুই একজন গিয়েছে। কেননা ঐ বেচারা গরীব ছিল। নিঃস্ব ছিল। কোন পয়সাওয়ালা হলে গাড়ি ভরে ভরে যেত। মহিলারা বোরকা পরিধান করে প্রস্তুত হয়ে যেত।

নিজ সন্তানদেরকে বললেন যে, তোমরাও মালদারদের মুখ দেখ? কিছুই না। দ্বীন থাকলই না। লোকেরা শুধু পয়সা দেখে। পয়সার পিছনে ছুটে। তোমাদের যাওয়া উচিত ছিল। বেচারা কত ভালো মানুষ ছিল। একদম প্রাথমিক যুগে তিনি আমাকে সঙ্গ দিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত সঙ্গ দিয়েছেন। চল্লিশ বছর পর্যন্ত তিনি দ্বীনের তালীম দিয়েছেন। যখন যা পেয়েছেন পানাহার করেছেন, না পেলে উপোস থেকেছেন।

শুরু শুরুতে ভবানীপুরে মকতব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সেখানে পড়াতেন। মাসিক বেতন ছিল মাত্র আড়াই আনা। যাতে তেল সাবান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যায়। এটাও স্থানীয়রা ব্যবস্থা করতে পারেনি। এই হল বান্দাহ এলাকা। পরে এ মকতবও ভেঙ্গে যায়।

১৭৭. নতুন সভ্যতার দুটি জিনিস আমার খুব পসন্দ

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. কানপুরে জনৈক ব্যক্তির বাড়িতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। খাওয়ার সময় যখন হাত ধোয়ার পালা আসল, তখন হযরত বললেন যে, নতুন সভ্যতায় দুটো জিনিস আমার পসন্দ। একটা হল বাথরুমের ফ্লাশ সিস্টেম। আরেকটা হল হাত ধোয়ার এই নল (ওয়াশিংবেসিন)। গ্রামের বাথরুমগুলোতে খুব দুর্গন্ধ হয়। পায়খানা জমা হতে থাকে। মাছি ভনভন করে। ভিতরে যেতে মনে চায় না। বাধ্য হয়ে যেতে হয়। পক্ষান্তরে নতুন নতুন যে সব বাথরুম আবিষ্কৃত হচ্ছে, সেগুলো একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দুর্গন্ধ হয় না। আবার অনেকের তবিয়তই এমন যে, দুর্গন্ধ থাকলে তার পায়খানাই হয় না।

হযরত সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. এরও একই মেযাজ। এ জন্যই উনি তাকিয়াতে (হযরতের গ্রামের বাড়ি) পায়খানা করার জন্য জঙ্গলে চলে যান। আমরা যখন তাকিয়ায় যেতাম, তখন আমরাও জঙ্গলে চলে যেতাম। ঘরের মধ্যে বাইতুল খালা শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য ছিল। পুরুষ সব বাইরে যেত। কিন্তু পরবর্তীতে যখন মেহমানদের আসা যাওয়া শুরু হয়ে গেল তখন ভিতরেই ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

অন্য এক সময়ে আমি অধম সংকলক আরয করলাম, হযরত! আপনি বলেছেন নতুন সভ্যতায় দুটি জিনিস আপনার পসন্দ। ১. বাথরুমের ফ্লাশার ২. ওয়াশিংবেসিন। তো এর মধ্যে কী সৌন্দর্য আছে? হযরত বললেন : প্রথমতঃ হাত ধোয়ার জন্য সর্বত্র পেয়ালা পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ এর মধ্যে কিছু না কিছু ছিঁটা পড়েই যায়। তৃতীয়তঃ অনেক সময় হাত পেয়ালায় লেগে যায়। চতুর্থতঃ হাত ধোয়ানেওয়ালা মাত্র একজন হলে তার যথেষ্ট কষ্টও হয়। পঞ্চমতঃ অনেক সময় ঝুঁকে হাত ধুতে হয়। অথচ ঐ কল বা ওয়াশিং বেসিনে খুব সহজে হাত ধোয়া যায়। ছিঁটা পড়ে না। সমস্ত পানি নিচে চলে যায়। সহজে হাত ধোয়া যায়। ঝুঁকতে হয় না।

১৭৮. ঘরের দরওয়াযায় কলিং বেল লাগানোর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

অধম সংকলক একবার আরয করলাম যে, নতুন আবিস্কারসমূহের মধ্যে ঘণ্টি বা কলিংবেলের উপকারিতার কথা হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী ছাহেব রহ. মাআরিফুল কুরআনে বয়ান করেছেন। এবং এটাকে খুব পসন্দ করেছেন। إستيذان বা অনুমতি নিয়ে ভিতের প্রবেশের যে বিধান আছে এর মাধ্যমে ঐ বিধানের উপর পুরোপুরি আমল হয়ে যায়।

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. এটাকে পসন্দ করেন। বললেন যে, এর দ্বারা অনুমতি প্রার্থনার সুন্নাতের উপর আমল হয়ে যাবে। কলিংবেলের দ্বিতীয় আরেকটি উপকার এই যে, রাত্রিবেলা যাকে জাগানো দরকার শুধু সেই জাগবে। কেননা বেলের আওয়ায ভিতরে পৌঁছে যাবে। শোরগোল হবে না এবং মানুষের নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটবে না।

১৭৯. দ্বীন এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কহীনতার পরিণাম

জালালাইন শরীফাইনের দরস দেয়ার সময় হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : জাহেলী যুগে কেউ কেউ পেশাই বানিয়ে নিয়েছিল দাসী ক্রয় করা

এবং তাদের মাধ্যমে ব্যভিচার করানো। এর ফিস নিজেই নিত। জনৈক ব্যক্তি কয়েকটা দাসী ক্রয় করল এবং প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ফিস নির্ধারণ করল। ঐ দাসীর ফিস এত! সেই দাসীর ফিত এত!

আসলে যখন মানুষ আল্লাহ তাআলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন তার এ অবস্থাই হয়। তার কোন কাজই সুন্দর হয় না। সে অন্ধকারে হাবুডুবু খায়। কখনো লাকড়ী ধরে আবার কখনো ধরে সাপ। যদি কেউ বিষকে আরোগ্য মনে করে, তাহলে এর চিকিৎসা কী?

আল্লাহ পাক বলেন :

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ ؕ

অর্থাৎ "তোমরা ঐ সব লোকের মতো হয় না। যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত কর দিয়েছেন।"

(সূরা হাশর, আয়াত ১৯)

১৮০. অত্যাচারী ছেলে অত্যাচারিত মা

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. এর নিকট গ্রাম থেকে একজন মহিলা আসলেন। চরম দুর্দশাগ্রস্ত পেরেশান হাল ছিলেন।

হযরত তাঁকে সাহায্য করলেন। আর ঐ গ্রামেরই একটা ছেলে যে এই মাদরাসায় পড়ত, হযরত তাকে ডেকে এনে তার সাথে এ মহিলাকে গ্রামে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

হযরত বললেন : এ মহিলাটি দুর্দশাগ্রস্ত। তার শত বিঘা জমিন আছে। কিন্তু এর ছেলে একে মারে। মেরে ঘর থেকে বের করে দেয়। তাই বেচারী এখানে এসেছে।

হাদীসে পাকে কিয়ামতের আলামতের বর্ণনা প্রসঙ্গে এসেছে :

اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا

অর্থাৎ "নারী তার প্রভুকে জন্ম দিবে"। (তিরমিযী শরীফ)

ব্যাখ্যাকারগণ এ হাদীসের একটি ব্যাখ্যা এটাও লিখেছেন যে, সন্তানগণ অবাধ্য ও অত্যাচারী হবে। ছেলে মনিব হবে। মাকে দাসী বানাবে। হযরত ঐ তালিবে ইলমকে বললেন : গ্রামে পৌঁছে দিয়ে আস। তোমার বিবাহও ঐ গ্রামেই হওয়ার পথে। একটু কাপড় পরিবর্তন করে ভালো কাপড় পরে যাও।

১৮১. মেহমানদের জন্য নাস্তা বা খানায় অন্যকে শরীক করা জায়েয নেই

অন্য রাজ্যের একজন সম্মানিত আলেম হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. এর খেদমতে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হলেন।

হযরত তার শান অনুযায়ী বিশেষ নাস্তার ব্যবস্থা করলেন। নাস্তায় মিস্টান্নও রাখলেন।

এদিকে ঐ মেহমান তার আশেপাশে উপবিষ্ট লোকদেরকে যাদের মধ্যে কয়েকজন তালিবে ইলমও ছিলেন নাস্তায় শরীক হতে বললেন। পরিশেষে খানা নিজে খেলেন এবং আশেপাশে যারা বসা ছিল তাদের মধ্যে মিষ্টি বণ্টন করে দিলেন।

অধম সংকলক তার এ কাজের ব্যাপারে তার মনোযোগ আকর্ষণ করে বললাম যে, মেহমানের জন্য কাউকে নাস্তায় বা খানায় শরীক করা বা সেখান থেকে খাওয়ানো জায়েয নেই। একথা শুনে ঐ মেহমান অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন যে, আমার সাথে মাওলানার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তুমি কী জান?

আমি অধম হযরতওয়ালার নিকট এ বিষয়টি আলোচনা করলে হযরত মেহমানের এ কর্মকাণ্ডের উপর খুব অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন যে, পড়ালেখা করা মানুষ। কেউ তার নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করুক যে, মেহমানের জন্য অন্যকে খাওয়ানো জায়েয আছে কি নেই? এখনি বলে দিলে অসন্তুষ্ট হবে। খারাপ লাগবে।

১৮২. জনৈক মেহমানকে সতর্ক করার চিত্তাকর্ষক ঘটনা

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. এর নিকট বোম্বাই থেকে একজন মেহমান আসলেন। যাকে দেখে বাহ্যত: আলেম এবং কোন মসজিদের ইমাম ও খতীব মনে হচ্ছিল। বয়স্ক ছিলেন। দাড়ির চুল কিছু কিছু পেকেছে। এসে হযরতওয়ালার সাথে লম্বা সময় পর্যন্ত কথাবার্তা বললেন। হযরতও ভদ্রতার খাতিরে তার সাথে কথাবার্তা বলতে থাকলেন। অতঃপর ঐ মেহমান বললেন : হযরত! আপনি বোম্বাই তাশরীফ আনুন। এ ব্যাপারে তিনি খুব পীড়াপীড়ি করলেন। তার পীড়াপীড়ির কারণে হযরত বললেন : সামনে কখানো বোম্বাই গেলে তোমার ওখানে মেহমান হব। তিনি বললেন : হযরত! আপনি আমাকে পূর্ব থেকেই জানিয়ে দিবেন যে, আমি অমুক তারিখে আসছি। আমার ঠিকানা নোট করে নিন। আমি আপনাকে আমার ফোন নম্বর দিচ্ছি।

তার কথাবার্তার এ ধরন হযরতের কাছে ভালো লাগেনি। কিন্তু হযরত কিছু বললেন না। অথচ ঐ মেহমান ছিলেন হযরতের ছাত্র।

হযরত আমি অধমকে বললেন : একে নিয়ে যাও। খানা খাওয়াও। অধম তাকে নিয়ে গেল। রাস্তায় অত্যন্ত আদব ও বিনয়ের সাথে আরয করলাম যে, বড়দের সাথে পীড়াপীড়ি করাটা বে আদবী। দরখাস্ত করতে কোন সমস্যা নেই। এত বেশি পীড়াপীড়ি করা ঠিক নয়। এবং তাদেরকে কোন কাজের ভার দেওয়াটাও একটা অনুচিত কাজ। প্রয়োজন আমার আর ফোন করবেন হযরত। এটা কেমন কথা? হযরত একজন মহাব্যস্ত মানুষ। তাঁকে মনে রাখার দায়িত্ব দেয়া চরম পর্যায়ের বেআদবী।

এ জাতীয় কথাবার্তা আমি অধম অত্যন্ত আদবের সাথে তাঁর নিকট আরয করলাম। ব্যস এতটুকু বলা মাত্রই তিনি রাগে ফেটে পড়লেন। আমাকে বললেন : আপনি জানেন না আমি কে? দস্তরখান থেকে এই বলে উঠে গেলেন যে, আমি খানা খাব না। হযরতওয়ালা বান্দাভীর মনে যেন কষ্ট না লাগে শুধু এ জন্য আমি অধম তাকে খোশামোদ করতে থাকলাম যে, আসলেই আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। আমার ভুল ক্ষমা করে দিন। খানা তো খেয়ে নিন। কিন্তু যতই আমি কাকুতি মিনতি আর অনুনয় বিনয় করে খানা খাওয়ার অনুরোধ করছিলাম। ততই তার অভিমান বাড়ছিল। বললেন যে, না আমি খানা খাব না। আপনি জানেন না হযরতের সাথে আমার কত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

মোটকথা আমি ক্ষমা চাওয়ার পরও তিনি দস্তরখান থেকে উঠে চলে গেলেন।

ফলশ্রুতিতে আমি পুরো ঘটনা হযরতকে বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দিলাম। হযরত জালালী মেযাজে এসে বললেন, তাকে ডাক। সে কোথায়? আসার পর হযরত বললেন : তোমার কাছে আমাকে ফোন করতে হবে? তোমার কি কোন সভ্যতা জ্ঞান নেই? এই বেচারা তোমাকে সভ্যতা শেখান আর তুমি এটার এমন অবমূল্যায়ন করলে? তুমি কি জান সে কে? তুমি তো মনে করেছ সে মাদরাসার চাপরাসী বা সামান্য কর্মচারী। না না, বরং তিনি মুদাররিস। আলেম, মাদরাসার মুফতী, তুমি তাঁকে চিনতে পারনি। তুমি আমার এখান থেকে চলে যাও। আমি তোমাকে খানা খাওয়াতে চাই না। তোমার সাথে আমি কথাও বলব না।

এখন ঐ মেহমান খুব পেরেশান হয়ে হযরতের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করল। হযরত মাফ করে দিলেন। এরপর হযরতের নির্দেশে আমি তাকে খানা খাওয়ালাম এবং তিনি বিদায় নিলেন।

১৮৩. মেহমানদেরকে খাওয়ানোর জন্য অন্যদের থেকে খানা আনা

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. এর নিকট মাদরাসার কয়েকজন বিশেষ মেহমান এসে পড়লেন। তাঁদের আপ্যায়নের জন্য যে মানের খানা হযরত খাওয়াতে চাচ্ছিলেন বিদ্যমান ছিল না। আর তখন কোন ব্যবস্থা করাও সম্ভব ছিল না।

হযরতের অভ্যাস হল এ জাতীয় পরিস্থিতিতে অকৃত্রিমভাবে নিজের বিশেষ লোকদের নিকট থেকে খানা আনিয়ে নেন।

আমি অধম এ পরিস্থিতিতেও আরয করলাম যে, অমুক উস্তাদের ওখানে গোশত রান্না করা হয়েছে। হযরত বললেন : প্রত্যেকের ঘর থেকে আমি অল্প অল্প করে নেই। পরে কোন বাহানায় সেটার ক্ষতিপূরণও করে দেই।

একজন স্নেহাস্পদ উস্তাযের নিকট থেকে তরকারী আনিয়ে ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে মেহমানখানায় ইন্তিযাম হয়ে গেলে হযরত ঐ তরকারী ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। এবং বললেন যে, প্রথমে প্রয়োজন ছিল। এখন আর প্রয়োজন নেই। আরো বললেন যে, মানুষের অনুগ্রহ গ্রহণ থেকে যথাসম্ভব বেঁচে থাকবে। অপারগ হলে সেটা ভিন্ন কথা।

মোটকথা প্রয়োজনের সময় অন্য কারো নিকট থেকে খানা নিতে কোন সমস্যা নেই। তবে যথাসম্ভব অন্যের অনুগ্রহ গ্রহণ করা থেকে সতর্ক থাকবে।

১৮৪. মাওলানা মুযাফ্ফার হুসাইন কান্ধলভী রহ.ও মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. এর সরলতা ও অকৃত্রিমতা

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : হযরত মাওলানা মুযাফ্ফার হুসাইন কান্ধলভী রহ. একদম সহজ সরল মানুষ ছিলেন। পদব্রজে সফর করতেন। সফরের ইচ্ছা করলে তাহাজ্জুদের পর ফজরের পূর্বেই সফর আরম্ভ করে দিতেন। একবার সফর করে গাঙ্গুহে হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ ছাহেব রহ. এর নিকট গেলেন। হযরত গাঙ্গুহী রহ. বয়সে তাঁর থেকে ছোট।

হযরত মাওলানা বললেন, মৌলভী রশীদ আহমাদ! আমাকে ফজরের পূর্বে সফর করতে হবে। হযরত গাঙ্গুহী রহ. উত্তরে বললেন : জ্বী হযরত! ঐ সময়ই নাস্তা তৈরী হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। বললেন যে, নাস্তা তৈরি কর না। বাসি খানা যেটা আছে সেটাই দিয়ে দিও। গাঙ্গুহী রহ. বললেন : ঠিক আছে। এরপর তাহাজ্জুদের সময় হযরত মাওলানা একটি পেয়ালায় ডাল ও শুকনো রুটি নিয়ে আসলেন। হযরত মাওলানা মুযাফফার হুসাইন ছাহেব রহ. বললেন : এখন খাবনা। খেতে সময় লাগবে। নিয়ে যাব। সামনে গিয়ে খেয়ে নিব। মাওলানা বললেন : খুব ভাল কথা। পেয়ালাতেই ডাল দিতে চাইলে কান্ধলভী রহ. বললেন : পেয়ালায় নয়। মাসকলাইয়ের ডাল। ঐ রুটিতেই রেখে নিব। অতঃপর সেটাকে রুটিতে রেখে বেঁধে তাশরীফ নিয়ে গেলেন।

যখন হাকীম ছাহেবের রহ. নিকট পৌঁছলেন তখন তাকে বললেন যে, ভাই মৌলভী রশীদ আহমাদ খুব ভাল মানুষ। হাকীম ছাহেব বললেন : জ্বী বাস্তবেই মৌলভী রশীদ আহমাদ খুব ভালো মানুষ। দ্বিতীয়বার মাওলানা বললেন : মৌলভী রশীদ আহমাদ খুব ভালো মানুষ। হাকীম ছাহেব বললেন : জ্বী খুব ভাল মানুষ। হযরত মাওলানা তৃতীয়বার বললেন : মৌলভী রশীদ আহমাদ খুব ভালো মানুষ। তখন হাকীম ছাহেব আরয করলেন যে, তাঁর মধ্যে আপনি বিশেষ এমন কী গুণ দেখেছেন যে, বারবার তাঁর কথা বলছেন? আমিও তো বলছি : তিনি খুব ভালো মানুষ।

হযরত মাওলানা বললেন : আমি তাঁকে বলেছিলাম আমাকে ফজরের নামাযের পূর্বে রওয়ানা দিতে হবে। তখন তিনি বলেছিলেন যে, ঠিক আছে। আটকানোর জন্য পীড়াপীড়ি করেননি। আমি বললাম : ছাহেব! তাজা নাস্তা তৈরী কর না। বাসি যেটা রাখা আছে সেটাই নিয়ে আস। বললেন : খুব ভালো। আমি বললাম : খাব না। সঙ্গে করে নিয়ে যাব। বললেন : খুব ভালো। কোন কথার উপর পীড়াপীড়ি করেননি। প্রতিটি প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন। কোন কৃত্রিমতার আশ্রয় নেননি। পীড়াপীড়ি করেননি। তিনি খুব ভাল মানুষ।

১৮৫. অকৃত্রিম ও সাদাসিধে সামাজিকতা

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. এর খেদমতে কয়েকজন সম্মানিত মেহমান উপস্থিত হয়েছিলেন। সকালে দ্রুত তাঁদের ফেরার কথা ছিল। নাস্তার ব্যবস্থা করা হলে বিলম্ব হত। এদিকে এলাহাবাদ যাওয়ার জন্য সকালবেলার বাসই অধিক উপযুক্ত ছিল। এরপরের বাসগুলোতে ভীড় বেশি হয়।

হযরত বললেন : উত্তম এটাই যে সকাল সাড়ে ছয়টার বাসে চলে যাওয়া। নতুবা পরের বাসগুলো অনেক সময় নেয়। স্থানে স্থানে থামে। বড় পেরেশানী হয়।

হযরত বললেন : নাস্তার ইন্তিযাম করতে সময় লাগবে। যেটা বাসি রাখা আছে সেটাই করে নাও। আমি তাজা নাস্তা রান্না করাচ্ছিলাম। কিন্তু এই চক্করে পড়লে বাস ছুটে যাবে।

হযরত আপেল, বরফী এবং সন্ধ্যাবেলার রুটি ও তরকারী সামনে রেখে দিলেন। মেহমানরাও খুব আগ্রহের সাথে খেলেন। হযরত ঐ মেহমানদেরকে ১৫ রূপী পথে নাস্তা করার জন্য দিলেন।

১৮৬. কানাআত বা অল্পে তুষ্টি

এজন মেহমান হযরতের খেদমতে বাইআতের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হলেন। হযরত তাকে বাইআত করে নিলেন। কিছু হেদায়াত দিলেন। এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আপনার ফেরার কী ব্যবস্থা? কবে ফিরে যাবেন? বললেন যে, সকালে কানপুরগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেনে চলে যাব। হযরত বললেন : বাসে কেন যাবেন না? বাস তো অনেক যায়। তিনি বললেন : হযরত! বাসে ভাড়া অনেক বেশি লাগে। প্রায় দুইগুণ পার্থক্য হয়ে যায়। প্যাসেঞ্জারে গেলে ভাড়া অনেক কম লাগবে। হযরত মুচকি হাসি দিয়ে বললেন : আচ্ছা, আপনিও এটা চিন্তা করেন? অতঃপর বললেন : মুসলমানদের এমনই চিন্তা করা উচিত। এ সব ব্যাপারে খুব অল্প সংখ্যক মুসলমানই চিন্তা করে। বাসে গেলে সময় কম লাগলেও পয়সা লাগবে বেশি। মুসলমানদের সময়েরও কদর করা দরকার এবং সময়ের মতো পয়সারও কদর করা দরকার। অবশ্য সময় না থাকলে সেটা ভিন্ন কথা।

১৮৭. ঈদে মিলাদুন্নবীর নামে জলসা জুলূস ও সাজসজ্জা

একবার হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. এর খেদমতে বান্দা শহরের একজন সম্মানিত বয়স্ক প্রভাবশালী ব্যক্তি আসলেন। হযরত তাঁকে বললেন : বলুন, আজ থেকে পনের বছর পূর্বে এই সব জলসা জুলূস ও সাজসজ্জার কোন অস্তিত্ব ছিল? এ সবের নাম নিশানাও ছিল না। আর যখন থেকে মুসলমানরা এ সব শুরু করেছে। দেখুন ঐ সময় থেকে কী অবস্থা হচ্ছে। কত খারাপ ফলাফল সামনে আসছে।

আজ থেকে কয়েক বছর পূর্বে যখন মুসলমানরা এ সব জলসা-জুলূসের ইহতিমাম করত না, তখন অমুসলিমরাও নিজেদের উৎসব, হোলি, দশমী ইত্যাদির সময় এত বেশি আয়োজন করত না। হিন্দুদের সব অনুষ্ঠান হয়ে যেত। কিন্তু টেরই পাওয়া যেত না। যখন থেকে মুসলমানরা এ সব আরম্ভ করে, তখন থেকে অমুসলমানরাও এ সব আরম্ভ করে দিয়েছে।

এখন দেখুন কী হচ্ছে! শুধু বান্দা শহরেই তারা শোভাযাত্রার সময় ৭০টির অধিক মূর্তি রেখেছে। এর আগে তো শোভাযাত্রাই করত না। চুপচাপ নিজেদের উৎসব সেরে নিত। এ সব কাজ করত না। মুসলমানদের দেখাদেখি আজ তারা এ সব করার সাহস পাচ্ছে। মুসলমানদের বুঝেই আসে না। তাদের আকলের উপর মনে হয় পাথর পড়ে আছে। পরিণতি চিন্তা করে না। দ্বীনের নামে লক্ষ কোটি টাকা ধ্বংস করা হচ্ছে। সড়ক সাজানো, গেইট বানানো, আলোকসজ্জা ও খেল তামাশায় লাখ লাখ টাকা ধ্বংস করা হচ্ছে। কেউ তাদেরকে জিজ্ঞেস করুক, এটার নামই কি দ্বীন? এ সব জিনিসের শিক্ষাই তোমাদের নবী তোমাদেরকে দিয়েছেন? খেলাধুলা, তামাশা ও রিয়াকারীর সাথে দ্বীনের কী সম্পর্ক?

এ সব তো বলা হয়েছে কাফেরদের ব্যাপারে। অর্থাৎ "যারা তাদের দ্বীনকে খেলাধুলাও তামাশার বস্তু বানিয়ে রেখেছে।" (সূরা আ'রাফ, আয়াত ৫১)

এ সব হল বিধর্মীদের কাজ। দ্বীন তো হল আমাদের নবীর বাতলানো তরীকা অনুযায়ী নিজ প্রভুর ইবাদত করা। দ্বীন তো হল মহান আল্লাহর সামনে কান্নাকাটি ও কাকুতি মিনতির নাম। আল্লাহকে স্মরণ করা খুশূ খুযূর সাথে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও অনুসরণ করা। এর নাম হল দ্বীন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতিচারণের সঠিক পদ্ধতি হল তাঁর সীরাত ও জীবনী পড়া। প্রিয়নবীর যিন্দেগী ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র আদর্শকে সামনে রেখে আমরা আমাদের জীবনী দেখি ও তুলনা করি যে, আল্লাহর এই বান্দারা কেমন ছিলেন? কী করেছেন? আর আমরা কী করছি? কুরআন শরীফ পাঠ করতে হবে। ঈসালে সাওয়াব করতে হবে। তাঁদের জীবনের প্রতিটি আমল দেখে শিক্ষা নিতে হবে। এটাই হল দ্বীন।

এই খেলাধুলা, তামাশা, সাজসজ্জা, চিৎকার, হৈ হুল্লোড়বাজী, লোক দেখানোর নাম দ্বীন নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো এ সব জিনিস মিটানোর জন্য এসেছিলেন। এগুলো হল কাফেরদের পদ্ধতি। যারা এ সব জশ্নে জুলূসে শরীক হয়, এদের মধ্যে কয়জন নামায পড়ে? দৈনিক কতবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে? কী পরিমাণ তিলাওয়াত করে?

দ্বীনের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা ধ্বংস করা হচ্ছে। মাসখানেক পূর্ব থেকেই এর জন্য ফিকির প্রস্তুতি ও চাঁদা আরম্ভ হয়ে যায়। অনেক স্থানে সারা বৎসর এর জন্য চাঁদা করা হয়। কেউ তাদেরকে জিজ্ঞেস করুক যত টাকা চাঁদা তোলা হয়, তার থেকে কত টাকা খরচ করে? আর কতটুকু তাদের পেটে যায়। ব্যস, দ্বীনের নামে আর নবীজীর নামে চাঁদা তোলা হচ্ছে। অর্জন কিছুই নয়।

আরে এই হাজার-লক্ষ টাকা জমা করে যদি দরিদ্র ও বিধবা মহিলা এবং তাদের বিবাহে খরচ করা হয় তাহলে কত সাওয়াব পাওয়া যাবে। কত বড় খেদমত হবে। কিন্তু এ কথাগুলো বলবে কে? আশ্চর্য লাগে এই হক কথাগুলো যে বলে সেই সমালোচিত হয়। তাঁরই বদনাম করা হয়। তাঁরই বিরোধিতা করা হয়।

এ কারণে বর্তমানে উম্মতের মধ্যে যে হালত সৃষ্টি হচ্ছে এবং যে সব ক্ষতি হচ্ছে, তার সবকিছু আমাদের চোখের সামনেই আছে। সবাই ভুক্তভোগী। কিন্তু তারপরও আমাদের চোখ খুলে না। ব্যস আল্লাহই হিদায়েতের মালিক।

১৮৮. ফেরকাভিত্তিক দাঙ্গা হাঙ্গামার সময় মযলূম মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মালফূয

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : বর্তমানের রাজনৈতিক অবস্থা যার কারণে মুসলমানরা পেরেশান। প্রতিদিন ফিতনা ফাসাদ হচ্ছে এবং মুসলমানদেরই জান মালের ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের যেটা করণীয় সেটা তো করে না। বরং এদিক সেদিকের রেজুলেশন পাস করায়। পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে। স্টেজে বসে বক্তব্য দেয়। এর দ্বারা কি কিছু হয়?

এই সব রাজনৈতিক নেতারা এমন ক্ষতি করেছে যে, আল্লাহর পানাহ। যা কিছু হচ্ছে এ সব নেতার কারণে হচ্ছে। এগুলোর ফলাফল হয়েছে এই যে, অমুসলিমরা সবাই এক হয়ে গেছে অথচ আমাদের মধ্যে বিভিন্ন পার্টি তৈরি হয়েছে। দলাদলি হয়েছে। সবাই নেতা হতে চায়। প্রকৃত চিকিৎসার দিকে কারো ভ্রুক্ষেপ নেই।

প্রকৃত চিকিৎসা যে কী, সেটা আজ পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক নেতা বলেননি বা কোন পত্রিকাওয়ালা ছাপেননি যে, প্রকৃত চিকিৎসা হল আমাদের সকলকে আল্লাহমুখী হতে হবে। আমাদের উপর যে সব বিপর্যয় আসছে, এর আসল কারণ এটাই যে, আমরা আল্লাহ পাকের নাফরমানী করেছি। তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। হালাত তো উপর থেকে নাযিল হয়। আর আসবাব এখানে তৈরি হয়। এই সহায় সম্বলহীন অবস্থায় আমরা কী করতে পারি? কিছু করতে গেলে হিতে বিপরীত হওয়ার আশঙ্কা। যুবক শহীদ হবে। নারীরা বিধবা হবে। ধর্ষিতা হবে। এছাড়া আর কী হবে?

আরে এ সময় তো মহান আল্লাহর প্রতি পুরোপুরি মুতাওয়াজ্জিহ থাকতে হবে। তাঁর সামনেই কান্নাকাটি করতে হবে। দু'আ করতে হবে। গুনাহ ছাড়তে হবে। মদ-জুয়া, নাচ-গান, নির্লজ্জতা-পর্দাহীনতা থেকে বিরত থাকতে হবে। নামায কায়েম করতে হবে। মসজিদ আবাদ করতে হবে। এরপর দেখবেন মহান আল্লাহর সাহায্য কিভাবে আসে?

ইসলামের পুরোনো ইতিহাস দেখুন, ইতিহাস আমাদেরকে এটাই বলে যে, তাওবা-ইসতিগফার করতে হবে। দু'আ করতে হবে। তবেই পেরেশানী দূর হবে। সমস্যার সমাধান হবে।

এটা এমন এক অস্ত্র, যার মাধ্যমে বড় বড় শক্তির মোকাবিলা করা হয়েছে। রাষ্ট্রের সাথে মোকাবিলা হয়েছে।

মূসা আ.-এর নিকট কোন্ সে শক্তি ছিল? তাঁর বিরুদ্ধে ফিরআউনের পূর্ণ বাদশাহী ও ফৌজী শক্তি ছিল। কিন্তু পরিণতি কী ছিল? ঐ সময় হযরত মূসা আ. কোন্ অস্ত্র ব্যবহার করেছেন? হযরত ঈসা আ.-এর নিকট কোন্ অস্ত্র ছিল? আল্লাহ তাআলা কিভাবে তাকে হেফাযত করেছেন? সবসময় এভাবেই হয়ে আসছে। বর্তমানেও এটারই প্রয়োজন। কিন্তু কোন রাজনৈতিক নেতা বা লীডার এ ব্যাপারে মনোযোগ নিবদ্ধ করে না। কিছু বলে না। নানা ধরনের প্রবন্ধ লিখে। বরং কেউ এ জাতীয় কথা বললে বলা হয় : "তুমি মুসলমানদেরকে ভীতু বানাতে চাও।" আল্লাহ পাক হেফাযত করুন।

১৮৯. কাজের মধ্যে হেকমত অবলম্বন না করার ক্ষতি

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বললেন : মোলায়েম সিং, ভিপি সিং এর রাজত্বকালে কিছু কিছু কানূন শক্তভাবে কার্যকর করা হচ্ছিল। রাস্তার উভয় পার্শ্বে রাস্তার সীমান্তে গড়ে উঠা অবৈধ স্থাপনা ও দোকানপাট ভাঙ্গা হচ্ছিল।

যে কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছিল। হরতাল পর্যন্ত হয়েছিল। বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যা কিছু হচ্ছে সব ঠিক আছে। কিন্তু বেশি তাড়াহুড়ো করেছে। এখানো এটার সময় হয়নি। এত তাড়াহুড়োর কোন দরকার ছিল না। হুকুমত মাযবূত হওয়ার পর এ কাজ আরম্ভ করলে ভাল হত। জলদী শুরু করে দিয়েছে।

১৯০. কাযী মুজাহিদুল ইসলাম রহ.-এর প্রশংসা

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : একবার কাযী মুজাহিদুল ইসলাম রহ. আমাদের মাদরাসায় আগমন করেন। আমি তখন সবক পড়াচ্ছিলাম। তিনিও এসে সবকে বসে পড়লেন। সবকের পরে বলতে লাগলেন : "আমি তো আপনাকে শুধু বুযুর্গ মনে করতাম, আমার জানা ছিল না, আপনি মা'কূলী বা যুক্তিবাদী মানুষও বটে"। হযরত কাযী ছাহেব রহ.কে আমি অনেক পূর্ব থেকে জানি। দারুণ কাজের মানুষ। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের অনেক কাজ নিচ্ছেন।

১৯১. মুসলমানদের উচিত শরয়ী আদালতের মাধ্যমে নিজেদের সমস্যার সমাধান করানো

একবার হযরত কাযী মুজাহিদুল ইসলাম ছাহেব বিহারের রাজধানী পাটনা থেকে হাতুরায় আসছিলেন। হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. তাঁর সম্মানে বান্দা শহরে একটি জলসার আয়োজন করেন। যাতে করে মানুষ তাঁর বয়ানের দ্বারা উপকৃত হতে পারে। কিন্তু ঐ সময় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিছুটা এমন ছিল যে, বান্দা শহরে জলসা করা সমীচীন ছিল না, লোকজন অযথা বদনাম করত। জলসাস্থলে কেউ একটি পাথর নিক্ষেপ করলেও ফেতনার আশঙ্কা ছিল। বাবরী মসজিদ ইস্যুতে পরিস্থিতি ছিল খুব নাযুক।

এ জন্য হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বললেন : এমন পরিস্থিতিতে এটাই ভালো মনে হচ্ছে যে, বান্দার পরিবর্তে হাতুরাতেই জলসা করা হবে। এবং জনসাধারণকে জানিয়ে দেয়া হবে।

ফলশ্রুতিতে হাতুরায় জলসার প্রোগ্রাম করা হয়। কাযী মুজাহিদুল ইসলাম ছাহেব রহ. এর পরিচয় পেশ করতে গিয়ে হযরত বলেন : কাযী মুজাহিদুল ইসলাম ছাহেব রহ. আসছেন। তিনি বিহার রাজ্যের নায়েবে আমীরে শরীয়ত। কাযী। অনেক বড় আলেম। শরীয়ত অনুযায়ী শরীয়া আদালতে

ফয়সালা করে থাকেন। যদি মুসলমানরা সেটা মেনে নেয় এবং সে অনুযায়ী আমল করে, তাহলে সমস্ত ঝগড়া খতম হয়ে যেত।

প্রায় দিন তারা আদালতে গিয়ে অপদস্থ হয়। হাজার হাজার টাকা নষ্ট করে। কিন্তু ফলাফল কিছুই পায় না।

একজন মুসলমানের শান তো এমন হওয়া উচিত যে, সে ইসলামী আদালতে গিয়ে শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা করাবে এবং সেটাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নিবে। চাই সেই রায় তার মর্জি মতো হোক বা তার মর্জির বিপরীত। তাহলে হাজার হাজার টাকা বেঁচে যাবে। কিন্তু মুসলিম জাতি এ ব্যাপারগুলো নিয়ে চিন্তা করে না। আল্লাহ পাক এখানেও শরয়ী আদালতের ব্যবস্থা করে দেন। এতে মুসলমানদের অনেক বড় উপকার নিহিত।

১৯২. শাইখুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ ইউনুস ছাহেব রহ. এর প্রশংসা

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : মাওলানা মুহাম্মাদ ইউনুস ছাহেব রহ. তাঁর পুরো ছাত্রযমানায় অসুস্থ ছিলেন। বর্তমানে তিনি মাযাহেরে উলূম সাহারানপুরে শাইখুল হাদীস। অসুস্থতা থাকবেই। মানুষের মৃত্যু আসবেই। ঠিক সময়মতো আসবে। অসুস্থতার সাথেও কাজ হতে পারে। কাজ বন্ধ থাকবে না।

১৯৩. ইলমের অবমূল্যায়ন কেন?

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : যে জিনিস যত বেশি মেহনত ও পরিশ্রমের দ্বারা অর্জিত হয়, সে জিনিসের তত বেশি কদর ও মূল্যায়ন করা হয়।

বর্তমানে ইলমে দ্বীনের না কদরী বা অবমূল্যায়নের অন্যতম প্রধান কারণ হল ইলম অর্জনের জন্য কোন মেহনত ও মুজাহাদা সহ্য করতে হয় না। খুব সহজে ইলম হাসিল হয়ে যায়। খাওয়ার জন্য রুটি, থাকার জন্য কামরা অনায়াসে পাওয়া যাচ্ছে। সবদিক দিয়ে শুধু আরাম আর আরাম। পূর্বের যুগে না ছিল থাকার ঠিকানা, না ছিল খাওয়ার ব্যবস্থাপনা। এমনকি পড়ার জন্য কিতাব পর্যন্ত ছিল না। নিজ হাতে লিখতেন অতঃপর পড়তেন। কত কষ্ট বরদাশত করে ইলম হাসিল করেছেন। এরপরেই না আল্লাহ পাক তাঁদের মাধ্যমে কাজ নিয়েছেন। তাঁরা এমন সব অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেগুলো আমাদের জন্য পড়াও কঠিন। আল্লাহ তাআলা কারো পরিশ্রমকে পন্ড করে দেন না।

১৯৪. ফকীহ এবং মুফতীর জন্য বালাগাত ও মাআনী সম্পর্কে অবগতিও জরুরী

আমি অধম একবার আরয করলাম যে, ফুকাহায়ে কিরাম লিখেছেন : ফকীহ ও মুজতাহিদ ব্যক্তির ইলমে বালাগাতেও পারদর্শিতা জরুরী। প্রশ্ন হল এই বালাগাত ও মাআনীর ফিকহের মধ্যে কী প্রয়োজন?

উত্তরে হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বললেন : মুহাওয়ারা বা বাক-পদ্ধতির কারণে এর প্রয়োজন হয়। কেননা মুহাওয়ারা পরিবর্তন হলে বিধি-বিধানও পরিবর্তিত হয়ে যায়। অনেক সময় লাহজা বা বাক-ভঙ্গির পরিবর্তনের দরুন অর্থের মধ্যেও পার্থক্য হয়। আর এসব ব্যাপারগুলো বালাগাত ও মাআনীর সাহায্যেই ভালোভাবে বুঝে আসে।

দারুল উলুম দেওবন্দের সাদরুল মুদাররিসীন মাওলানা ইয়াকুব নানূতভী রহ. একবার নিজ এক ছাত্রকে বলেছিলেন : "তুমি তো (আরবী অলংকারশাস্ত্রের বিখ্যাত কিতাব) মুখতাসারুল মাআনী পড়েছ। যাও বাজারে যাও। দেখ লোকজন বালাগাত এর উসূল বা মূলনীতি প্রয়োগ করে কি না?

ফলে এ ছাত্রটি বাজারে গেল এবং ফিরে এসে উত্তর দিল যে, না, তারা প্রয়োগ করে না। তখন হযরত ইয়াকূব ছাহেব রহ. বললেন : তুমি আসলে বালাগাত পড়নি। নতুবা বালাগাত ও মাআনীর মূলনীতিসমূহ তো সর্বযুগে সকল গোত্রে প্রচলিত। গ্রাম্য ব্যক্তি ও মূর্খ ব্যক্তিও এটা ব্যবহার করে।

১৯৫. দাড়ি মুণ্ডনকারী ও কর্তনকারী হাফেয ছাহেবদের উপর তারাবীহ নামায না পড়ানোর পাবন্দী লাগিয়োনা বরং চেষ্টা করতে হবে যেন তারা শরীয়াহ মুতাবিক দাড়িও রাখে

একবার হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. গাড়িতে করে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। কানপুরের ক্বারী নাফীয ছাহেবও রহ. হযরতের সফর সঙ্গী হিসেবে ছিলেন। মাঝে তালিবে ইলমদের বদহালী ও বদআমলীর আলোচনা চলে আসল। ক্বারী ছাহেব বললেন : বর্তমানে ছাত্ররা মাদরাসা মসজিদে টুপি লাগায় কিন্তু বাইরে গেলে মাথা থেকে টুপি নামিয়ে ফেলে। আমি আমার মাদরাসায় শর্ত লাগিয়ে দিয়েছি যে, যে ছাত্র আমার মাদরাসায় পড়বে, তাকে সকল স্থানে টুপি লাগাতে হবে। দাড়ি কর্তন করার বদঅভ্যাসও খুব বাড়ছে।

যে সব হাফেয ছাহেবান দাড়ি কাটে বা মুণ্ডন করে আর রামাযানের পূর্বে অল্প একটু দাড়ি রেখে দেয়, এদের ব্যাপারে ক্বারী ছাহেব রহ. জিজ্ঞেস করলেন। তখন প্রতিউত্তরে হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বললেন : এটা তো অবশ্যই অন্যায়। এমন ব্যক্তির ইমামত মাকরূহে তাহরীমী। কিন্তু তারাবীহ পড়াতে থাকবে। এটাই গনীমত যে কোনভাবে দ্বীনের কাছাকাছি তো থাকল। দ্বীনের সাথে জুড়ে থাকবে। নতুবা সবকিছু ছেড়ে দিবে। এখনো কমপক্ষে এই বাহানায় তাদের কুরআন শরীফ মুখস্থ তো আছে। কিছুটা হলেও সম্পর্ক তো আছে। এ জন্য চেষ্টা করতে হবে যেন আগামীতে শরয়ী দাড়ি রাখে। বর্তমানে এমন যমানা এসে গেছে যে, দ্বীনের সাথে সামান্য সম্পর্ক হলেও এর মূল্যায়ন করা চাই।

ক্বারী ছাহেব রহ. আরয করলেন : হযরত! রামাযান নিকটবর্তী। আমাদের সকলের চিন্তা আরম্ভ হয়ে গেছে। জলদী জলদী দাওর করতে হবে। শোনাতে হবে। হযরত বললেন : আমারও চিন্তা আছে। জানি না অসুস্থতার কারণে এ বছর শুনাতে পারব কি না?

অতঃপর হযরত বললেন : দাড়ি কর্তনকারীদের পবিত্র কুরআন শুনানোর উপর পাবন্দী লাগিয়ো না বরং এই চেষ্টা করো যেন তারাবীহ পড়ানেওয়ালারা পূর্ণ দাড়ি রেখে দেয়।

১৯৬. পূর্বসুরীদের অনুগ্রহ

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বুখারী শরীফ ১ম খণ্ডের কিতাবুল ঈমান এবং কিতাবুল ইলমের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখছিলেন। সে বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন : লেখার সময় যেহেনের মধ্যে এমন অনেক কথা আসে যা কোথাও পাওয়া যায় না। না ব্যাখ্যাগ্রন্থে না টীকা-টিপ্পনীতে। আমি সবকিছু লিখে চলেছি। ঐ সব লেখার ক্ষেত্রে আমি শরাহ বা হাশিয়ার অনুকরণে বাধ্য নই। যা আমার বুঝে আসছে, তাই লিখছি। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্ব তো তাঁদেরই যাঁরা পূর্বসুরী। اَلْفَضْلُ لِلْمُتَقَدِّمِ সবকিছু তাঁদেরই ফয়েয ও বরকত। আমাদের মনে যত কথা আসে সেটাও তাঁদের মাধ্যমেই আসে। আমাদের উপর তাঁদের অনেক ইহসান ও অবদান। তাঁরা সবকিছু লিখে চলে গেছেন। আজ আমরা তাঁদের মাধ্যমে দিক নির্দেশনা পাচ্ছি।

১৯৭. জনৈক বিদআতীর প্রশ্ন ও তার উত্তর

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : একবার আমি সফর করছিলাম। এক বিদআতী ব্যক্তি দাবীর ভঙ্গিমায় আমাকে প্রশ্ন করল যে, কুরআনে পাকের মধ্যে তো স্বয়ং আল্লাহ তাআলা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতকে নিজের হাত বলেছেন। প্রমাণস্বরূপ তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন :

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ

"আপনি যখন নিক্ষেপ করলেন তখন আপনি নিক্ষেপ করেননি, বরং আল্লাহ তাআলা নিক্ষেপ করেছেন।" (সূরা আনফাল, আয়াত ১৭)

তাহলে দেখুন আল্লাহ তাআলা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতকে নিজের হাত বলেছেন। আমি বললাম : যদি এভাবে দলীল দেওয়ার দ্বারা প্রিয়নবীর হাত আল্লাহর হাত হতে পারে, তাহলে তো সাহাবায়ে কিরামের রাযি. হাতকেও আল্লাহর হাত বলতে হবে। কেননা, কুরআনে পাকের মধ্যে فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ۖ "অতএব তোমরা তাদের (কাফেরগণ) সাথে লড়াই করোনি বরং আল্লাহ তাদের সাথে লড়াই করেছেন। (সূরা আনফাল, আয়াত ১৭) বলে সাহাবায়ে কিরামের রাযি. কথা বলেছেন।

তখন ঐ বিদআতী বলতে লাগল যে, পবিত্র কুরআনে কি এই আয়াত আছে? আমি বললাম : অবশ্যই আছে। সে বলল : কোথায়? আমি বললাম : ঐ আয়াতের পূর্বেই আছে। ব্যস একদম নীরব হয়ে গেছে। কোন উত্তরই দিতে পারেনি।

১৯৮. শর্ত নেই তো শর্তযুক্ত জিনিসও নেই

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : প্রসিদ্ধ নীতি إِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ وُجِدَ الْمَشْرُوْطُ অর্থাৎ "শর্ত পাওয়া গেলে শর্তযুক্ত বস্তুও পাওয়া যাবে।" এটা সঠিক নিয়ম। এর মধ্যে কোন ব্যত্যয় নেই। কিন্তু إِذَا فَاتَ الشَّرْطُ فَاتَ الْمَشْرُوْطُ অর্থাৎ "শর্ত নেই তো শর্তযুক্ত জিনিসও নেই। এটা জরূরী নয়। এর ব্যতিক্রমও হতে পারে।

ফুকাহায়ে কিরাম যে কথাটা বলে থাকেন যে, "মাফহুমে মুখালিফ" বা বিপরীত সম্ভাবনা প্রমাণ নয়। এটার মর্ম এটাই।

১৯৯. বড়দের কথা পরবর্তীতে মনে পড়ে

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : মাওলানা আমীর আহমাদ ছাহেব রহ. আমাদেরকে পড়াতেন। আর এ জাতীয় বাক্য খুব বেশি ব্যবহার করতেন।

اَلْمَقُوْلُ غَيْرُ مَدْفُوْعٍ وَالْمَدْفُوْعُ غَيْرُ مَقُوْلٍ اَلْمُثْبَتُ غَيْرُ مَنْفِيٍّ وَالْمَنْفِيُّ غَيْرُ مُثْبَتٍ

অর্থাৎ, যা বলা হয়েছে তা অপ্রত্যাখ্যাত। আর যা প্রত্যাখ্যাত তা বলা হয়নি। যেটাকে প্রমাণ করা হয়েছে সেটাকে খণ্ডন করা যাবে না। আর যাকে খণ্ডন করা হয়েছে তাকে প্রমাণ করা যাবে না।

এ সব কথাগুলো তাঁর নিকট থেকেই শোনা। এখনো কানে বাজছে। বড়দের কথা পরবর্তীতে মনে পড়ে।

তোমরা তো এখনো পড়লেখা করছো। পরবর্তীতে এ কথাগুলো তোমাদেরও মনে পড়বে। কিন্তু যদি পরবর্তী কর্মজীবনে শিক্ষকতা করো তাহলে মনে পড়বে। আর যদি তেল বিক্রি করো তাহলে তো কোন কথাই নেই।

২০০. আযানের কতিপয় কালিমায় মাদ্দ

জনৈক ব্যক্তি আরয করলেন যে, حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحُ এর মধ্যে ওয়াক্‌ফ করার সূরতে গোল "তা" এবং "হা" সাকিন হবে। এমনিভাবে اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর মধ্যেও আল্লাহ শব্দের "হা" এর মধ্যে আরেযী সাকিন এর কারণে মাদ্দ এর কায়েদা বা নিয়ম তো পাওয়া যায়। এটা টানতে তো কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

এই প্রেক্ষিতে হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বললেন : ওয়াকফ অবস্থায় মাদ্দ এর নিয়ম পাওয়া যায় ঠিক। কিন্তু হযরত মাওলানা আবরারুল হক ছাহেব (হারদূঈ হযরত) বেশি টানাকে নিষেধ করেছেন।

অতঃপর হযরত বলেন : এ মাদ্দের যে পরিমাণ কিতাবের মধ্যে লিখেছে, অতটুকুই টানবে। এর চেয়ে বেশি টানবে না। আর মাদ্দের মতোই মাদ্দ করবে। গানের মত সুর আর তরঙ্গ সৃষ্টি করে আদায় করবে না।

২০১. কাকতালীয় কিছু ঘটে যাওয়ার উদাহরণ

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : জনৈক বাদশাহ একটি প্রাসাদের উপর কোন জিনিসের ছোট একটি গোলবৃত্ত রাখলেন। যার মধ্যে ছোট ছিদ্র ছিল। তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন : যার তীর এই বৃত্তের ভিতর দিয়ে বের হয়ে

যাবে, অর্থাৎ যার নিশানা এর মধ্যে লাগবে তার সাথে আমি আমার মেয়ের বিবাহ দিব। বড় বড় তীরন্দায আসলেন এবং তীর মেরে চলে গেলেন। কারো নিশানা লাগেনি। একটি ছোট বাচ্চা প্রাসাদের আশপাশে খেলাধুলা করছিল। কখনো এদিকে কখনো ওদিকে তীর মারছিল। ঘটনাক্রমে একবার ঐ বৃত্তের মধ্য দিয়ে তীর বের হয়ে গেল। তখন লোকেরা বলল :

رَمْيَةٌ مِنْ غَيْرِ رَامٍ

অর্থাৎ, এটা এমন একটা নিশানা বা এমন একটা তীর যা তীরন্দায ছাড়া নিক্ষেপ করা হয়েছে।

অর্থাৎ ঘটনাক্রমে লেগে গেছে। তখন থেকেই এই প্রবাদ প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। এবং ঐ কাজ এবং ঐ ব্যক্তির জন্য বলা হচ্ছে যার থেকে ঐ কাজের আশা ছিল না কিন্তু ঘটনাক্রমে কখনো করে ফেলেছে। যেমন কেউ সাধারণত নামায পড়ে না কিন্তু হঠাৎ একদিন ঘটনাক্রমে পড়ে ফেলল, তখন তাকে নামায পড়তে দেখে কেউ মন্তব্য করে বসল رَمْيَةٌ مِنْ غَيْرِ رَامٍ অথবা মনে করুন কেউ ইবারত (মূলপাঠ) পড়তে পারে না অথবা ভুল পড়ে। হঠাৎ একদিন কাকতালীয়ভাবে সহীহ ইবারত পড়ে ফেলল তখন বলা হবে رَمْيَةٌ مِنْ غَيْرِ رَامٍ এটা আরববাসীদের একটি প্রবাদবাক্য।

২০২. নূরুল আনওয়ার, হুসামী, আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ির ও শরহে বিকায়াহ

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. আলআশবাহ ওয়ান নাযায়ির কিতাবের দরস দিচ্ছিলেন। যার মধ্যে প্রথম নিয়ম اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ বা নিশ্চয়ই আমলের ভিত্তি হল নিয়্যাতের উপর (সহীহ বুখারী) এ প্রসঙ্গে আলোচনা চলছিল।

হযরতওয়ালা বললেন : এই কিতাবে এ সংক্রান্ত যে আলোচনা করা হয়েছে, তা জটিল। শরহে বিকায়াহ গ্রন্থে এ আলোচনা সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় সবিস্তারে আছে। মাসআলা বিলকুল সাফ করে দিয়েছে। শরহে বিকায়ার সমস্ত আলোচনা স্পষ্ট।

এ প্রসঙ্গেই বললেন : "আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ির" গ্রন্থটিকে এখন পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে এখন পড়ানো হচ্ছে। নতুবা পূর্বে তো মুতালাআ বা অধ্যয়নের দ্বারাই আহলে ইলম বুঝে ফেলতেন এবং শুধু মুতালাআই তাঁদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত।

এ প্রসঙ্গে বললেন : "হুসামী"ও উসূলে ফিকহ বা ইসলামী আইনশাস্ত্র সম্পর্কীয় নীতিমালা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। কিন্তু এর মূলপাঠ কঠিন ও জটিল। সে তুলনায় "নূরুল আনওয়ার" এর মূলপাঠ অত্যন্ত সহজ ও স্পষ্ট।

২০৩. গোসল করার উপকার ও সুন্নাত অনুসরণের বরকত

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. কানপুরে জামীল ভাইয়ের বাসায় অবস্থান করছিলেন। মাথা এবং বগলের পশম পরিষ্কার করালেন। নখ কাটালেন।

জনৈক মুফতী ছাহেব যিনি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, হযরত তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, বুকের পশম কাটা কেমন? অনেক চুলকায়। ঐ মুফতী ছাহেব আরয করলেন যে, ফুকাহায়ে কিরাম "মুবাহ" লিখেছেন। অতঃপর হযরত গোসল করলেন এবং গোসল করে কিছুক্ষণ আরাম করলেন এবং বললেন যে, গোসলের দ্বারা মনের মধ্যে প্রফুল্লতা আসে। স্থিরতা আসে। যখন বাহ্যিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার এই প্রতিক্রিয়া, তখন অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে তা তো বলাই বাহুল্য। আর যার অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা হাসিল হয়, তাঁর মনে কত বেশি প্রফুল্লতা আসে।

গোসল করার দ্বারা এক ধরনের নূরানিয়াত অনুভূত হয়। উদ্যম আসে। তবিয়ত চাঙ্গা হয়। নেক কাজে মন বসে। এজন্যই সপ্তাহে কমপক্ষে একবার গোসল করাকে সুন্নাত সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুন্নাতের নিয়্যতে গোসল করলে সাওয়াবও পাওয়া যায়। সপ্তাহে কমপক্ষে এক বার তো অবশ্যই গোসল করা উচিত। আমার চাচা তো দৈনিক গোসল করতেন। সকালে প্রথমে গোসল করতেন। এরপর অন্যান্য কাজ করতেন। সুস্বাস্থ্যের জন্যও গোসল অত্যন্ত উপকারী।

২০৪. স্মৃতিশক্তিও মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও দান

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. সকালবেলা বাদ ফজর লাইট বাল্ব ইত্যাদি বন্ধ করার কথা বলতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু "বিজলী" (বিদ্যুৎ) শব্দটি মুখে আসছিল না। ভুলে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন : ঐ সময় বিজলী শব্দটি আমার মুখে আসছিল না। ভুলে গিয়েছিলাম।

একবার হাবীব (হযরতওয়ালার বড় ছেলে) এর নাম মুখে আসছিল না। ভুলে গিয়েছিলাম। একবার মারিয়া (হযরতের মেয়ে) এর নাম মুখে আসছিল না। কিছুক্ষণ চিন্তা করতে থাকলাম যে, কী বলে ডাকব? আজীব হালত ছিল।

পরবর্তীতে দেখেছি যে, শাহ আব্দুল গণী ফুলপুরী রহ. এরও একই অবস্থা হয়ে গিয়েছিল। একবার চিঠি লেখার সময় নিজের নাম ভুলে গিয়েছিলেন যে, কী নাম লিখবেন?

সংকলকের বক্তব্য :

অত্যাধিক ব্যস্ততা ও সীমাহীন চিন্তার কারণে কখনো এমনটি হতেই পারে। এটা কোন দোষ নয়।

হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ. এ জাতীয় কয়েকটি ঘটনা লিখেছেন। মহান আল্লাহর কুদরত অনেক বড়। তিনি সকল জিনিসের উপর সর্বমুহূর্তে সক্ষম। নেয়ার উপরও। দেয়ার উপরও।

২০৫. মুসাফিরখানা বানানোর অভিলাষ

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : দীর্ঘ দিন থেকে আমার মনের একান্ত অভিলাষ, বান্দা শহরে কোন মুসাফিরখানা ও হাসপাতাল হয়ে যাক। কিন্তু এখনো পর্যন্ত এর কোন সূরত হয়ে উঠেনি। হাসপাতাল হলে গরীবদের অনেক উপকার হবে। বিশেষতঃ মহিলাদের। কেননা তাঁদের চিকিৎসার জন্য খুব পেরেশানী উঠাতে হয়। লোকেরা অন্যান্য স্থানে টাকা পয়সা খুব দেয়। জানি না কিভাবে দেয়? কিন্তু এ ক্ষেত্রে কেন দেয় না?

মৌলভী গোলাম ছাহেবের নিকট লোকেরা বলে যে, প্রতি মাসে মসজিদ নির্মাণ করুন। আমাদের থেকে প্রতি মাসে পয়সা নিন। অথচ এখানে একটি মুসাফিরখানা বানানো যাচ্ছে না। এটা হয়ে গেলে অনেক বড় প্রয়োজন পূর্ণ হবে। মুসলমান মুসাফিররা পেরেশান হন।

২০৬. সুপারিশীপত্র কার নিকট লেখা যায়?

জনৈক ব্যক্তি হযরতওয়ালার নিকট সুপারিশীপত্র লেখার দরখাস্ত করল। হযরত বললেন : সুপারিশীপত্র সেখানে লেখা যায় যেখানে কিছু আশা থাকে যে, কথা মানা হবে। সুপারিশের প্রভাব পড়বে। পক্ষান্তরে যেখানে সুপারিশের কোন প্রভাবই নেই, সেখানে সুপারিশ করে কী লাভ?

আমি আমার কাজের জন্য অমুক ছাহেবের কাছে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি কাজ করে দেননি।

হযরত ভুক্তভোগীকে ডেকে বললেন যে, তুমি নিজেই গিয়ে সাক্ষাৎ কর। তাকে বল যে, আমি এমন অপারগতা ও পেরেশানীর হালতে এসেছি।

অপারগ মানুষ তো তৃণখণ্ডের সাহায্যও গ্রহণ করে। আমি আপনার নিকট কিছু সাহায্য লাভের আশা নিয়ে এসেছি। আপনি তো আমার এলাকার মানুষ। একই বংশের মানুষ।

হযরত বলেন : দারুণ আশ্চর্যের ব্যাপার! যে চেয়ারে বসে, সে সব কিছু ভুলে যায়। সে শুধু চেয়ারই দেখতে পায়।

২০৭. বিনা অনুমতিতে অন্যের বই ছাপানোর উপর অসন্তোষ প্রকাশ

إِسْعَادُ الْفُهُوْمُ (ইসআদুল ফুহূম) নামে হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. সুল্লাম (যুক্তিবিদ্যার বিখ্যাত গ্রন্থ) এর একটি ভাষ্যগ্রন্থ লিখেছেন। যা দীর্ঘদিন পর্যন্ত মুদ্রিত হয়নি। বহুকষ্টে যখন সেটা মুদ্রিত হল, মহান আল্লাহর শান যে, খুব সমাদৃত হল। এখন কোন কোন প্রকাশনী সেটা ছেপে দিয়েছে। এ সংবাদ জানার পর হযরত প্রচণ্ড অসন্তোষ প্রকাশ করলেন।

আমি অধম সংকলক আমার কিতাব العلم و العلماء এর ব্যাপারে আরয করলাম যে, এটাকে অন্যান্য মাকতাবাওয়ালারা প্রকাশ করে ফেলেছে। আমি অধম হযরতের সাথে পরামর্শ করলাম যে, কী করব? চুপ থাকব? হযরত বললেন : না, বরং তাদের নিকট পত্র লিখ। অদ্ভূত ব্যাপার। একজন মানুষ পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কিতাব প্রস্তুত করে কোনভাবে ছাপানোর পর যখন চলতে থাকে, তখন অন্য মানুষেরা সেটাকে ছাপতে থাকে।

হযরত নিজের একটি কিতাব কোন একজন প্রকাশককে ছাপানোর জন্য দিয়েছিলেন। কিন্তু অন্য আরেকজন সেটাকে ছেপে দেয়! হযরত এটা জানতেও পারেননি।

আমি অধম হযরতের নিকট এটার আলোচনা করলে হযরত বললেন : অদ্ভূত মানুষ! কমপক্ষে আলোচনা তো করতে পারত। এখনই কিছু বলে দিলে মনে কষ্ট পাবে।

যারা আমি অধম কর্তৃক সংকলিত গ্রন্থ ‘আলইলমু ওয়াল উলামা’ ছাপিয়েছিল হযরত তাদের খেদমতে পত্র লেখার জন্য বলেছিলেন। অধম পত্র লিখে দেখালাম। হযরত কিছু অংশ কেটে দিলেন আর কিছু অংশ বাড়িয়ে দিলেন এবং বললেন : এটাকে পাঠিয়ে দাও।

অধম কিতাবের রেজিষ্ট্রেশনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল যে, এটা সমীচীন কি না? হযরত বললেন : মাসআলা আমার তাহকীক নেই। অধম আরয

করলাম যে, মাসআলায় তো জায়েয। সমীচীন নাকি অসমীচীন তাই জানতে চাচ্ছি। হযরত বললেন : এতে কী সমস্যা? করিয়ে দাও।

২০৮. মূর্খ লেখকদের মূর্খতা

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. এর অভ্যাস হল ইশার নামাযের পর দৈনিক ইসলাহ ও তারবিয়্যত সংশ্লিষ্ট কোন কিতাব ছাত্রদেরকে পড়ে শোনান। কখনো ওয়ায নসীহত করেন। অধিকাংশ সময় নিজ কিতাব ‘আদাবুল মুতা‘আল্লিমীন’ পড়ে শোনান।

একবার ইশার নামাযের পর এ কিতাব পড়ে শোনাচ্ছিলেন। কোন স্থানে লেখার প্রকাশ্য ভুল ছিল। হযরত বললেন : ভুল তো হল লেখার। কিন্তু মানুষ মনে করবে এ ভুল আমিই করেছি।

এসব কাতেবও নিজেদের পক্ষ থেকে সংশোধন করে। বর্তমানের কাতেববৃন্দ হাতের লেখায় পাকা হয় কিন্তু শিক্ষিত হয় না।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বললেন : জনৈক বই বাঁধাইকারী কুরআন শরীফ বাঁধাই করত। আর নিজেই লেখা সংশোধনও করত। একবার এক ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের জিলদ বানানোর জন্য গেল। আর ইনি তাকীদ করে বললেন আপনি আল্লাহর ওয়াস্তে এর মধ্যে কোন সংশোধন করবেন না। সে বলতে লাগল : খুব ভালো। আমি তো কল্যাণ কামনা (?) হিসেবে এমনটি করি। নতুবা মানুষেরা তো পয়সা নিয়ে সংশোধন করে। আমার কী ঠেকা পড়েছে? আপনি যখন নিষেধ করেছেন। খুব ভাল। করব না। সে জিলদ বানিয়ে দিল। যখন নেয়ার জন্য গেল, তখন কুরআনে পাক দিয়ে দিল আর বলল যে, আপনি যেহেতু নিষেধ করেছিলেন এ জন্য আমি সংশোধন করিনি। কিন্তু এমন একটি মারাত্মক ভুল ছিল যে, আমি আর সহ্য করতে পারিনি। সেখানে অত্যন্ত জরূরী প্রয়োজনে সংশোধন করে দিয়েছি। এর বাইরে আর কোথাও সংশোধন করিনি। ঐ স্থানটি হল خَرَّ مُوْسٰى (সূরা আরাফ, আয়াত ১৪৩) ফার্সীতে خر মানে হল গাধা। এই নির্বোধ বাইন্ডার বলল : গাধা তো হযরত ঈসা আ. এর ছিল। হযরত মূসা আ. এর কাছে গাধা কোথায় ছিল? কাজেই خَرَّ عِيْسٰى হবে خَرَّ مُوْسٰى নয়!!

এই হল বর্তমানকালের কাতেব বা লেখকদের যোগ্যতার দৌড়। আল্লাহ তাআলা মূর্খতা হতে হেফাযত করুন।

২০৯. একটি কৌতুক

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. এর নিকট জনৈক ছাত্র দরসে ইবারত পড়ছিল। কিতাবে ইবারত আসল مَسَالِكُ অর্থাৎ مَذَاهِبُ বা মাযহাবসমূহ। এক তালিবে ইলম তাকে লোকমা দিল আর বলল : مَسًّا لَكَ অর্থাৎ তোমার জন্য স্পর্শ!!

হযরত মুচকি হাসি দিয়ে বললেন : দেখো অবস্থা!

অতঃপর বললেন : একজন বক্তা খুব জোশের সাথে বয়ান করছিলেন যে, কবরে এসে যখন ইয়াজূজ-মাজূজ প্রশ্ন করবে! মুনকার-নাকীরের পরিবর্তে ইয়াজূজ-মাজূজ বলছিলেন। অন্য আরেকজন বিকট গর্জন করে বলল : আরে ইয়াজূজ-মাজূজ নয়। বরং হারূত-মারূত!!

২১০. আরেকটি কৌতুক

হযরতওয়ালা বান্দাভী রহ. বলেন : হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী রহ. তাঁর ওয়াযের মধ্যে একটি কৌতুক বলেছেন : জনৈক ব্যক্তির অনেকগুলো ছেলে সন্তান ছিল। আর সবার নাম তিনি "ইলাহী" ওযনে রেখেছিলেন। কারো নাম "শানে ইলাহী" কারো নাম "ফযলে ইলাহী"। ছেলের সংখ্যা যখন অনেক বেশি হয়ে গেল, আর "ইলাহী" ওযনে কোন নাম পাওয়া যাচ্ছিল না, তখন বলতে লাগলেন : এর নাম রাখো "তাওবা ইলাহী"!!

সমাপ্ত